বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

ভূতের গল্প

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ

ভূতের গল্প

সম্পাদনা

উজ্জ্বলকুমার দাস

সিলেক্‌শন

স্টল নং ৩৩, ভবানী দত্ত লেন

কলকাতা-৭০০০৭৩

BHUTER GALPA

Edited by Ujjal Das, Published by Selection, Kolkata-6

Price : 60.00

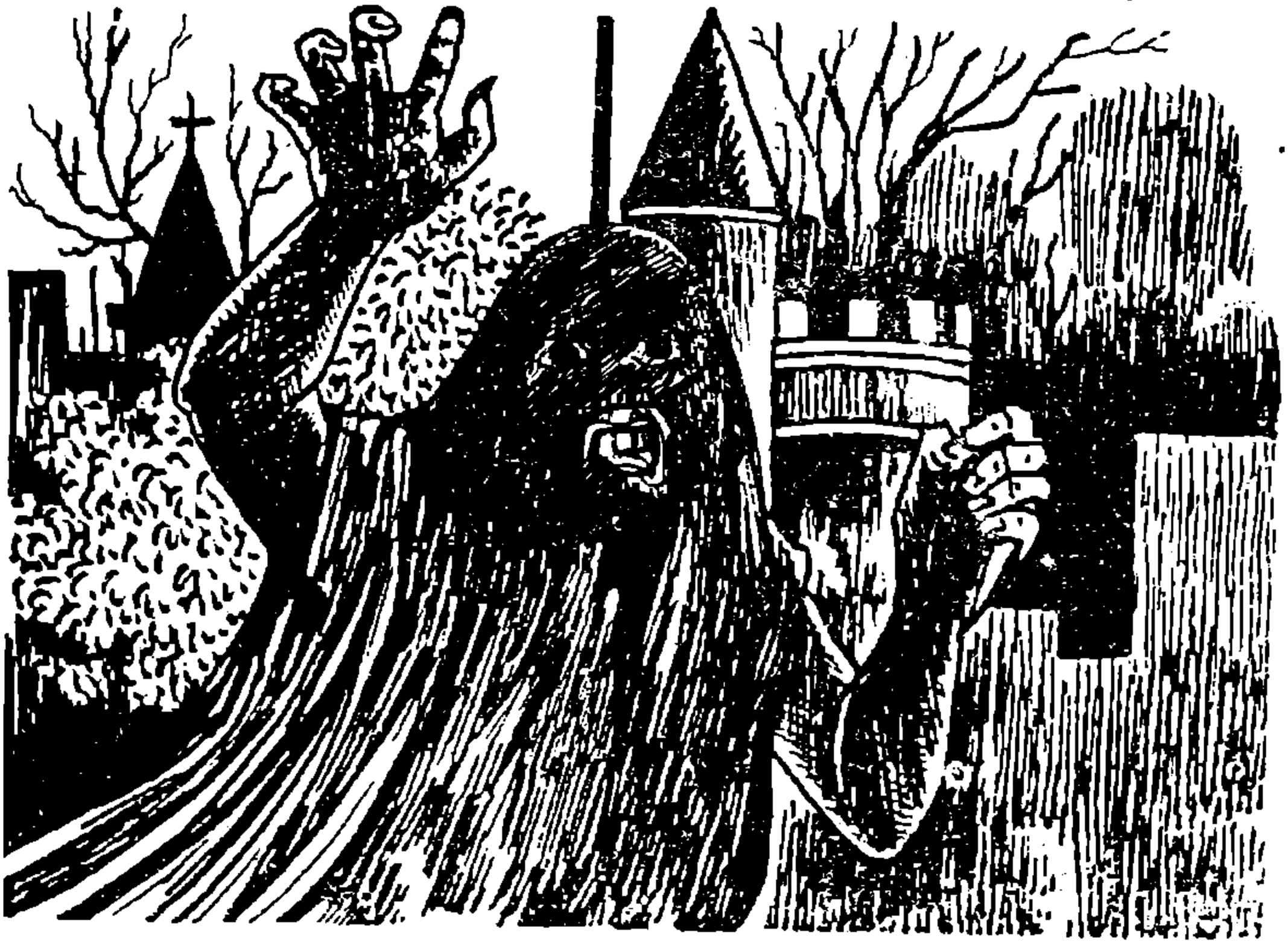

প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৫

প্রচ্ছদ ঃ সুবল সরকার। অলঙ্করণ ঃ রাজামিতা।

সিলেকশনের পক্ষে ১৫/জেড/১ নিমতলা লেন, কলকাতা-৬ থেকে গোপাল দাস থেকে কর্তৃক প্রকাশিত। বর্ণসংস্থাপন ঃ সুজয় গাঙ্গুলি।

এস. এস. প্রিন্টার্স কলকাতা-৪ হইতে মুদ্রিত।

মূল্য ঃ ৬০ টাকা

উৎসর্গ

শ্রদ্ধা সমীপেষু

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য অনুদিত বইঃ

- বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা গল্প
- টোয়েন্টি থাউজেন্ড লিগস্ আণ্ডার দ্য সী
- এ্যারাউণ্ড দ্য ওয়ার্লড এইটি ডেজ্
- রবিনসন ক্রুশো
- রবিনহুড

ভূমিকা

ভূত কি আছে? হ্যাঁ আছে। আমাদের মনের গভীরে ও আমাদের কল্পনার ক্যানভাসে। ভূতেদের নিয়ে লেখা হয়েছে রক্ত হিম করা গল্প, আবার কখনও বা তার পাশাপাশি মজা করে তেনাদের নিয়ে লেখা হয়েছে নানা মজার গল্প।

ভয় দেখানোর কেরামতিতে ভিনদেশি ভূতেরা বোধহয় একটু এগিয়ে যেমন ভ্যম্পায়ার, গবলিন, জোম্বি, গ্যাম্বো, নোম বা ওয়েহ্যাদের সঙ্গে অন্যসব ভূতদের একবারেই তুলনা করা যায় না।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে দেশ-বিদেশের কথাসাহিত্যে বার বার ভূতেরা সদর্পে হাজির হয়েছে। শুধু গল্প কিংবা উপন্যাসে নয়, কবিতার স্নিগ্ধ কোমল আসরেও ভূত-প্রেতেরা অনায়াসেই ঢুকে পড়েছে।

সর্বযুগে এবং সর্বকালে ভৌতিক কাহিনী তথা ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব মানুষের কল্পনাকে উদ্দিপ্ত করেছে। তা সত্বেও আজকের এই বিংশ শতাব্দীর আলোকোজ্জ্বল নাগরিক জীবনে সভ্য মানুষই ভৌতিক গল্পের সব থেকে বড় পাঠক, কারণ হারিয়ে যাওয়া বিগত শতাব্দীর ভৌতিক আলো-আঁধারি অভিজ্ঞতার পুরনো দিনগুলি যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে টানে। একটা কথা সকলকেই মানতে হয় যে, সর্বকালে ও সর্বযুগে মানুষের নিকট ভগবান ও ভূত এই 'ভ' কা-রান্ত শব্দ দু'টি সমার্থক হয়ে গেছে। তাই বলা যায় যে ভগবান বিশ্বাস করেন হয়তো অনেকেই কিন্তু ভূত বিশ্বাস করেন প্রায় সকলেই। তাই মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভয়, ভগবান ও ভূত এই শব্দগুলি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে আজও বেঁচে আছে।

কালের ধারাবাহিকতায় দেশ-বিদেশের লেখক-লেখিকাদের নিষ্ঠা ও চেষ্টায় ভূতের গল্প নতুনতর স্থূলতা-বীভৎসতা হারিয়ে ক্রমেই হয়ে উঠেছে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম কল্পনার এক আশ্চর্য মিশেল।

'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ভূতের গল্প' সঙ্কলনটিতে রয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত লেখকদের সেইসব ভূতের গল্প যা পাঠক-পাঠিকাদের মনে এনে দেবে এক অনাবিল আনন্দের স্বাদ।

কলকাতা বইমেলা-২০০৫ *উজ্জ্বলকুমার দাস*

সূচিপত্র

❑ মমি রহস্য	আর্থার কোনান ডয়েল	৯
❑ দি ভ্যাম্পায়ার	জান নেরুদা	১৯
❑ ড্রাকুলা	ব্রাম স্ট্রোকার	২৪
❑ বিমূর্তছায়া	এডগার অ্যালেন পো	৫৩
❑ রিপোর্টার	রবার্ট আর্থার	৫৭
❑ বড়দিনের গল্প	চার্লস ডিকেন্স	৬৩
❑ ধূসর আতঙ্ক	এনথোনি হর্নার	৭০
❑ দি রেড কেন	ই. এফ. বোজম্যান	৭৩
❑ ডাইনীর গল্প	চার্লস ল্যাম্ব	৭৯
❑ ভূতুড়ে বাড়ির গল্প	লর্ড হ্যালিফ্যাক্স	৮৪
❑ ভূতের সন্ধানে আমরা	এইচ. আর. ওয়েকফিল্ড	৮৮
❑ ভয়ার্ত সেই মৃতের মুখ	ও.ডনেল	৯৫
❑ দি কোকোনাট ট্রায়াল	ডন. নলটন	৯৯
❑ দি পেগ ডল	রোজমারি টিম্‌পারলে	১০৪
❑ খোলা জানালা দিয়ে	কালো অন্ধকার	
	সাকি (এইচ. এইচ. মুনরো)	১১১
❑ ভয়ঙ্কর রাত	হল পিঙ্ক	১১৬
❑ কালো বাঁদরের থাবা	ডবলিউ. ডবলিউ. জেকবস্‌	১২৩
❑ গ্লাবডাবড্রিবের রোমাঞ্চ	জোনাথন সুইফট	১৩০
❑ সবুজ ভূতের কাহিনী	রোজমারী টিম্‌পারলে	১৩৪
❑ বিভৎস সেই লোকটি	হেলেন পিড্‌ডক	১৩৯
❑ দি উওম্যানস ঘোস্ট স্টোরি	অ্যালগারনন্‌ ব্ল্যাকউড	১৪৪
❑ দি টল উওম্যান	পেড্রো অন্তোনিয়ো দ্যা অ্যালারকন	১৫২
❑ হ্যারি	রোজমারি টিম্‌পারলে	১৬৩
❑ পরলোকের হাতছানি	আলফ্রেড হিচকক	১৭৫
❑ ভয়ঙ্কর স্বপ্ন	গি, দ্য, মঁপাসা	১৮০
❑ অন্ধকারের অতিথি	হেনরী সিসিল	১৮৬

মমি রহস্য

আর্থার কোনান ডয়েল

শহরের এক প্রান্তে অক্সফোর্ডের পুরনো কলেজ অঞ্চলে বহু প্রাচীন জীর্ণ-শীর্ণ প্রায় ভেঙে পড়া মিনার ঘরটা দীর্ঘ বয়সের ভার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার খিলানগুলো ভাঙা, বিরাট দরজা দুটো হেলে পড়েছে, ঘন পুরু আইভিলতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে মিনারটাকে।

এখানে ক'জন লোক থাকে। নিচ থেকে একটা সিঁড়ি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ওপরে উঠে গেছে—দোতলা তিনতলা ও চারতলায় একই ভাবে সিঁড়ি থেকে দুটো করে ঘর বেরিয়েছে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ওখানে থাকে। একান্তে পড়াশুনা বা কাজকর্মের পক্ষে জায়গাটা বেশ ভাল। ওপর তলায় থাকেন এ্যাবারক্রেম্বি স্মিথ, মাঝের তলায় এডওয়ার্ড বেলিংহ্যাম, তার নিচে উইলিয়ম মঙ্কহাউস লী। একেবারে নিচে থাকে চাকর টমাস স্টাইলস। বুড়ো লোকটা ঘরদোর দেখে আর ওপর তলায় লোকেদের রান্নাবান্না কাজকর্ম করে।

রাত প্রায় দশটা। চারতলায় নিজের ঘরে আরাম কেদারায় শুয়ে সুন্দর স্বাস্থ্যবান এ্যাবারক্রেম্বি স্মিথ, সামনে একই ভাবে পুরনো বন্ধু জেফরো হেষ্টি। মস্কো নদীতে নৌকা চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে ওরা ফিরেছে। কথা বলতে বলতে হঠাৎ হেষ্টি বলল যে মিনারের অন্য দু'জনের সঙ্গে স্মিথের বেশি না মেলামেশা করাই ভাল। কেননা মঙ্কহাউস লী বেশ ভাল হলেও বেলিংহ্যাম কেমন যেন সুবিধার নয়।

'কেন?' জানতে চাইল স্মিথ।

'বেলিংহ্যামকে কেন আমি পছন্দ করি না ঠিক বলতে পারব না। ও চোর বা গুন্ডা বদমায়েশ নয়। কিন্তু ও কেমন যেন অদ্ভুত ধরনের। অন্য ছেলেদের সঙ্গে কোনও মিল নেই। বেলিংহ্যামের চোখ দু'টোতে ভীষণ ধূর্তামি আর শয়তানি মাখানো। সবাই বলে ও মন্ত্রটন্ত্র জানে। অবশ্য গুণও ওর আছে। পারসী আরবী হিব্রু ইত্যাদি প্রাচ্য দেশের অনেক ভাষা ও জানে।

স্মিথ জানতে চাইল বেলিংহ্যাম তুকতাক করে কারুর কোনও ক্ষতি করেছে কিনা, তা না হলে ওকে খারাপ বলার কোনও মানে হয় না।

হেষ্টি দ্বিধাজড়িত স্বরে বলল, 'ওকে আমি ঠিক সহ্য করতে পারি না। বিশেষ করে মঙ্কহাউস লীর বোন এভেলিনের সঙ্গে ওকে যখন বেড়াতে দেখা যায়। লীদের আমি অনেকদিন চিনি, এভেলিনও আমার দীর্ঘকাল পরিচিত। এভেলিন সহজ সরল রূপসী মেয়ে। ওর পাশে বেলিংহ্যামকে দেখলে মনে হয় যেন ছোট্ট সুন্দর একটা পাখির পাশে একটা কদাকার জঘন্য কোলাব্যাঙ লাফাতে লাফাতে চলেছে।'

হেষ্টি আরও বলল যে, বেলিংহ্যাম সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে, সকলের ওপর জোর ফলায়, আবার শাসানোর হুমকিও দেয়। সেদিন নিজেই ঝগড়া করে বন্ধু নর্টনকে শাসিয়েছে। ও সত্যিই কেমন যেন অদ্ভুত ভয়ঙ্কর।

রাত বাড়তে থাকে। স্মিথকে সাবধান করে দিয়ে হেষ্টি চলে যায়।

স্মিথ ডাক্তারীর ছাত্র। হেষ্টি চলে যাওয়ার পর সে নিজের পড়ার বইয়ে মনোনিবেশ করে, ডাক্তারী শাস্ত্রের অরণ্যে সে ডুবে যায়। হঠাৎ নিচ থেকে এক তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট শব্দ সে শোনে—যেন কার দীর্ঘশ্বাস, কার আর্তনাদ। মনে হয় বেলিংহ্যামের ঘর থেকেই শব্দটা আসছে।

স্মিথের হঠাৎ মনে পড়ল বেলিংহ্যাম সম্বন্ধে তার বন্ধু হেষ্টির মতামত। হেষ্টি অত বিরূপ কেন? বেলিংহ্যাম তো প্রতিবেশী বন্ধু হিসেবে খারাপ নয়। ওর ঘরে অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে, মনে হয় বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করে। তবে হেষ্টিও কারুর নামে নিন্দামন্দ করে না, যদিও সে বেশ স্পষ্টভাষী।

আবার পড়ায় মন দিল স্মিথ। হঠাৎ অন্ধকার রাত্রির বুক ভেদ করে একটা তীব্র ভয়াবহ আর্তনাদ শোনা গেল—রক্ত যেন জমাট বেঁধে যায়। আতঙ্কিত স্মিথ শিউরে উঠল! সে স্তব্ধ, বিমূঢ়, বুঝতে পারছে না কি করবে। হঠাৎ সবেগে তার ঘরে ঢুকল মঙ্কহাউস, হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, 'এক্ষুণি চল, বেলিংহ্যাম অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে।'

অতি দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল তারা। বেলিংহ্যামের ঘরে ঢুকেই স্মিথ দারুণ চমকে উঠল। বেলিংহ্যামের ঘরটা প্রায় একটা মিউজিয়াম—ঘরের চারদিকের দেওয়ালে প্রাচ্য ও মিশরদেশের প্রাচীন অদ্ভুত বিচিত্র সব নিদর্শন। বিভিন্ন ভাঙাচোরা মূর্তি, রাজাদের কারুকার্য করা প্রচ্ছন্ন পোশাক, অস্ত্রশস্ত্র, বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের মাথা, হোরাম আইসিস ওঝিরিস প্রভৃতি দেবতার অদ্ভুত মূর্তি, ছাদ থেকে ঝুলছে হাঁ-করা মুখ একটা বিশাল কুমীর। ঘরের মাঝখানে টেবিলে ছড়ানো টুকরো কাগজ, অদ্ভুত দর্শন গাছের ছালের মত শুকনো পাতা, আর প্যাপিরাস গাছের পাতার একটা পুঁথি।

সামনে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ভয়ে চমকে উঠল স্মিথ—বাক্সে একটা মমি রাখা হয়েছে। পোড়া কাঠের মতো কুচকুচে কালো, কোঁকড়ানো, বিরাট ঈগল নখরের মতো অস্থিসর্বস্ব বড় বড় আঙুলগুলো। কি বীভৎস দেখতে! মমির ঠিক মুখোমুখি চেয়ালে বেলিংহ্যাম শুয়ে, ভয়ে তার চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

স্মিথ পরীক্ষা করে দেখল বেলিংহ্যামকে। তারপর দু'জনে ধরাধরি করে ওকে সোফায় শুইয়ে দিল। স্মিথ বলল, 'ওর কি হয়েছিল জান?'

মঙ্কহাউস বলল, 'না, আমি ঠিক জানি না। ওর চিৎকার শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে দেখি ওই অবস্থা। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওপরে গিয়ে তোমাকে ডেকে আনি।'

বেলিংহ্যাম ভীষণ ভয় পেয়েছে। তার মুখ রক্তশূন্য বিবর্ণ, চোখের মণি

দুটো টেনে বেরিয় আসছে, তার মুখের গঠনটাই যেন কেমন পালটে গেছে। কোনও এক ভয়ঙ্কর অলৌকিক আতঙ্কে মুখের এই অভিব্যক্তি!

মঙ্কহাউস বলল, 'মনে হচ্ছে মমিটা দেখেই ও এরকম ভয় পেয়ে গেছে। আর একবার ঠিক এরকম ভয় পেয়েছিল, আর সেবার মমিটাও ছিল ঠিক ওই রকম সামনে। আসলে বেলিংহ্যাম একটু অদ্ভুত ধরনের ছেলে। প্রাচীন জিনিসপত্রে ওর আগ্রহ খুব বেশি, প্রাচীন পুঁথিপত্রের ভাষাও ওর জানা, এ বিষয়ে ও খুব অভিজ্ঞ।'

আস্তে আস্তে ফিরে আসছে বেলিংহ্যামের জ্ঞান। ক্রমে ও চোখ চাইল। হঠাৎ মমিটা দেখেই ও চমকে উঠল, তাড়াতাড়ি প্যাপিরাস পাতার পুঁথিটা নিয়ে ড্রয়ারে চাবি দিয়ে দিল। তারপর এদের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত হয়ে বলল মঙ্কহাউসকে— 'তোমরা হঠাৎ এখানে কেন?'

'তোমার চিৎকার শুনে ছুটে এসেছি, এরকম গভীর রাতে তোমার এই সব মমিটমি নিয়ে খেলা বন্ধ করা উচিৎ।'

'না, না, কিছু হয়নি। হঠাৎ শরীরটা একটু খারাপ হয়ে যায়।'

বেলিংহ্যাম উঠে সেই গাছের ছালের মতো একটা পাতা নিয়ে আলোর চিমনির ওপর ধরে। পাতাটা পুড়ে যায়, ধোঁয়ায় ভরে যায় ঘর। অবশেষে একটা অপরূপ সুমিষ্ট সৌরভে ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

এরা দু'জন বিস্মিত বিহ্বল।

ওদের অবস্থা দেখে বেলিংহ্যাম যেন মজা পেয়েছে। ও মমিটার দিকে তাকিয়ে বলল যে, ওটা চারহাজার বছর আগের এক সম্রাটের। স্মিথ কাছে গিয়ে ভাল করে দেখল মমিটাকে। মমিটার চোখ এখন গর্ত। কিন্তু সেই অন্ধকার গর্তের মধ্যে যেন একটা লাল আগুন জ্বলছে, একটা আরক্ত আভা ছিটকে বেরোচ্ছে। ময়লা কালো চামড়া হাতের সঙ্গে আটকানো, মাথার খুলিতে কালো চুল, ঠোঁটের ফাঁকে তীক্ষ্ণ দাঁত। দৈত্যাকৃতি মমিটাকে দেখলে ভীষণ ভয় করে, মনে হয় যেন এক্ষুণি কার ওপর লাফিয়ে পড়বে।

স্মিথ ফিরে আসে নিজের ঘরে।

দিন কাটছে। স্মিথ বেলিংহ্যামের মধ্যে কোনও নিষ্ঠুরতা বা বর্বরতা দেখে না, যে-কথা তার বন্ধু হেষ্টি বলেছিল। বরং বেলিংহ্যামের মাথায় ঘুরত নতুন

কিছু আবিস্কারের বিষয়। পৃথিবীর অনন্ত রহস্যও সে জানতে চাইছে। সে বিশেষ করে ভাবত মানুষ যদি আত্মার ওপর অধিকার স্থাপন করতে পারত! বেলিংহ্যামের আর একটা অভ্যাস ছিল নিজের মনে বকবক করা। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে নির্জন স্তব্ধতায় তার ঘর থেকে ফিসফিসানি বা চাপা গলার স্বর স্মিথ শুনতে পেত। কিন্তু কিছু জিজ্ঞাসা করলে বেলিংহ্যাম বিরক্ত হত।

নিচতলার চাকর টমাস স্টাইলসও বলছিল যে বেলিংহ্যাম কেমন যেন পাল্টে যাচ্ছে দিনদিন। সে আপন মনে কথা বলে ধমকায়। শুধু তাই নয়। মনে হচ্ছে বেলিংহ্যাম ঘরে তালাচাবি দিয়ে বেরিয়ে গেলেও ওর ঘরের মধ্যে কেউ যেন চলাফেরা করে।

স্মিথ বিস্মিত হয়। তবু টমাসের কথায় গুরুত্ব দেয় না। বুড়ো মানুষ, কি শুনতে কি শুনেছে কে জানে।

একদিন একটা ঘটনা ঘটল সেটা বেশ অস্বস্তিকর। বেশ রাতে বেলিংহ্যাম স্মিথের ঘরে এসেছে। হঠাৎ তাদের মনে হল বেলিংহ্যামের ঘরের দরজা কে যেন খুলল। সিঁড়িতে শোনা গেল কার পায়ের শব্দ। কিন্তু সব দরজা তো বন্ধ আছে। তাছাড়া এত রাতে কেই বা আসবে?

কিন্তু অস্বাভাবিকভাবে ছুটে ঘর থেকে বেরোল বেলিংহ্যাম, অর্ধেক সিঁড়ি গিয়ে কাকে যেন ধমকালো, তারপর ঘরে গিয়ে দরজায় তালাচাবি দিল। স্মিথের ঘরে ফিরে এসে বলল যে, তার কুকুরটা হঠাৎ বেরিয়ে পড়েছিল। বেলিংহ্যামকে কেমন যেন শুকনো ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

স্মিথ অবাক হয়। বেলিংহ্যামের কুকুর আছে সে তো কোনওদিন দেখেনি। তবে পায়ের শব্দটা কার তে পারে, কার?

পরদিন ভোরে কড়ানাড়ার শব্দে স্মিথের ঘুম ভাঙে। হেষ্টি ছুটতে ছুটতে এসে বলে যে কাল রাত্রে নর্টনকে কে খুন করার চেষ্টা করেছে। রাতে ফেরার সময় কলেজের গেটের সামনে হঠাৎ ওপরের বিশাল আমগাছ থেকে একটা ভয়ঙ্কর জন্তু নর্টনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লোহার সাঁড়াশির মতো হাত দিয়ে তার গলা টিপে ধরে। নর্টন মরেই যেত। হঠাৎ দু'জন লোক এসে পড়ায় জন্তুটা তাকে ছেড়ে পালায়। ঘন অন্ধকারে সেই ভয়ঙ্কর জন্তুটাকে ঠিক চেনা যায় নি। ভয়ে আতঙ্কে নর্টন আর ঘরের বাইরে বেরোয় নি।

বেলিংহ্যামই না ক'দিন আগে নর্টনকে শাসিয়েছিল?

সেদিনই বাড়ি থেকে বেরোবার সময় স্মিথ শুনল যে বেলিংহ্যামের সঙ্গে মঙ্কহাউসের ঝগড়া হচ্ছে প্রচন্ড। মঙ্কহাউস বলল যে, সে কোনও দিনই তার বোনের সঙ্গে বেলিংহ্যামের বিয়ে দেবে না। জেনেশুনে সে ঈভকে কবরে পাঠাবে না। বেলিংহ্যাম বলল যে, যদি মঙ্কহাউস তার কথা না শোনে তবে তাকে কঠিন অনুতাপ করতে হবে। অতি ক্রুদ্ধভাবে দু'জনে দু'দিকে চলে গেল।

বিকেলে নদীর ধীরে দাঁড়িয়ে স্মিথ বাইচ প্রতিযোগিতা দেখছে। হঠাৎ মঙ্কহাউস এল। কিছু কথা বলার জন্য মঙ্কহাউস তাকে নিয়ে এল নদীর ধীরেই ছোট্ট একটা বাগানবাড়িতে। নির্জনে পড়ার জন্য তার বন্ধু হ্যারিংটন এটা ভাড়া নিয়েছে।

মঙ্কহাউস বলল, 'বেলিংহ্যামের কাছ থেকে দূরে থাকাই উচিৎ।'

'কেন?'

'ও ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। ওর কথা সব আমায় বলেছে তাতেই আমি বুঝেছি ওর স্বরূপ। তুমি আজই ঘরটা পাল্টাবার চেষ্টা কর। ও হয়ত ইচ্ছাকৃতভাবে তোমার কোনও ক্ষতি করবে না, কিন্তু যে কোনও সময়েই তোমার বিপদ হতে পারে।'

স্মিথ বলিষ্ঠ ও সাহসী। সে অকারণ ভয়ে অমন সুন্দর নির্জন পরিবেশ ছাড়তে রাজী নয়। ওখানে লেখাপড়া করার খুবই সুবিধে। তবু সে মঙ্কহাউসকে ধন্যবাদ জানাল তার শুভকামনার জন্য।

সন্ধ্যা হয়েছে। অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে স্মিথ উঠছে। বেলিংহ্যামের দরজা খোলা। ঘরে কেউ নেই, কিন্তু বাতি জ্বলছে। স্মিথ উঁকি মারল ভেতরে। মমিটা নেই, শুধু বাক্সটা আছে। বেলিংহ্যাম ওটাকে হয়ত কোথাও সরিয়ে রেখেছে। স্মিথ ওপরে উঠছে। অন্ধকারে কে যেন পাশ দিয়ে ওপরে চলে গেল। গায়ে যেন ধাক্কাও লাগল। স্মিথ ডাকল, কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। কার পায়ের শব্দ ওটা? কে ধাক্কা দিল? কে?

আলো জ্বালিয়ে বসতে না বসতেই ছুটতে ছুটতে হল হেষ্টি। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল যে, মঙ্কহাউস জলে ডুবে গেছে। এখনও চেষ্টা করলে বোধ হয় তাকে বাঁচান যেতে পারে। মঙ্কহাউস আছে হ্যারিংটনের বাড়িতে।

সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নামবার সময় স্মিথ দেখল বেলিংহ্যামের দরজা তখনও

খোলা। স্মিথ ঘরের ভেতর নজর করল—তার রক্ত যেন গর্জন করে লাফিয়ে পড়ল। সেই মমিটা রয়েছে বাক্সে! আর তার চোখের কোটরের জমাট অন্ধকার থেকে আরক্ত আভা ছিটকে বেরোচ্ছে!

বিমূঢ় বিহ্বল স্মিথের হুঁশ ফিরল হেষ্টির ডাকে। দু'জনে ছুটল।

স্মিথ মঙ্কহাউসের জ্ঞান ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। অনেক প্রয়াসের পর তার চেতনা ফিরল। ভয়াল আতঙ্কে বিস্ফোরিত চোখে মঙ্কহাউস বলল, 'আমাকে কেউ ঠেলে জলে ফেলে দিয়েছে। নদীর দিকে সামনে করে দাঁড়িয়েছিলাম, কে যেন পালকের মত তুলে আমাকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল।'

'লী আমি একথা বিশ্বাস করি।' মঙ্কহাউসের কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল স্মিথ।

জমাট বাঁধা বিস্ময় নিয়ে লী মঙ্কহাউস মুখ তুলল। মৃদু স্বরে বলল, 'তুমি বিশ্বাস করছ স্মিথ!'

'হ্যাঁ'।

'ফেরার সময় স্মিথ চুপচাপ ভাবছে অনেক কথা। বেলিংহ্যামের ঘর থেকে মমিটা চলে গেল, সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ, আবার অবিশ্বাস্যভাবে মমিটার ফিরে আসা। লং নর্টন আক্রান্ত হয়েছিল ক'দিন আগে, তাকে বেলিংহ্যাম শাসিয়েছিল। আজকে লী মঙ্কহাউস আক্রান্ত—তাকেও বেলিংহ্যাম শাসানি দিয়েছিল। সমস্ত ব্যাপারগুলো আসছে একই উৎস থেকে। এবং এমন এক ভয়াবহ অলৌকিক পৈশাচিক ব্যাপার এর মধ্যে লুকিয়ে আছে যা মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। বেলিংহ্যাম নিশ্চয় অপরাধী, কিন্তু যে ভয়ঙ্কর উপায়ে সে তার কাজ সম্পন্ন করে চলছে তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়।

বাড়িতে ঢোকার সময় তাকে বেলিংহ্যাম ডাকল। শয়তানিতে তার চোখ দুটো জ্বলছে। স্মিথের মন রাগে পুড়ে যাচ্ছে। হঠাৎ বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বেলিংহ্যাম তাকে জিজ্ঞেস করল লীর কথা। রাগে ফেটে পড়ল স্মিথ। জ্বালা ভরা কণ্ঠে সে বলল, 'তুমি শুনলে খুশি হবে না যে লী বেশ ভালই আছে। বিপদের কোনও সম্ভাবনা নেই। তোমার শয়তানি এবারে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।'

অবাক হবার ভান করল বেলিংহ্যাম, 'আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্মিথ। তুমি ভাবছ আমিই লীর দুর্ঘটনার জন্য দায়ী?'

'নিশ্চয়', ক্রোধে গর্জন করে ওঠে স্মিথ, 'তোমার ওই কংকালটাকে জাগিয়ে লীর পেছনে ওকে লেলিয়ে দিয়েছে।'

বেলিংহ্যাম প্রতিবাদ করে, 'তা কি করে সম্ভব হয়?'

স্মিথ তীব্র স্বরে বলল, 'তোমাকে শেষবারের মতো সাবধান করছি বেলিংহ্যাম। তুমি এখানে থাকার সময় কলেজের বন্ধুদের যদি কোনও ক্ষতি হয়, আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো না। আর তার জন্য দায়ী থাকবে তুমিই। তোমার ওই মিশর দেশের তুকতাক শয়তানি এখানে চলবে না।'

পরদিন সন্ধ্যবেলায় স্মিথ ঘর ছেড়ে বেরিয়েছে। ডাক্তার বন্ধু প্যাটারসনের কাছে যাবে। নির্জন গাছপালাঢাকা পথ দিয়ে স্মিথ চলেছে। শান্ত বাতাস বইছে ঝির ঝির করে, আকাশে মেঘের আনাগোনা, ম্লান জ্যোৎস্নায় চারপাশ ঢাকা। নির্জন পথে স্মিথ জোর পায়ে চলছে। সামনে পার্ক, পার্কের ওপারে বন্ধু প্যাটারসনের বাড়ি। স্মিথ পার্কে ঢুকল। হঠাৎ দেখল ছায়ার মতো কি যেন একটা তার দিকে এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে—অন্ধকারে তার চোখের কোটর থেকে যেন লাল আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে।

ভয়ে আতঙ্কে প্রাণরক্ষার তাগিদে দ্রুত ছুটল। ভয়ংকর মৃত্যু ছুটে আসছে পিছনে। নুড়ি ছড়ানো পথে স্মিথের পা আটকে যাচ্ছে, সে পারছে না জোরে দৌড়তে। ভীষণ ভয়াল নেকড়ের মতো হিংস্র মমিটা তীব্র বেগে ছুটে আসছে, চোখদুটো জ্বল জ্বল করছে রক্তচুনীর মতো, কুচকুচে কালো অস্থিসর্বস্ব একটা হাত তার দিকে বাড়াল। আর পরিত্রাণ নেই। বাঁচবার অদম্য তাগিদে স্মিথ প্রাণপণে ছুটছে। সামনে প্যাটারসনের বাড়ি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দরজাটা খোলা।

আপ্রাণ প্রয়াসে দমকা হাওয়ার মতো ঘরে পৌঁছে কোনমতে খিল আটকে অস্ফুট আর্তনাদ করে অচেতনের মতো শুয়ে পড়ল।

ছুটে এল প্যাটারসন। কিছু পরে সুস্থ হল স্মিথ। বন্ধুকে বলল সব কথা। বেলিংহ্যামের অজ্ঞান হওয়া থেকে শুরু করে সব কথাই সে বলল।

প্যাটারসন বিস্ময়ে স্তম্ভিত। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না এসব।

'বিশ্বাস কর প্যাটারসন, এর একটা শব্দও মিথ্যে নয়। পুরনো পুঁথি থেকে মন্ত্র শিখে তা দিয়ে মমিকে জীবন্ত করে মানুষের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার পৈশাচিক পথ পৃথিবীতে বোধ হয় আর কেউ গ্রহণ করেনি। কিন্তু আমি এর

প্রতিশোধ নেবই। বন্ধুবান্ধবের জন্য, মানবিক আদর্শের কথা বিবেচনা করে, অন্ততঃ নিজেকে বাঁচাবার তাগিদে এটা আমার করতেই হবে।'

রাতটা বন্ধুর ওখানেই কাটাল স্মিথ। পরদিন বেরিয়ে বন্দুকের দোকানে গিয়ে ভারি একটা রিভলবার কিনে তাতে দুটো কার্তুজ ভরল। তারপর দ্রুত এল মিনারে।

কোনও রকম শব্দ না করে স্মিথ ঢুকল বেলিংহ্যামের ঘরে। বেলিংহ্যাম বসে কি যেন লিখছে। মমিটা বাক্সর মধ্যে শক্ত হয়ে শুয়ে আছে। স্মিথ সশব্দে দরজাটা বন্ধ করল।

দরজা বন্ধ করার শব্দে বেলিংহ্যাম চমকে উঠল। আরও ভীষণভাবে চমকালো স্মিথকে দেখে। স্মিথ এখনো জীবিত! স্তব্ধ বিস্ময়ে স্মিথের দিকে সে হাঁ করে চেয়ে।

স্মিথ রিভলবারটা বার করে হাতে ধরল।

'স্মিথ, কি ব্যাপার?' অস্ফুটস্বরে বলল বেলিংহ্যাম।

টেবিল থেকে ওই লম্বা ছুরিটা নিয়ে মমিটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেল!' স্মিথ দৃঢ় আদেশের স্বরে বলল। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে কাজ আরম্ভ না করলে বুলেট দিয়ে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব।'

বেলিংহ্যাম অনুনয় বিনয় করল অনেক। স্মিথ অনড়। রিভলবার ধরা তার কঠিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে ভীত বেলিংহ্যাম ছুরিটাকে মমির বুকে ঢুকিয়ে দিল। ছুরির আঘাতে আঘাতে শুকনো হাড় পাঁজরা খসে পড়তে লাগল, পুরনো ধূলোর গন্ধে ঢেকে গেল গর। শেষ পর্যন্ত মমির কংকালটা ভেঙে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ল। অন্ধকারে গহ্বরে তার চোখ দুটো যেন তখনও জ্বলছে।

স্মিথ এবার আদেশ করল কংকালটাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিতে। মমির খণ্ড বিখণ্ড অংশগুলোকে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলতে সব হু হু করে জ্বলে উঠল। মমি পোড়ার এক বিশ্রী বিকট গন্ধে ঘর ভর্তি হয়ে উঠল। অসহ্য দুর্গন্ধে স্মিথের বমি এসে গেল। কিন্তু সে দৃঢ় নির্বিকার।

কিছু পরে মমির আর চিহ্ন রইল না।

'এবার নিশ্চয় তুমি খুশি হয়েছ!' প্রশ্ন কর বেলিংহ্যাম। তার চোখে ঘৃণা, মুখে বিদ্রূপ।

'না, মমির সঙ্গে সবকিছু তোমাকে নষ্ট করতে হবে যেন ভবিষ্যতে আর বদমাইসি করতে না পার।'

বেলিংহ্যাম গাছের ছালের মত শুকনো পাতাগুলো নিয়ে আগুনে ফেলল—আগুন দাউ দাউ করে জ্বলল, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল ঘর। পরে একটা অপরূপ সুমিষ্ট সৌরভে ঘরটা আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

'এবার পুঁথিটা বার কর।' রিভলবার উঁচিয়ে স্মিথ বলল।

'পুঁথি! সেটা আবার কি?'

'প্যাপিরাস পাতার হলদে্ রঙের পুঁথি যেটা তুমি ড্রয়ারের মধ্যে চাবি দিয়ে রেখেছ।'

বেলিংহ্যাম যেন আঁতকে শিউরে উঠল। ওই মূল্যবান পুঁথি সে প্রাণ গেলেও নষ্ট করতে পারবে না। তাছাড়া ওর মধ্যে অলৌকিক শক্তির চাবিকাঠি আছে। সে স্মিথকে শিখিয়ে দেবে কেমন করে মৃত আত্মাদের রাত্রিবেলায় জাগ্রত করতে হয়, তাদের রক্ষা করতে হয়।

দৃঢ় প্রতিজ্ঞা কঠিনহৃদয় স্মিথ ড্রয়ারের চাবি খুলে পুঁথিটা টেনে বার করল। বেলিংহ্যাম বাধা দিতে এল, স্মিথ তাকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল ঘরের কোণে। পুঁথিটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নিক্ষেপ করল অগ্নিকুণ্ডে। সব ছাই হয়ে গেল।

তারপর আর বিশেষ কিছু হয়নি। অক্সফোর্ডের পুরনো এলাকায় সেইরকম ঘটনা আর ঘটেনি। বেলিংহ্যাম অক্সফোর্ড ছেড়ে চলে গেছে সুদানের দিকে। সে জানে প্রকৃতির রহস্য অসীম ঃ সেই অনন্ত রহস্যের মধ্যে সে যেতে চায়, জানতে চায় তার স্বরূপ। হয়ত সেই পথের সন্ধান এখনও সে করে চলেছে।

দি ভ্যাম্পায়ার

জান নেরুদা

কিছুদিন আগে আমরা স্টিমারে করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। স্টিমারটি আমাদের কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ থেকে প্রিন্‌কিপো দ্বীপে পৌঁছে দিল। যাত্রীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। আমাদের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের একটি পরিবার ছিল—বাবা মা, মেয়ে আর হবু জামাই আর আমরা দু'জন। তার সঙ্গে যৌবনোচ্ছল এক গ্রীক যুবককে আমি কখনও ভুলবো না। গোল্ডেন হর্ন থেকে কনস্টান্টিনোপল্‌স্‌ আসার জন্য যে কাঠের সাঁকোটা ছিল সেখান থেকে সে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। পোর্টফোলিও দেখে মনে হল সে একজন শিল্পী। গ্রীক তরুণের লম্বা কালো চুল তার কাঁধ পর্যন্ত লুটিয়ে পড়েছিল, মুখটা দীপ্তিশুন্য আর তার কালো চোখ দু'টো অক্ষিকোটরের গভীরে বসানো ছিল। সে স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে বেশ অভিজ্ঞ তার প্রথমেই আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু গেলাম আমি।

সব চাইতে পছন্দসই ছিল পোল পরিবারটি। বাবা-মা ছিলেন মিষ্টি স্বভাবের সুন্দর মানুষ, তার প্রেমিকাটি ছিল উদার মার্জিত এবং শোভন রুচি সম্পন্ন বলিষ্ঠ যুবক। অসুস্থ মেয়েটির জন্য গ্রীষ্মের দিনগুলি কাটাতে তাঁরা প্রিনকিপোতে এসেছিলেন। রূপসী ওই ফ্যাকাশে মেয়েটি হয় কোনও কঠিন রোগভোগের পর সদ্য আরোগ্য লাভ করেছে, না হয় মারাত্মক কোনও ব্যাধিতে সে ভুগছে। হাঁটার সময় মেয়েটি তার প্রেমিকের ওপর ভরসা দিয়ে চলছিল আর মাঝে মাঝেই ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ছিল। খুসখুসে কাশির জন্য মেয়েটি মৃদুস্বরে কথা বলছিল। মেয়েটি যখন কাশছিল তার সহচর হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। সহানুভূতির সঙ্গে সে মেয়েটির দিকে তাকাচ্ছিল আর মেয়েটি যেন বলতে চাইছিল, 'ও কিছু নয়, আমি ভাল আছি।' তারা ছিল স্বাস্থ্য আর সুখে বিশ্বাসী।

গ্রীক যুবকটি যে আমাদের সঙ্গে জেটি পর্যন্ত এসে বিদায় নিয়েছিল, তারই সুপারিশে পোল পরিবারটি পাহাড়ের ওপরে রমণীয় হোটেলটির সুখপ্রদ বাসকক্ষে থাকার সুযোগ পেয়েছিল। হোটেল মালিক ছিলেন ফরাসী এবং গৃহসজ্জার সচ্ছন্দতায় এবং শিল্পকুশলতায় ফরাসী রীতির একটা সুন্দর ছাপ ছিল।

আমরা একসঙ্গে প্রাতঃরাশ করেছিলাম, তারপর দুপুরের তাপ যখন অনেকটা কমে এসেছিল তখন সাইবেরিয় পাহাড়ি পাইনের সজীব শ্যামালিমায় অভিস্নাত হয়ে অনেকটা সতেজ হয়ে উঠেছিলাম। মনের মত একটা জায়গা খুঁজে পেয়ে বসতে না বসতেই সেই গ্রীক যুবকটি পুনরায় আবির্ভুত হল। সে আমাদের সম্ভাষণ করে, এদিকে সেদিকে তাকিয়ে আমাদের কিছুটা দূরে একটা জায়গায় বসে পড়ল এবং তারপর ব্যাগ থেকে কাগজ বের করে ছবি আঁকতে শুরু করল।

ওভাবে ও ইচ্ছে করেই পাহাড়ের দিকে পিছন ফিরে বসেছে, যাতে আমরা তার আঁকা দেখতে না পাই।

আমার কথা শুনে পোল যুবকটি বলল, 'দেখার দরকারও নেই, আমাদের আশে-পাশে দেখার জিনিসের অভাব নেই।' তারপর একটু থেকে সে আবার বলে ওঠে, 'আমার মনে হয় আমাদেরই পটভূমিকায় রেখে সে কোনও কিছু ছবি আঁকছে।

বাস্তবিক আমাদের সামনে দেখার মত কত কী রয়েছে। প্রিনকিপোর চেয়ে অধিকতর চিত্তহারী ও প্রীতিকর পরিবেশ পৃথিবীর আর কোথাও বোধহয় নেই। মহামতি চার্লসের সমসাময়িক রাজনৈতিক শহীদ আইরিন এখানে মাসখানেক নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। আমিও যদি একমাস এখানে থাকতে পারতাম তাহলে কেবলমাত্র প্রিনকিপোর মধুর স্মৃতিচারণের মাঝেই জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি বেশ সুখে কাটাতে পারতাম।

এখানকার বাতাস হীরের মতো স্বচ্ছ আর এত কোমল, সে হৃদয় ময়ূরের মতো নেচে ওঠে। সমুদ্রে দক্ষিণ দিকে এশিয়ার ধূসর প্রক্ষিপ্ত পর্বতচূড়া, দূরে ইউরোপের ঝকঝকে বেগুনী খাড়া উপকূল। 'প্রিন্সের আর্কিপেলাপোর'-র নয়টি দ্বীপের অন্যতম সন্নিহিত হত 'চালকি' তার প্রাইপ্রেস বনভূমিকে নিয়ে শান্তভাবে ওপরে উঠেছে বিষাদমাখা এক টুকরো স্বপ্নের মত ব্যথায় যারা কাঁদে চালকি তাদের শ্রান্ত মনে শান্তি সুধা বর্ষণ করে।

মার্মোরার ইষৎ আন্দোলিত সমুদ্র নানা রঙে ঝলসে ওঠে রঙীন ওপাল পাথরের মতো। দূরে সমুদ্র দুধের মতো সাদা, তারপর গোলাপী, দু'টি দ্বীপের মাঝে কমলা রঙে উদ্ভাসিত আর আমাদের ঠিক নিচে নীলকান্ত মণির মতো স্বচ্ছ নীল সবুজ উজ্জ্বল। মার্মোরার সমুদ্র স্বকীয় সৌন্দর্যে জ্যোতিষ্মান। কোনখানেই কোনও বড় জাহাজ নেই—কেবল দু'টি নৌকো তীর বরাবর ছুটে আসছে এবং সে দু'টিতে ইংলণ্ডের পতাকা উড়ছে পত্‌পত্‌ করে। একটি বাষ্পায়ন, চৌকিদারের চালাঘরের মতো সেটির আকৃতি। দ্বিতীয় নৌকোতে প্রায় বারো জন দাঁড়ি। তাদের সক্রিয় দাঁড়গুলি থেকে পতিত জলবিন্দু তরল রূপোর ফোঁটার মতো ঝকঝক করছিল। বিশ্বস্ত শুশুকেরা জলের ওপরে অর্দ্ধবৃত্তাকারে এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করছিল। শান্ত ঈগলেরা নীল আকাশের মাঝে উড়ছিল—যেন তারা দুই মহাদেশের ব্যবধান মাপার কাজে নিযুক্ত।

নীচের সমস্ত ঢালু জায়গাটি জুড়ে পুষ্পিত গোলাপ বন। স্নিগ্ধ সমীর গোলাপের গন্ধে ভরপুর। সমুদ্রের কাছে কফি হাউসে যে গান হচ্ছিল দূরত্বের জন্য মাঝে মাঝে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাজা বাতাসে সেই গান ভেসে আসছিল।

মনোর মোহময় পরিবেশ। আমরা সকলে নীরবে বসেছিলাম। সৌন্দর্যের

মাঝে আমাদের আত্মা যেন নিমজ্জিত হয়েছিল। পোল যুবতী তার প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে আছে। ডিম্বাকৃতি তার নিষ্প্রভ মুখের ওপর নরম একটা রঙ ফুটে উঠেছে। সহসা তার স্বপ্ননীল চোখ থেকে অবিরল ধারায় অশ্রু নির্গত হতো। তার সহৃদয় প্রেমিক সবকিছু বুঝতে পারল এবং নীচু হয়ে তার অশ্রু চুম্বন করল। মেয়েটির মায়ের চোখও জলে ভরে উঠল। এমন কি আমিও অজানা এক ব্যথা অনুভব করছিলাম।

মেয়েটি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে, 'কত সুখের এই দেশ—কত রঙ, কত রূপ। এখানে শরীর মন যে ভাল থাকবে এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।' কাঁপা গলায় তার বাবা বললেন, 'ভগবান জানেন আমার কোন শত্রু আছে কিনা—শত্রু থাকলে এখানের এই সৌন্দর্যের মাঝে তাদের আমি ক্ষমা করতাম।'

আবার আমরা চুপ করলাম। বিশ্বব্যাপী সমস্ত আনন্দের উৎসমুখ যেন আজ খুলে গেছে। প্রত্যেকেরই এরকম অনুভূতি জেগেছিল, তাই কেউ কারুর সুখে ব্যাঘাত ঘটায় নি। এমন কি কখন যে সেই গ্রীক শিল্পী কাগজ পত্র পোর্টফোলিওতে পুরে চলে গিয়েছিল জানতেও পারিনি। তখনও আমরা বসেছিলাম।

পরিশেষে ঘনিয়ে এলো একরাশ বেগুনি আঁধার, দক্ষিণ প্রান্ত যেন রঙিন এক কল্পলোক। মেয়েটির মা বললেন, 'বেলা বয়ে গেল এবার আমাদের ফিরতে হবে।' নিশ্চিন্ত শিশুর মতো সহজ স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে আমরা ওপরে উঠলাম—হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম।

হোটেলের সুন্দর বারান্দায় বসতে না বসতেই নীচে থেকে কথা কাটাকাটি আর শপথ বাক্য উচ্চারণের শব্দ এল কানে। গ্রীক যুবকটি হোটেল-মালিকের সঙ্গে বচসা করছিল। বসে বসে আমরাও তাদের বাদানুবাদ উপভোগ করছিলাম। কিন্তু এ আনন্দ বেশিক্ষণ টিকল না। হোটেল-মালিক আমাদের দিকে উঠতে উঠতে চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'আমার অন্য কোনও অতিথি না থাকলে···।'

হোটেল-মালিক ওপরে উঠে আসতেই পোলে যুবকটি তাঁকে প্রশ্ন করে, 'মশাই ওই যুবকটি কে তার নাম কী?

'কী জানি?' অসন্তুষ্ট হোটেল-মালিক বিড়বিড় করে বলে ওঠেন। তারপর নীচের দিকে বিদ্বেষ ভরা চোখে তাকিয়ে বললেন, 'আমরা তাকে রক্তশোষক

বলি। আটিষ্ট! সুন্দর ব্যবসা! শুধু মৃতদেহের ছবি আঁকে সে। যেদিন এবং যখনই কন্‌স্টানন্টিনোপ্‌ল্‌ এবং তার আশেপাশে কেউ মরে যায় ঠিক সেইদিনই মৃতের ছবি শেষ করে সে। আশ্চর্য ব্যাপার! পিশাচটি আগে থেকেই তাদের ছবি এঁকে রাখে—শকুনের মত তারও কোনও ভুল হয় না।'

মা ভয়ে কেঁপে উঠলেন। মূর্ছিত হয়ে মেয়েটি তার মার বুকে ঢলে পড়ল। খড়ির মতো সাদা হয়ে উঠেছে তার মুখ। পোল-প্রেমিক এক লাফে নীচে নেমে গেল এবং এক হাতে গ্রীক যুবকটিকে ধরল অন্য হাতে ছুরিটি ছিনিয়ে নিল। আমরাও তার পিছু পিছু ধাওয়া করলাম। তারা দু'জন বালিতে ধস্তাধস্তি করছিল। কাগজ-পত্র রঙ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে আছে। একটি কাগজে রঙীন খড়ি দিয়ে সে পোল মেয়েটি এঁকেছে, মুদিত তার চোখ আর কপালে একগুচ্ছ মাধবী লতার মালা।

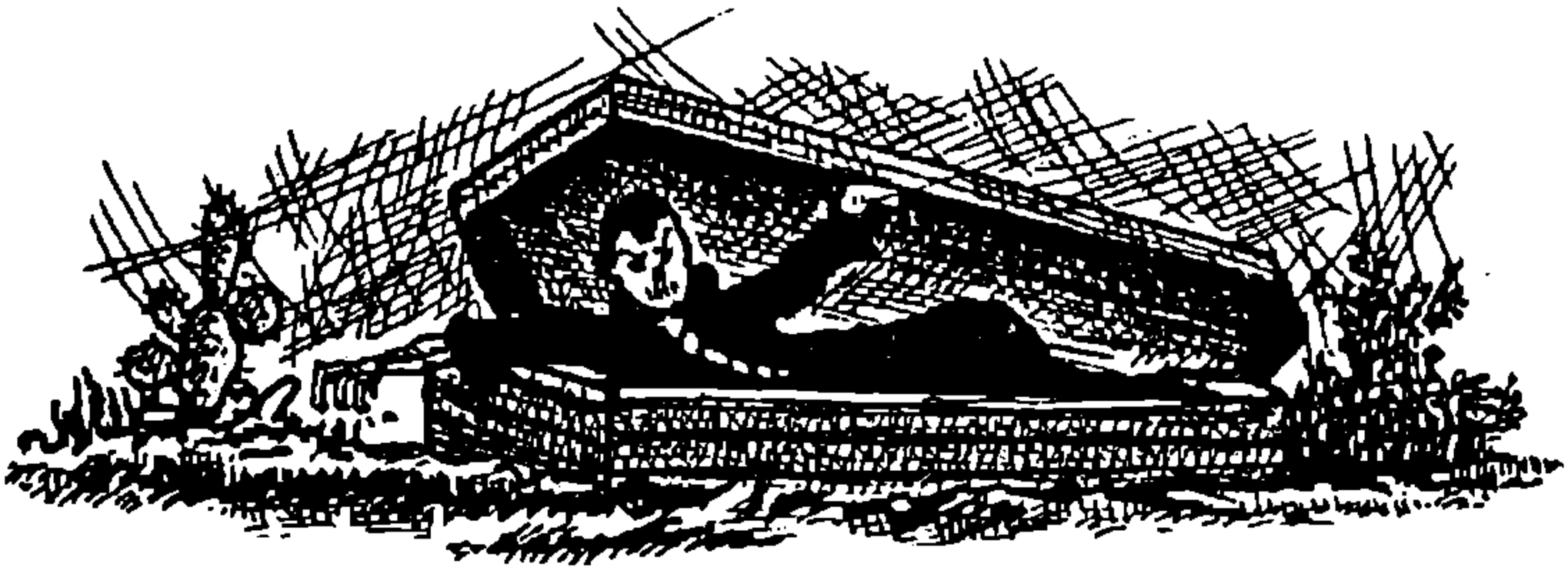

ড্রাকুলা

ব্রোম স্ট্রোকার

জোনাথন হারকার সবে আইন পাশ করেছে। সে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা বলিষ্ঠ বুদ্ধিমান। একটা জরুরী কাজের ভার নিয়ে সে চলেছে অনেক দূরে, ইউরোপের প্রান্তভাগে। সেখানে ট্রানসিলভিনিয়া অঞ্চলের এক প্রাচীন অভিজাত বংশীয় কাউন্ট ড্রাকুলা লণ্ডনে একটা বিরাট সম্পত্তি কিনছেন। এবং এক প্রখ্যাত আইনজীবী সংস্থার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় আইন সংক্রান্ত কাজকর্ম সারার জন্য জোনাথন হারকার সেখানে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য সদ্য আইনবিদের পক্ষে কাজটা ভালই—জোনাথন যেতে যেতে ভাবছিল। কিন্তু একটা ভয় আর আতঙ্কে গা ছমছমকরা ভাব পরিবেশকে কেমন যেন শিউরে দিচ্ছে। অজ্ঞাত এক আশংকায় অস্থির হয়ে উঠছে তার চেতনা। বিভিন্ন ভাবনার সঙ্গে জোনাথনের বার বার মনে পড়ছে ভাবী বধূ মীনার কথা।

ট্রেনের অতি দীর্ঘ পথে অনেক রাস্তা দিয়ে মিউথিন ভিয়েনা; ক্লসেনবার্গ হয়ে

জোনাথন বিসাজে পৌঁছল সন্ধ্যায়। কাউন্ট ড্রাকুলার নির্দেশানুযায়ী গোল্ডেন ক্রোন হোটেলে ওঠে। সেখান থেকে পরদিন ঘোড়ায় টানা গাড়িতে খানিকটা গিয়ে কাউন্টের পাঠানো গাড়িতে তার প্রাসাদ দুর্গে যাওয়ার কথা।

কিন্তু আশ্চর্য! জোনাথন ড্রাকুলার প্রাসাদে যাবে শুনে সকলেই কেমন যেন ভীত আতঙ্কিত। শেষ পর্যন্ত মালিকের স্ত্রী সরল পবিত্র স্বভাব মহিলাটি এগিয়ে এসে জোনাথনকে ড্রাকুলার প্রাসাদে যাওয়া বন্ধ করতে চাইলেন। তিনি কাকুতি মিনতি করলেন জোনাথনকে যেন সে না যায়। জোনাথন তাঁর রকম সকম দেখে অবাক হল, কিন্তু তাকে তো যেতেই হবে। তখন তিনি ক্রুশটা জোনাথনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'মনে কোরো, তোমার মা এটা তোমায় দিয়েছে।'

হোটেল থেকে গাড়িতে ওঠার সময় জোনাথন দেখল লোকেরা (যারা কেউই তাকে চেনে না) তার দিকে তাকিয়ে কি সব বলাবলি করছে ও বুকে পবিত্র ক্রুশ আঁকছে। গাড়ি যাচ্ছে। সহযাত্রীরা কেমন ভাবে যেন তাকায় তার দিকে। গাড়ি অতি দ্রুত ছুটে চলেছে কিসের যেন আশংকায়। জোনাথন কিছু বোঝে না, কিন্তু এক অস্বাচ্ছন্দ্য অজানা আতঙ্ক অনুভব করে। তবু চারপাশের সৌন্দর্য তাকে ভুলিয়ে দেয় সব কিছু।

রাত্রি ঘনায়, অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসে। আকাশে মেঘের সমারোহ, পরিবেশ বজ্রপাতের আশংকায় ত্রস্ত। নির্দিষ্ট জায়গায় গাড়ি দাঁড়ায়। হঠাৎ কুচকুচে কালো ঘোড়ার একটা ফিটন এল। জোনাথনের সহযাত্রীরা ভয়াল আতঙ্কে কম্পমান। ওই গাড়ির কোচয়ানের অদ্ভুত দৃঢ় সবল হাতের সাহায্যে জোনাথন তাতে উঠল। পিছনের গাড়ি জোনাথনকে নামিয়ে অস্বাভাবিক দ্রুতবেগে প্রাণপণ দৌড়ল, তার ঘোড়াগুলি থরথর কাঁপছে। আর যাত্রীরা বুকে আঁকছে ক্রুশচিহ্ন, ভগবানকে কাতর ভাবে ডাকছে—'হে ঈশ্বর, রক্ষা কর'।

এদের গাড়ি রুক্ষ পার্বত্য পথে চলছে। হঠাৎ যেন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা জোনাথনকে অসাড় করে দিল, কুকুরের অসহ্য চিৎকার শোনা গেল, নেকড়ের রক্তলোলুপ গর্জন হাড় কাঁপিয়ে দিল। বাতাসের শনশন, হিমেল হাওয়ায় তীক্ষ্ণতা, গাঢ় অন্ধকারের কম্পমান ভয়াল নীল শিখা—দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন জোনাথন পৌঁছল ড্রাকুলার ভগ্ন বিশাল প্রাসাদে। চাঁদের আলোয় অপ্রাকৃত পরিবেশে অদ্ভুত রহস্যময় অপার্থিব মনে হচ্ছে সেই প্রাসাদকে।

কাউণ্ট এসে আন্তরিক অভ্যর্থনা করে জোনাথনকে তাঁর সুন্দর আলোকিত উত্তপ্ত ঘরে নিয়ে গেলেন। তাঁর সুন্দর আলোকিত উত্তপ্ত ঘরে এসে জোনাথন খুব খুশি হল। তার ক্লান্তি ভীতি কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। হাত মুখ ধুয়ে খাবার ঘরে এল, পরম পরিতৃপ্তিতে খাওয়া দাওয়া করল। জোনাথন কাউণ্টকে সলিসিটর মিঃ হকিন্সের চিঠি দিল। কথা চলছে। সে ভালভাবে তাকাল কাউণ্টের দিকে।

অদ্ভুত চেহারা কাউণ্টের। অত্যন্ত বলিষ্ঠ দেহ, ঈগলের ঠোঁটের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণ নাক, বেঁটে রুক্ষ আঙুল, ধারাল লম্বা নখ, এবং আশ্চর্যজনক ভাবে ঝকঝকে সাদা ধারালো দাঁত আর টুকটুকে লাল ঠোঁট, আর কাউণ্টের গায়ে একটা বীভৎস ভ্যাপসা গন্ধ।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর জোনাথন শুতে গেল। নির্জন স্তব্ধতার মধ্যে হিংস্র নেকড়ের ডাক শুনতে শুনতে বিস্মিত শিহরিত জোনাথন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকাল, কাউণ্ট নেই। জোনাথন প্রাতঃরাশ সেরে প্রাসাদ দেখছে—অদ্ভুত সুন্দর সুসজ্জিত। এত বিরাট বাড়ির কিন্তু দুটো ত্রুটি আছে। এক কোন চাকর-বাকর নেই; আর কোথাও একটাও আয়না নেই। পড়ার ঘরে থরে থরে বই সাজানো। যখন কাউণ্ট এলেন অনেক আলোচনা হল। লণ্ডন সম্বন্ধে ওনার খুব আগ্রহ, ওবিষয়ে পড়াশুনা করেছেন বিশেষভাবে, ওখানকার রীতিনীতি জীবনচর্চা জেনেছেন। ওখানে দীর্ঘ বিশাল এলাকার গীর্জাসহ নির্জন শান্ত বাগানবাড়িটা কিনে ওনার আনন্দের সীমা নেই। লণ্ডন ছাড়া আরো দুটো জায়গা সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত আগ্রহ দেখা গেল—এক্সেটার ও হুইটবী সম্বন্ধে তার বিশেষ কৌতূহল।

কিন্তু তবু কেমন যেন একটা অস্বস্তি আতঙ্ক জোনাথনকে চেপে ধরে। একদিন এক ঘটনা ঘটে। জোনাথন নিজের ছোট আয়নায় দাড়ি কামাচ্ছে, হঠাৎ পেছন থেকে কাউণ্ট তার পিঠে হাত রাখেন। কি আশ্চর্য, আয়নায় কাউণ্টের ছায়া পড়ছে না। জোনাথন ভয়ে চমকে ওঠে, গাল কেটে যায়। সেখানে রক্তের ফোঁটা।

হঠাৎ কাউণ্ট হিংস্রভাবে তাকালেন, চোখে আগুন জ্বলছে, তিনি জোনাথনের গলাটা চেপে ধরে মুখটা কাছে আনলেন। জোনাথনের গলার ক্রশে ওনার হাত লাগল। উনি সরে গেলেন, সেই শান্ত প্রসন্ন মানুষটা ফিরে এল। উনি জোনাথনের

আয়নাটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ওটার জন্যই নাকি জোনাথনের মুখ কেটে গেছে।

প্রাসাদটা বিশাল। একটা অত্যুচ্চ গিরিশিখরে ওটা অবস্থিত। তলায় মাটি হাজার ফিট নীচে। চারপাশের আশ্চর্য সুন্দর প্রকৃতি—সবুজের সমারোহ। প্রাসাদের মধ্যে কত কক্ষ, সবই বন্ধ। বাইরে যাবার বিশাল দরজায় চাবি দেওয়া। বেরোবার কোন পথ নেই। আসলে প্রাসাদটা এক বিরাট কারাগার আর এক অসহায় মানুষ তাতে বন্দী। সেই ক্রুশটাকে ধরে জোনাথন শান্তি পায়। কাউণ্ট তাকে বারণ করেছেন নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও যেতে।

একদিন এক দৃশ্যে জোনাথন পাথর হয়ে গেল আতঙ্কে। গভীর রাত্রে জোনাথন তার ঘরে জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ দেখল কাউণ্ট তার ঘরের জানলা খুলে বেরিয়ে এসে সেই ভীষণ খাড়া দেওয়াল বেয়ে নেমে যাচ্ছেন, কালো আলখাল্লাটা দেখাচ্ছে দুটো বিরাট কালোরঙের ডানার মতো। কাউণ্ট গিরগিটির মতো সেই ভীষণ খাড়াই পথ বেয়ে নেমে গেলেন। জোনাথনের সমস্ত চেতনা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কাউণ্ট মানুষ না কোন জীব, কোনও অপ্রাকৃত প্রাণী!

কাউণ্টকে ওভাবে আর একদিন দেখল জোনাথন। একটা ডানামেলা বিশাল বাদুড় যেন উড়ে যাচ্ছে।

কাউণ্টের সতর্ক উপেক্ষা করে জোনাথন প্রাসাদের অন্য ঘরে যায়। কি একটা রহস্য যেন ফিরে আসছে যার স্বরূপ তাকে জানতেই হবে। একটা ঘর যাদুর মতো তার মনে অলৌকিক মায়া বিস্তার করে।

রাত গভীর। নরম স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না, বাইরে উদার বিশাল প্রকৃতির কমনীয় নিবিড় সৌন্দর্য। সে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। হঠাৎ জেগে উঠে তার মনে হল ঘরে সে একা নয়। সে দেখল তিনটি সুসজ্জিত অভিজাত রূপসী তরুণী তার সামনে বসে। অপরূপ সুন্দরী রূপবতী তারা, ঝকঝকে সাদা দাঁতগুলো তাদের কামনামদির ঠোঁটের পাশে মুক্তোর মতো ঝলমল করছে। তার প্রিয়তম মীনার কথা গভীরভাবে মনে থাকলেও জোনাথনের একটা লোভী মত্ত বাসনা জাগল—ওরা যেন তাকে চুম্বন করে। তারা হেসে উঠল, রূপোলী হাসি গানের মতো মধুর কিন্তু কেমন যেন অমানবিক ধাতব কঠিন। ওদের মধ্যে আশ্চর্য সুন্দর মেয়েটি এল, জোনাথনের ওপর ঝুঁকে পড়ল। তার নিঃশ্বাস গায়ে লাগছে,

একটা অদ্ভুত মাদকতায় আচ্ছন্ন হচ্ছে সে, মেয়েটি জিভ চাটছে, তাঁর আরক্ত ঠোঁট ও লাল জিভের পাশে তীক্ষ্ণ দাঁত আস্তে আস্তে বসে যাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণায় জোনাথন চোখ বুজল।

কিন্তু বিদ্যুতের মতো আর একটা অনুভূতি জোনাথনকে চমকে তুলল—কাউণ্ট এসেছেন। ক্রুদ্ধ কাউণ্টের বলিষ্ঠ হাত মেয়েটির কোমল ঘাড় ধরে প্রচণ্ড বেগে সরিয়ে দিল। তাঁর চোখ রাগে জ্বলছে, সাদা দাঁত কিড়মিড় করছে, গালদুটো হয়ে গেছে রক্তিম। লাল চোখে আলো পড়ে নরকাগ্নির মতো ঝলসে উঠছে, মৃত্যুবিশীর্ণ মুখের রেখা লৌহ শলাকার মতো কঠিন নাকের ওপর জোড়া ভ্রূ গনগনে ধাতুর মতো। কঠিন হাতে তাদের সরিয়ে কাউণ্ট বললেন 'ক সাহসে তোমরা এর গায়ে হাত দিচ্ছ? লোকটি আমার। সাবধানে থাকবে না হলে চরম শাস্তি দেব।'

'আজ রাতে আমাদের জন্য কিছু আনো নি?' একজন বলল।

কাউণ্ট হাতের ব্যাগটা দিলেন। জোনাথন আতঙ্কে কেঁপে উঠল—ব্যাগে যেন এক অর্ধমৃত শিশুর কান্না শোনা যাচ্ছে! মেয়েরা ব্যাগটা নিয়ে চলে গেল। তারা জানলা ভেদ করে বাইরের জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গেল, ধূসর ম্লান ছায়া হয়ে আস্তে আস্তে শূন্যে বিলীন হয়ে গেল। আর সহ্য করতে পারল না জোনাথন, সে অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ভয়ংকর আতঙ্কে জোনাথনের সময় কাটছে। অলৌকিক ভয়াবহতা তাকে উন্মাদ করে দিচ্ছে। অথচ মুক্তির কোনও পথ নেই। একদিন কাউণ্ট এসে তাকে তিনটি চিঠি দেখালেন। প্রথমটিতে লেখা জোনাথনের বাড়ি রওয়ানা হবার আসন্ন সংবাদ, দ্বিতীয়টিতে যাত্রা করার সংবাদ ও তৃতীয়টিতে বাড়ির পথে প্রাসাদদুর্গ থেকে বিসট্রিজে পৌঁছনোর কথা। চিঠিতে সাতদিন অন্তর তারিখ দেওয়া।

একদিন প্রাসাদ প্রাঙ্গনে একদল জিপসীকে দেখে জোনাথন মীনা ও মিঃ হকিন্সকে দুটো চিঠি লিখে ডাকে দেবার ইঙ্গিত করে ওপর থেকে তাদের ফেলে দিল। কিছু পরে কালো মুখে শয়তানী ভরা চোখে কাউণ্ট চিঠিগুলো এনে তাকে দেখাল ও নষ্ট করল।

একরাত্রে জোনাথন প্রাসাদ অলিন্দে জানালার ধারে বসে। হঠাৎ দেখল চাঁদের

আলোয় ভাসমান অজস্র বিন্দু সূক্ষ্ম ধূলিকণার মতো, নর্তকীর নিপুণ ছন্দে ওরা নেচে নেচে বেড়াচ্ছে, অদ্ভুত তার মাদকতা। দূর থেকে শোনা যাচ্ছে কুকুরের হিংস্র চিৎকার; তারই মধ্যে ভাসমান আলোকজ্জ্বল ধূলিকণাগুলো যেন রূপ পরিগ্রহ করছে—তারা সেদিনের সেই তিনটি শয়াতানি নারী মূর্তি! ভয়ে আতঙ্কে জোনাথন নিজের ঘরে ছুটে এল। হায় ভগবান! এ কোন পৈশাচিক স্থানে সে এল! সে কি কোনওদিন ফিরবে না, দেখবে না মীনাকে, মিলবে না বন্ধুজনের সঙ্গে।

ঘন্টা দুই পর কাউন্টের ঘর থেকে নড়াচড়ার শব্দ আর শিশুর আর্তবিলাম শোনা গেল। তারপর শীতল স্তব্ধতা। শিশুটাকে বাঁচাতে জোনাথন ছুটল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ। কিছু পরে প্রাসাদের নীচে উঠোনে শোনা গেল এক নারীর অসহায় কান্না—'শয়তান, আমার বাচ্চাকে ফিরিয়ে দে।' হাঁটু গেড়ে বসে প্রাসাদের দিকে হাত তুলে অভাগিনী নারীটি যন্ত্রণায় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কেঁদে চলল। তখন প্রাসাদের চূড়া থেকে শোনা গেল কাউন্টের অমানবিক কণ্ঠস্বর, পৈশাচিক আহ্বান চারপাশ থেকে ক্রুদ্ধ গর্জন করতে করতে ছুটে এল হাজার নেকড়ের দল, অচিরে মায়ের কণ্ঠ স্তব্ধ হল, নেকড়েরা জিভ চাটতে চাটতে চলে গেল। ভালই হল, সন্তানহারা মায়ের এই পরিণতিই ভাল।

জোনাথন মুক্তি বাসনায় ব্যাকুল উন্মত্ত। এভাবে সে পিশাচের হাতে মরবে না, বাঁচবেই। জোনাথন লক্ষ্য করে দেখল এখানে যা কিছু ঘটছে সব রাত্রিতে; তাছাড়া দিনের বেলা কাউন্টকে কখনও দেখা যায় না। দুঃসাহসী জোনাথন দুর্বার তাগিদে মুক্তির পথ খুঁজছে।

কাউন্টের মতো জানলা গলে যাওয়া যায় কি? কিন্তু নীচের দিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে গেল, ভয়ংকর খাড়াই বেয়ে মানুষের পক্ষে নাম অসম্ভব। ও পথে যাওয়া মানে নিশ্চিত মৃত্যু।

জোনাথন দেখল বাইরে যাবার সব দরজায় তালাচাবি দেওয়া। চাবিগুলো পেতেই হবে। সে কাউন্টের ঘরে ঢুকল। ঘর খালি, কেউ নেই। একটা সিঁড়ি দিয়ে সে নামছে। নামতে নামতে মাটির স্যাঁতস্যাঁতে গন্ধ পেতে পেতে এক পারিবারিক কবরখানায় সে এল। সেখানে পরপর সাজানো দুসারি কফিন।

পঞ্চাশটা বড় বড় কাঠের বাক্স মাটি দিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। জোনাথন বেরোবার চাবি কোথাও পাচ্ছে না। চাবি কোথায়! উন্মত্ত দৃঢ়তায় সে কফিনের ডালাগুলো খুলতে লাগল। তৃতীয় বাক্সটা খুলেই শিউরে উঠল। ঠাণ্ডা হিম স্রোত বয়ে গেল তার শিরা উপশিরা দিয়ে। কি ভয়ংকর দৃশ্য!

কি ভয়ংকর! মাটি ভর্তি বাক্সে কাউণ্ট শুয়ে। তিনি জীবিত না মৃত! চোখ দুটো খোলা ও নিথর, কিন্তু মৃত্যুর চিহ্ন নেই। রঙিন গালে জীবনের উত্তাপ, ঠোঁটদুটো লাল। ওর কাছে চাবি আছে মনে করে হাত দিতেই মৃতচোখদুটো ঘৃণায় ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠল। এই অমানবিক দৃশ্য দেখে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে জোনাথন পালিয়ে এল তার ঘরে।

কাটল আর এক দিন। জোনাথনের সময় ঘনিয়ে আসছে—পিশাচের হাতেই তার মৃত্যু। হয়ত সেদিনই তার শেষ দিন। রাত্রিবেলায় জোনাথন স্পষ্ট শুনতে পেল কাউণ্ট তিন পিশাচ মেয়েকে বলছে যে তারা কালই জোনাথনকে পাবে, তার রক্ত পান করবে। জোনাথনকে মুক্তি পেতেই হবে। সব দরজায় তালা বন্ধ। কোথায় চাবি, চাবি কোথায়? হয়ত সেই শয়তানটার কাছেই আছে। উন্মত্ত জোনাথন এল কফিন ঘরে। কাউণ্টের কফিনের ডালা খুলে সে শিউরে উঠল। কাউণ্ট শুয়ে আছে কিন্তু যৌবনকে যেন অনেকটা ফিরে পেয়েছে। সাদা চুল কালো হয়েছে, গাল হয়েছে নিটোল। চামড়ায় লালের আভা। মুখটা লাল হয়ে রয়েছে। ঠোঁটে লেগে আছে টাটকা রক্ত। রক্ত মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে চিবুক গলা ভিজিয়ে দিচ্ছে। ঘৃণ্য কুৎসিত ভয়াবহ জীবটার চোখ জ্বলছে।

জোনাথন অনেক খুঁজেও চাবি পেল না। কাউণ্টের মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি তাকে পাগল করে দেয়। একেই লণ্ডনে পাঠাবার জন্য সে এসেছে! এই কাউণ্ট কত শত বছর ধরে তার রক্ত-তৃষ্ণা মেটাবে আর তৈরি করবে এরকম শয়তানের দল! উন্মাদ জোনাথন একটা শাবল তুলে কাউণ্টের মাথায় সজোরে মারে। কিন্তু কিছু ক্ষতি হয় না, শাবলটা ছিটকে পড়ে। জোনাথনের চোখের ওপরে পড়ে কাউণ্টের চোখ, তাতে সর্পিল ভয়াবহতা ও নরকের আগুন, আর কাউণ্টের মুখে রক্তলোলুপতা, নারকীয় বীভৎসতা ও ভয়াল বিদ্বেষ।

হায় ঈশ্বর, তুমি বল কি করবে জোনাথন। তার মৃত্যু যে আসন্ন। তলায় জিপসীদের চিৎকার কোলাহল। তারা প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসেছে। জোনাথন

কাউন্টের ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। কিন্তু সব পথ তো রুদ্ধ। জিপসীরা কাঠের বাক্সগুলো পেরেক দিয়ে ঠিক করছে। তারা কিছুক্ষণ কাজ করল। তারপর চলে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল তাদের কণ্ঠ ও গানের সুর, গাড়ির আওয়াজ। তারা শুনতে পেল না জোনাথনের আর্তকণ্ঠ। কিন্তু জোনাথনকে মুক্তি পেতেই হবে। তিন শয়তানীর সঙ্গে সে থাকবে না, থাকবে না ভয়ঙ্কর প্রেতদানব কাউন্টের সঙ্গে। মরবে না সে কিছুতেই। এই ভয়ংকর নরকে পিশাচের হাতে মৃত্যু নয়। কিন্তু পথ কোথায়, কোথায় পথ? পথ সে পাবেই বেরোবার, না হলে ভয়ঙ্কর খাড়াই পাহাড়ের গা তো আছেই, সেখানেই তার ভবিতব্য। ভগবান তুমি আছ, তুমি শয়তানের থেকেও শক্তিশালী। জোনাথন মুক্তি পাবে, পাবে মৃত্তিকার ছোঁয়া। বিদায় মীনা, বিদায়!

ইংলণ্ডের হুইটবী অঞ্চলে কুমারী লুসি ওয়েস্টেনরা থাকে। হুইটবী অত্যন্ত মনোরম জায়গা। নদী বয়ে যাচ্ছে কুলকুল ধ্বনিতে, সমুদ্রের কাছে গিয়ে তা বিশাল হয়ে ওঠে। মোহনার মুখে সেতুতে দাঁড়ালে চারপাশের দৃশ্য আশ্চর্য লাগে। উপত্যকায় সবুজের সমারোহ। পুরনো শহরের বাড়িগুলো ছবির মতন। শহরের মাঝখানে একটা গীর্জা। অন্যপ্রান্তে সমাধিক্ষেত্র সংলগ্ন গীর্জার দৃশ্য অতি মনোরম। বন্দরটাও সুন্দর। দূরে সমুদ্রের মাঝখান থেকে এক উঁচু খাড়া পাহাড় উঠেছে। দূরের সমুদ্রে জাহাজ ডুবলে পাহাড়ের বয়ার বিষণ্ণ করুণ ঘন্টাধ্বনি শোনা যায়।

প্রিয় বান্ধবী লুসির আমন্ত্রণে মীনা মুরে হুইটবীতে বেড়াতে এসেছে। লুসির সঙ্গে বিয়ে হবে আর্থার হোমউডের। লুসির সঙ্গে বন্ধুত্ব রয়েছে তরুণ বিশিষ্ট মনস্তাত্বিক চিকিৎসক ডাক্তার জন মেওয়ার্ডের ও প্রাণচঞ্চল উচ্ছল আমেরিকান তরুণ মরিসের। ওরা লুসিকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। লুসি ও মীনা অকপটে তাদের হৃদয়ের কথা তুলে ধরে পরস্পরের কাছে। লুসি বলে আর্থারের কথা— তাদের প্রেম প্রীতি ভালবাসার গান শোনায়। মীনার মনে এক অদ্ভুত ভয় আর ভাবনা, জোনাথনের সঠিক খবর সে পাচ্ছে না। জোনাথন তাকে চিঠি লিখবে না ভাবাই যায় না। কি যে হল জোনাথনের!

এর মধ্যে হুইটবীতে এক অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। যদিও প্রকৃতি ছিল অত্যন্ত শান্ত, কিন্তু রাত্রিবেলায় সমুদ্রে এক প্রচণ্ড আলোড়ন ওঠে, অকল্পনীয়

দ্রুতবেগে ঝটিকা এসে সব তছনছ করে দেয়, সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর দৈত্যের মতো হয়ে ওঠে সমুদ্র—গিরিশৃঙ্গকে যেন উপড়ে ফেলবে, তটভূমিকে খান খান করে দেবে। ঝড় থামেও হঠাৎ। একটা রাশিয়ান জাহাজ চড়ায় আটকে থাকে। তাতে পঞ্চাশটা বড় বড় কাঠের বাক্স। জাহাজে কোনও লোক নেই। খালি ইঞ্জিন ঘরে জাহাজের ক্যাপটেনের মৃতদেহ। যার মুখে অস্বাভাবিক আতঙ্কের ভয়াবহ রূপ! ক্যাপটেনের খাতায় ভয়ঙ্কর কথা লেখা আছে—

মাটি ভর্তি পঞ্চাশটা বাক্স নিয়ে জাহাজটা আসছিল। কয়েকদিন পরে নাবিকদের মধ্যে কেমন যেন চাঞ্চল্য দেখা দিল। জাহাজে কোনও অলৌকিক জিনিস, একটা অস্বাভাবিক কিছু আছে। জাহাজ থেকে একে একে নাবিকরা হারিয়ে যেতে শুরু করল। অবশেষে ক্যাপটেন ছাড়া বেঁচে আছে একমাত্র তার সহকারী। যে ভয়ে উন্মাদ। সে কেমন যেন বুঝতে পারছে ওই ভয়ংকর অলৌকিকের কথা। একদিন বড় বাক্সগুলোর ডালা খুলে সে রহস্যকে জানতে গেল; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত জল করা চিৎকার করে ও অস্বাভাবিক আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এল—'বাঁচাও বাঁচাও, আমি দেখেছি ওকে— জেনেছি ওর রহস্য। হায়, সমুদ্র ছাড়া কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবে না ওর হাত থেকে।' সে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ল। ক্যাপটেন সেই ভয়ঙ্কর অতি প্রাকৃতকে দেখেছে, কিন্তু সে পরাজয় স্বীকার করবে না, যদি মরতে হয় বীরের মতই মরবে।

বীর ক্যাপটেনের মৃতদেহ জাহাজে পাওয়া গেল। সমারোহে তাকে সমাহিত করা হল।

হুইটবীর প্রান্তরে মৃত্যুর হিমেল ছায়া, বাতাসে মৃত্যুর গন্ধ, আকাশে মৃত্যুর হাতছানি। মীনা লুসির কাছে শোয়। একদিন রাতে জেগে উঠে মীনা দেখে লুসি কোথাও নেই—বিছানায় না, ঘরে না, সারা বাড়িতেও না। বাইরের দরজা খোলা। মীনা বাইরে আসে। নির্জন নিস্তব্ধ পৃথিবী। চাঁদের আলো ঝলসে উঠেছে দিগন্ত প্রসারিত শস্যক্ষেত্রে। হঠাৎ মীনা দেখল সমাধি প্রাঙ্গণের সামনে বেদীতে শুয়ে আছে লুসি আর একটা কালো ছায়া, তার উপর ঝুঁকে আছে। মীনা চিৎকার করে উঠল, 'লুসি লুসি!' ছায়ামূর্তিটা চোখ তুলল—তার মুখ সাদা, চোখগুলো লাল জ্বলছে। মীনা ছুটে এল। লুসি নিঃসাড়, পাশে কেউ নেই, ছায়ামূর্তি মিলিয়ে গেছে। লুসির ঠোঁট দুটো আধখোলা, দ্রুত নিঃশ্বাস পড়ছে, কেমন যেন সে

কেঁপে উঠছে ঠাণ্ডায়। ক্লান্তি আশংকা ও ভয়ে অবশ মীনা কোনওরকমে তাকে ঘরে আনে। লুসির গলায় পিন ফোটার মতো দাগ। কিন্তু আশ্চর্য! অসুস্থ নয়, সকালে ঘুম ভেঙে লুসিকে যেন আরো ভাল দেখাচ্ছিল।

পরের রাতেও লুসি বেরোবার চেষ্টা করল। কিন্তু দরজা তালা বন্ধ থাকায় ও মীনা জোর করায় ও যেতে পারল না। তার পরের রাতেও মীনা হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখল লুসি জানলার দিকে মুখ করে রয়েছে ও উপছে পড়া জ্যোৎস্নার আলোয় রহস্যময় পরিবেশে একটা বড় কালো বাদুড়, যে জানলার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরের রাতেও দেখা গেল লুসি জানলায় মাথা দিয়ে যেন ঘুমোচ্ছে আর পাশেই বিরাট একটা পাখি। পরের দিনেও একই ঘটনা ঘটল। লুসি দিনদিন কেমন যেন ম্লান বিশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তার গলার ক্ষতটা বেড়েই যাচ্ছে। লুসির মাও অসুস্থ, তার ওপর মেয়ের ভাবনা। এদিকে মীনা জোনাথনের সম্বন্ধে জরুরী খবর পেয়ে চলে গেছে।

লুসির ভাবী স্বামী আর্থার লুসির জীর্ণ শীর্ণ ক্লান্ত রূপ সইতে পারে না। সে ডাক্তার জন সেওয়ার্ডকে সব জানায়। ডঃ সেওয়ার্ড দেখে শুনে কেসটাকে বেশ জটিল মনে করে। সে তার শিক্ষক বিশিষ্টতম চিকিৎসক ও জটিল দুরারোগ্য রোগবিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ভান হেলসিঙকে সব জানায়। ডঃ হেলসিঙ ব্যাপারটাতে আগ্রহী হল। আর্থার তার বাবার বাড়াবাড়ি অসুখের খবর পেয়ে চলে যায়।

ডঃ ভান হেলসিঙ লুসিকে দেখেন। তিনি একটা গুরুতর ভয়ংকর কিছু আশঙ্কা করছেন। তিনি ডাক্তার সেওয়ার্ডকে দায়িত্ব দিয়ে চলে গেলেন ও বললেন লুসির সম্বন্ধে প্রত্যহ খবর জানাতে। লুসির অবস্থা খারাপের দিকে যায়। ডঃ ভান ছুটে এলেন।

লুসিকে দেখাচ্ছে মড়ার মতো, তার মুখ খড়ির মতো সাদা, ঠোঁটে লালচে ভাব একেবারেই নেই, মুখের হাড় বেরিয়ে আসছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। ডঃ ভান বিবর্ণ মুখে বললেন, 'এক্ষুণি ওকে রক্ত দিতে হবে।'

আর্থার এসে পড়েছে ততক্ষণে। সে রক্ত দিল, লুসির মুখে রক্তিম আভা আস্তে আস্তে ফিরে এল। লুসির গলার দাগগুলো ডঃ ভানের নজরে পড়ল। তাঁকে অত্যন্ত চিন্তান্বিত মনে হল।

পরপর দু'রাত ডঃ সেওয়ার্ড সারাক্ষণ জেগে লুসিকে চোখে চোখে রাখলে,

তৃতীয় রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে ডঃ ভান আসেন। তারা দু'জনে লুসির ঘরে যান। কি সাংঘাতিক! বিছানায় লুসি শুয়ে, আরো ফ্যাকাসে রোগা, ঠোঁটগুলোও সাদা হয়ে গেছে, মাড়ি শুকিয়ে চোয়ালের হাড় বেরিয়ে এসেছে—যেন কতকালের রোগে ভোগা মৃতদেহ। এবার আরো মারাত্মক অবস্থা। রক্ত দিল জন সেওয়ার্ড। এবারের মতো আবার বেঁচে গেল লুসি। সারাদিন ভালই ঘুমোল সে।

ডঃ ভান সেওয়ার্ডকে বললেন ভাল করে খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম নিতে। তিনিই সেদিন লুসির কাছে থাকবেন। সেওয়ার্ডের সাহায্যের এখন প্রয়োজন। ভীষণ প্রয়োজন। ওরা দু'জনেই ব্যাপারটা দেখবেন শেষ পর্যন্ত এবং এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলা যাবে না। অসম্ভব অবিশ্বাস্য অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

সেদিন বিকেলে পার্শ্বেল একটা মোড়ক ডঃ ভান-এর নামে এল—তাতে অনেক সাদা ফুল। তিনি লুসিকে বললেন যে এগুলোই তার রোগের ওষুধ। তিনি ওই ওষুধমাখানো ফুলগুলো লুসির জানলায় ছড়িয়ে দেবেন, মালা করে তার গলায় পরিয়ে দেবেন। তাতেই সে ভাল থাকবে। লুসী গন্ধশুঁকে ফুলগুলো ফেলে দিল, বলল যে ডঃ ভান নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন, কেন না ওগুলো সাধারণ রসুন ছাড়া আর কিছু নয়। অধ্যাপক ভান দৃঢ় কঠিন ভাবে রুক্ষস্বরে বললেন, 'আমি কখনো ঠাট্টা করি না। ব্যাপারটা হাল্‌কা নয়, এসবের মানে আছে। তোমাকে সাবধান করছি, আমার কাজে বাধা দেবে না। তোমার জন্যে না হোক সকলের জন্যে তোমাকে এটা করতে হবে।'

অধ্যাপকের আচরণও সত্যিই খুব অদ্ভুত। কোনও চিকিৎসাশাস্ত্রে এসব দেখা যায় না। রাত্রিতে প্রথমে তিনি লুসির ঘরের জানলা বন্ধ করে দিলেন। পরে একমুঠো ফুল নিয়ে তিনি লুসির ঘরের জানলা বন্ধ করে দিলেন। পরে একমুঠো ফুল নিয়ে তিনি ঘষলেন সব শার্শিতে যেন একফোঁটা হাওয়াও রসুনের গন্ধে ফিরে যায়। রসুনগুচ্ছ দিয়ে প্রত্যেক দরজাকে ঘষলেন, ফায়ার প্লেসকেও। শোবার সময় লুসির গলায় রসুনের মালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এর গায়ে একবারেই হাত দেবে না। আর যাই হোক, কিছুতেই দরজা জানালা খুলবে না।' অধ্যাপক নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গেলেন।

পরের দিন। মনোরম সুন্দর সকাল। অধ্যাপক ভান ও সেওয়ার্ড লুসির

খবর নিতে আসছেন। লুসির মা বললেন যে লুসি তখনও ঘুমোচ্ছে। তিনি রাত্রিবেলায় ডাক্তার ভানের নিয়মের ওপরেও কিছু ভাল কাজ করেছেন; ঘরের মধ্যে গুমোট গরমে ও রসুনের গন্ধে লুসির দম বন্ধ হয়ে আসছে দেখে তিনি জানালা খুলে দিয়েছেন ও লুসির গলা থেকে রসুনের মালা খুলে ফেলে দিয়েছেন।

অধ্যাপকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অসহায় হতাশায় তিনি ভেঙে পড়লেন, অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি কেঁদে উঠলেন। না জেনে লুসির মা যে কি ক্ষতি করেছেন তিনি জানেন না। ভাগ্য তাদের বিরুদ্ধে, শয়তান হাসছে কুটিল হাসি। নিজেকে দমন করে অধ্যাপক ভান উঠে দাঁড়ালেন লড়াইয়ের মানসিকতা নিয়ে। আবার রক্ত দেওয়ার পালা। এবার রক্ত দিলেন অধ্যাপক স্বয়ং।

চারদিন চাররাত কাটল শান্তিতে। লুসি সুস্থ সবল হয়ে উঠছে ক্রমশঃ, দুঃস্বপ্নের আতঙ্কের পর সূর্যালোকিত সুন্দর প্রভাতে সে যেন জেগে উঠছে। ডঃ ভান হেলসিঙ চাররাত তাকে পাহারা দিয়েছেন। পরিস্থিতি ভাল দেখে তিনি ফিরে গেছেন আমষ্টাডামে।

সেদিন রাতে এক ভয়ংকর ঘটনা ঘটে। লুসি ডঃ ভানের নির্দেশমতো ফুলগুলো রেখে শুতে যায়। গভীর রাতে জানালায় ডানা ঝাপটানোর শব্দ শোনা গেল, তার ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে কুকুরের হিংস্র ভয়াল চিৎকার শোনা যাচ্ছে। লুসি ভয় পায় ভীষণ। হঠাৎ দরজা খুলে তার মা ঢোকেন ও মেয়েকে গভীর মমতায় আঁকড়ে ধরেন। জানালার ডানা ঝাপটানোর শব্দ। নীচে পশুর ক্রুদ্ধ গর্জন। হঠাৎ জানালার কাঁচ সশব্দে ভেঙে গেল, এক বিরাট ধূসর হিংস্র নেকড়ের মুখ দেখা গেল। আতঙ্কিত মা আঁকড়ে ধরলেন মেয়েকে। লুসির গলার ফুলের মালা ছিঁড়ে গেল। লুসির মার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

লুসি আতঙ্কে স্তব্ধ। জানালায় নেকড়ের মুখ মিলিয়ে গেছে। ভাঙা জানালা দিয়ে ঢুকছে অজস্র ধূলিকণা—তারা যেন ঘুরে ঘুরে একটা মূর্তি তৈরি করছে। কি অলৌকিক যাদুমায়ায় লুসি চেতনা হারায়। ঘরে মৃতদেহ, বাতাসে ঘূর্ণায়মান অজস্র সূক্ষ্ম কণিকা, বাইরে নেকড়ের চাপা হিংস্র গর্জন ঃ ঈশ্বর রক্ষা করুন প্রিয়তম আর্থারকে আর তার প্রেয়সী লুসিকে।

পরদিন সকালেই ডঃ ভান ও সেওয়ার্ড একসঙ্গেই এসে পৌঁছলেন লুসির বাড়ি। জোর করে ভেতরে ঢুকে ঘরের দৃশ্য দেখে তারা ভয়ে বিস্ময়ে হতবাক।

বিছানায় লুসি শুয়ে অজ্ঞান, পাশে তার মার মৃতদেহ। মৃতের মুখে ভয়ংকর আতঙ্কের ছাপ। লুসির মুখ ফ্যাকাসে, তার গলায় মালা নেই, সেখানে দুটো চিহ্ন ক্ষতের আকারে দেখা যাচ্ছে। অজ্ঞান অচৈতন্য হলেও লুসি তখনও বেঁচে, যদিও তার শ্বাস প্রশ্বাস অতি ক্ষীণ। অধ্যাপক ভান আপ্রাণ চেষ্টা করছেন তার চেতনা ফিরিয়ে আনতে। তাকে বাঁচাতে। অনেক প্রয়াসের পর স্টেথোস্কোপে তার হৃদস্পন্দন শোনা গেল, অতি মৃদু শ্বাস বইতে লাগল।

আবার রক্ত দিতে হবে। এবার রক্ত দিল মরিস। চারজন মানুষের পূর্ণ রক্ত দেওয়া হয়েছে লুসির শরীরে। তবু কেন ও ফ্যাকাশে শুকনো রক্তহীন হয়ে যাচ্ছে, কে টেনে নিচ্ছে তার শরীরের বিপুল রক্তপ্রবাহ!

বাবার গুরুতর অসুস্থতা সত্ত্বেও লুসির অবস্থা খুব খারাপ শুনে আর্থার এসেছে। লুসি একটু শান্তি পায়।

সারা রাত লুসি ঘুমের মধ্যে কিসের আতঙ্কে চমকে উঠেছে বারবার, খালি ছটফট করেছে। অধ্যাপক ভান ও সেওয়ার্ড পাহারা দিয়েছেন তাকে। আশ্চর্যের এই যে জেগে থাকলে লুসিকে ম্লান বিশীর্ণ বিবর্ণ দেখায়। কিন্তু ঘুমোলে তাকে সরল দেখায়, তার বুকের স্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে যায়। খোলা মুখ থেকে দাঁতগুলো দেখা যায় তীক্ষ্ণ ঝকঝকে ধারালো।

আর এক রাত গেল। লুসি আরও ম্লান হয়ে পড়েছে। মৃত্যু এসে গেছে তার শিয়রে। কিন্তু তার দাঁতগুলো আরো তীক্ষ্ণ উগ্র দেখাচ্ছে। বিশেষ করে দাঁতগুলো যেন আরো ধারালো আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। লুসির শেষ অবস্থা দেখে আর্থার নির্বাক। তার হাত ধরে লুসি ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনই ঘটল লুসির এক বিস্ময়কর পরিবর্তন। তার মুখ খুলে গেল, নিঃশ্বাস হল এলোমেলো, চোয়াল ঢুকে গিয়ে তীক্ষ্ণ ধারালো দাঁতগুলো বেরিয়ে এল। এক অলৌকিক কামনামদির কণ্ঠে সে আর্থারকে বলল, 'আর্থার প্রিয়তম, তুমি এসেছ আমি কত খুশি, আমাকে চুম্বন কর।' আর্থার সাগ্রহে মাথা নিচু করল, কিন্তু প্রবল জোরে ডঃ ভান তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এখন নয়।'

লুসি মারা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। কিন্তু আশ্চর্য! মৃত্যু তার সৌন্দর্য নতুন করে ফিরিয়ে দিয়েছে, কপালে মুখে মৃত্যুর বিবরণটা নেই। ঠোঁট দুটোও লাল।

রক্তের লাল আভায় সব উজ্জ্বল। লুসি নিদ্রিত না মৃত বোঝা যায় না, এত আশ্চর্য যৌবন-দীপ্তি।

লুসিকে মহাসমারোহে মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করা হল। হ্যামনষ্টেডের পার্বত্য অঞ্চলের সুন্দর উজ্জ্বল পরিবেশে।

হ্যামষ্টেডের সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসীরা ক'টা ভয়াবহ ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এক 'হত্যাকারী নারী' বা 'কৃষ্ণবসনা রমণী'র আবির্ভাবে সবাই সন্ত্রস্ত। গত দু'দিন ধরে খেলার মাঠ বা বাইরে থেকে কয়েকটি শিশু নিখোঁজ হয়ে যায়, সন্ধ্যার অনেক পর তারা বাড়ি আসে, প্রায় সকলের গলায় দেখা যাচ্ছে ছোট ক্ষতচিহ্ন, যে গুলোকে ইঁদুর বা ছোট কুকুরের দাঁতের কামড় বলে মনে হয়। আহত, প্রায় রক্তশূন্য এইসব শিশুরা এ ব্যাপারে সঠিক কিছু বলতে না পারলেও এক রহস্যময়ী নারীর কথা বলে, যে তাদের নিয়ে গেছে। এই শিশুর যেন রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে।

সংবাদপত্রে এই খবর পড়ে ডঃ ভান হেলসিভ অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি ছুটে এলেন ডঃ সেওয়ার্ডের কাছে। সেওয়ার্ড বলল যে, লুসির গলায় দাগের সঙ্গে শিশুদের গলার দাগের মিল আছে, এগুলো একজনের কাজ। ডঃ ভান ভয়ংকর কথা বললেন, 'ওগুলো কুমারী লুসির করা।'

এদের প্রিয় লুসি সম্বন্ধে একথা শুনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ স্তব্ধ হল সেওয়ার্ড, তীব্র প্রতিবাদ করল একথার। অধ্যাপক কি উন্মাদ হয়ে গেছেন? কিন্তু অধ্যাপক তাকে প্রমাণ দিলেন, কঠিন নিষ্ঠুর ভয়াবহ প্রমাণ।

সে রাত্রে ডঃ ভান হেলসিঙ ও সেওয়ার্ড সমাধিক্ষেত্রে গেলেন। লুসির কফিন খুলে দেখা গেল তার মৃতদেহ নেই। এরা দুজন দাঁড়িয়ে অন্ধকারে। কিছু পরে দেখা গেল দেবদারু গাছের সারির মধ্যে দিয়ে একটা সাদা মূর্তি আসছে, তার কোলে জড়ানো একটা শিশু। অধ্যাপক সেদিকে ছুটলেন, মূর্তিটা কফিনের কাছে এসে মিলিয়ে গেল। অধ্যাপক কোলে তুলে নিলেন শিশুটাকে কিন্তু তার গলায় কোনও চিহ্ন নেই। তিনি বললেন যে তারা ঠিক সময়ে আসায় এর কোনও ক্ষতি হয় নি। পরদিন দুপুরে ডঃ জন সেওয়ার্ডকে নিয়ে গেলেন লুসির কফিনের কাছে। ডালা খুলে দেখা লুসি শুয়ে আছে—আরো সুন্দর, আরো রূপসী,

ঠোঁটগুলো আরো লাল, গালে অপরূপ রক্ত আভা, দাঁতগুলো আরো তীক্ষ্ণ আরো ধারালো যা দিয়ে শিশুর রক্তপান করা যায়। সেওয়ার্ড লুসিকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল; মৃত্যুর ক'দিন পরেও এরকম সজীবতা অকল্পনীয়, বলা ভাল আতঙ্কজনক!

মানবকল্যাণবিদ কর্তব্যনিষ্ঠ বুদ্ধিমান অধ্যাপক ভান হেলসিঙ ও আর্থার মরিসকে খবর দিয়েছেন আসার জন্য। ইতিমধ্যে মীনাব সঙ্গে ডঃ জনের দেখা হয়েছে। তিনি জোনাথনের দিনলিপি পড়েছেন, লুসির ডায়েরীও। তিনি বুঝলেন অনেক কিছু একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর নির্মম সত্য তিনি উদঘাটিত করতে চলেছেন। তিনি আর্থার মরিস ও সেওয়ার্ডকে বললেন এক ভয়ঙ্কর অবিশ্বাস্য অপ্রাকৃত ঘটনার কথা।

লুসি মরেনি, সে অ-মৃতা। ঘুমের মধ্যে এক ভয়ংকর পিশাচ আসত ওর রক্তপান করতে। সম্মোহিত অবস্থাতেই লুসি মারা যায়। তাই সে মরলেও অমৃতা হয়ে রয়েছে। যারা অ-মৃত করে সেও এই পৈশাচিক প্রবৃত্তিতে ঘুরে বেড়ায়। লুসিও তাই হয়েছে। কোনও পিশাচ ভ্যামপায়ার বা রক্তচোষা বাদুড়রূপে বা অন্য কোনও রূপে তার রক্ত খেয়ে তাকে অ-মৃতা পিশাচ করেছে। সেদিন যদি লুসি আর্থারকে চুম্বন করতো আর্থারও একদিন হয়ে উঠত রক্তপানকারী ভয়ংকর। হত্যা করতে হবে, তার মধ্যে ভয়ংকরকে ধ্বংস করতে হবে, নরক থেকে লুসির আত্মাকে মুক্ত করতে হবে—দেবলোকে হবে তার অধিষ্ঠান। ডঃ ভান সকলের মঙ্গল চান, তাই দীর্ঘদিন ধরে এই কঠিন কাজে তিনি রত। আজও তিনি সকলের সহযোগিতা চান আন্তরিক ভাবে।

সবাই গভীর রাতে কবরখানায় এল। লুসির সমাধির কাছে গিয়ে ডঃ ভান কফিনের ডালা খুললেন। কেউ নেই। ডঃ ভান সাদা রুমালে জড়ানো বিস্কুটের মতো কি বার করলেন, তারপর ময়দার তালের মতো পুটিং বা অন্য একটা জিনিস নিলেন। বিস্কুট গুঁড়িয়ে দুটোকে মেশালেন, তাকে লম্বা করে পাকালেন, ও টুকরো করে করে সমাধির দরজার ফাঁকে ফাঁকে লাগালেন, এটা মন্ত্রপূত। অ-মৃতা যেন ঢুকতে না পারে ভেতরে। সকলে নিঃশব্দে অপেক্ষা করছে।

একটা সাদা মূর্তি আসছে। মাথায় ঘন কালো চুল আর গায়ে সমাধিস্থ মৃতের পোশাক। বুকের ওপর জড়ানো একটা সুন্দর শিশুর ওপর তার মুখ ঝুঁকে গেছে।

চাঁদের আলোয় দেখা গেল মূর্তিটা লুসির। সবাই চমকে উঠল.। আতঙ্কে শিউরে উঠল। আরো কাছে এলে অধ্যাপক হাতের আলো লুসির মুখে ফেললেন।

লুসির ঠোঁট তাজা রক্তে লাল, রক্তধারা চিবুক গড়িয়ে পড়ছে, তার মৃত্যু বস্ত্রের শুভ্রতাকে কলঙ্কিত করছে। এরা আতঙ্কে কাঁপছে, অধ্যাপকের ইস্পাত কঠিন হৃদয়ও কম্পমান। এদের দেখে লুসি (যদি ওকে লুসি বলা যায়) রাগে গর্জন করে উঠল, তার ঘোলাটে চোখে নরকের আগুন মুখে কামনাকুটিল হাসি। সে শিশুটাকে ফেলে দিল, আর্থারের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, আর্থার পিছিয়ে গিয়ে হাতে মুখ ঢাকল।

লুসি আরো এগিয়ে এসে আশ্চর্য কামনামদির কণ্ঠে বলল, 'আর্থার আমার কাছে এসো, ওদের ছেড়ে আমার কাছে এসো, আমি তোমার জন্যে ব্যাকুল তৃষিত। আমাদের মিলন হবে এস আমার স্বামী এস।'

লুসির কণ্ঠে অলৌকিক মিষ্টতা। জলতরঙ্গের অপরূপ মধুর ধ্বনিপ্রবাহ চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আর্থার মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগোচ্ছে, ভান হেলসিঙ দ্রুত এগিয়ে এসে দুজনের মধ্যে সোনালী ক্রুশ ধরলেন। লুসির মুখ ভয়াল ক্রোধে বীভৎস বিকৃত ভয়ংকর, সে সমাধিতে ঢুকতে গেল। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি তাকে ঠেলে দিল, সে মুখ ফিরিয়ে চাইল—তার মুখে অসহ্য বিদ্বেষ, চোখ থেকে নরকের আগুন ঝলসাচ্ছে, ভ্রূদুটো কুঁচকে গেছে, যেন মেডুসার ভয়ংকর নাগিনী। সবাই নিথর এরা যেন অনন্তকাল দাঁড়িয়ে। অধ্যাপক বললেন এবার সবাই লুসির স্বরূপ বুঝেছ, তিনি নিশ্চয়ই তাঁর কাজ করতে পারেন? বিমূঢ় আর্থার হাঁটু গেড়ে বসে বলল—, 'আপনার যা খুশি তাই করুন। এত ভয়ংকর যে আর দেখা যায় না।' অধ্যাপক লুসির কবরের কাছে গিয়ে পবিত্র সুগন্ধ দ্রব্য তুলে নিলেন! সেই নারী মূর্তি সূক্ষ্ম অতি সূক্ষ্মরূপে ভেতরে ঢুকে গেল। এরা আতঙ্কে স্তব্ধ নির্বাক।

পরদিন বেলা বারোটায় সংগোপনে চারজন এল সমাধি ক্ষেত্রে। অধ্যাপক ভান-এর হাতে বড় থলি। লুসির কফিন খোলা হল—সৌন্দর্য নিবিড় সেই মূর্তি দেখে সবাই বিতৃষ্ণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। দুঃস্বপ্নের মতো সেই মূর্তি, ধারালো দাঁত রক্তমাখা মুখ রিরংসা ও লালসায় পূর্ণ, যে প্রকৃতি শান্ত পবিত্র সুখের এক শয়তানি বিকৃতি। ভান বার করলেন ঝালাই লোহা, প্রদীপ, কয়েকটা ছুরি, ও

তিনফুট লম্বা আড়াই ইঞ্চি চওড়া কাঠের কীলক যার একদিক আগুনে পোড়ানো ও তীক্ষ্ণ করা এবং একটা বড় হাতুড়ি। তিনি বোঝালেন রক্তপিপাসু লুসিকে হত্যা না করলে সে মুক্তি পাবে না এবং আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে। আর্থারকেই লুসির বুকে এই কীলক বিঁধিয়ে দিতে হবে। আর্থার হাতে নিল কীলক ও হাতুড়ি, অধ্যাপক মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন, সেওয়ার্ড ও মরিস তাতে কণ্ঠ মেলাল। আর্থার সজোরে আঘাত করল লুসির বুকে।

কফিনের ভেতর যেন ভয়ংকর ঝড় বয়ে গেল। দেহটা যেন পাক খেতে লাগল, একটা হিংস্র রক্ত হিম করা চিৎকার বেরিয়ে এল লাল ঠোঁট থেকে, বন্য আদিম ভয়ংকরতায় লুসির সারা শরীর দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে যাচ্ছে, সাদা ধারালো দাঁতগুলো অসহ্য কিড়মিড় শব্দ করছে, ঠোঁটদুটো কেটে গেল ও লাল ফেনায় মুখ ভরে গেল। কিন্তু দৃঢ় কঠিন মূর্তিতে আর্থার কীলকটা ভেতরে ঢুকিয়ে চলেছে।

আস্তে আস্তে শান্ত হল সব। লুসির শরীর নিস্পন্দ। পিশাচী নয়, আগের লুসি এসেছে ফিরে—কি অপরূপ স্নিগ্ধ সুন্দর শান্ত তার মুখ, দৈবী পবিত্রতায় সে মুখ উদ্ভাসিত। আর্থারের মুখ নমিত হল সেই পবিত্র নিষ্পাপ ওষ্ঠের ওপর। তখনও কাজ বাকি। কীলকের উঁচু অংশটা কাটা হল, লুসির মাথাটা কেটে মুখে রসুন ভর্তি করে দেওয়া হল, কফিনটাকে ঝালই করে পেরেকপুঁতে ঠিক করা হল। এরা চলে গেল।

বাইরে স্নিগ্ধ বাতাস, পাখির মধুর তান, সূর্যের উজ্জ্বল কিরণ।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অধ্যাপক বললেন, এখনও অনেক কাজ বাকি, কঠিন ভীষণ কাজ। এসব দুঃখ অশান্তির কারণ কে, নাটের গুরু কোন জন, সেই ভয়ংকর শক্তিকে বার করতে হবে ও তাকে শাস্তি দিতে হবে। আমি সূত্র কিছু পেয়েছি। কিন্তু আজ অনেক কঠিন বিপজ্জনক ও ভয়ংকর। আশা করি তোমরা এই দায়িত্ব পালন করতে পরাঙ্মুখ হবে না।' সকলেই সম্মতি জানাল।

পিছনে ফেলে আসা মীনার কথায় ফিরে আসা যাক। মীনা হুইটবীতে এসেছিল লুসির কাছে। জোনাথনের খবর না পেয়ে সে অস্থির বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। তারপর একদিন অকস্মাৎ বুদাপেস্টের সেন্ট জোসেফ হাসপাতাল থেকে সিস্টার আগাথার চিঠি পায়। চিঠিতে লেখা, মিঃ জোনাথন হারকার গুরুতর অসুস্থ হয়ে প্রায় দেড়মাস হাসপাতালে শয্যাশায়ী। প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে সে বিধ্বস্ত,

স্মৃতিশক্তি ছিল না, ঘুমের মধ্যে বিকারের ঘোরে সে অদ্ভুত সব কথা বলত—নেকড়ে বিষ রক্তের কথা, ভূতপ্রেত পিশাচের কথা। এখন সে ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার কাছ থেকে সিস্টার আগাথা জানতে পেরেছেন মীনার কথা ও সেইমতো তাকে আসতে লিখেছেন।

মীনা পৌঁছয় জোনাথনের কাছে। কি ভীষণ রোগা আর দুর্বল হয়ে গেছে সে। শরীর ও মনে দু'দিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত সে পেয়েছে। সিস্টার আগাধার ব্যবহার অত্যন্ত সুন্দর ও মাধুর্যপূর্ণ কিন্তু জোনাথনের অসুস্থতার কারণ জানতে চাইলে তিনি নীরবে বুকে ক্রুশ চিহ্ন আঁকেন। মীনার মুখে উদ্বেগ দেখে জোনাথন আগ্রহে মীনার সঙ্গে তার ওখানেই বিয়ে হয়ে গেল। মীনা খুব খুশি।

জোনাথন ও মীনা কিছুদিন পরে চলে আসে বুদাপেষ্ট থেকে। মিঃ হকিন্সের বাড়িতে ওরা আছে। অপুত্রক আত্মীয়হীন মিঃ হকিন্স জোনাথনকে তাঁর ব্যবসায়ের অংশীদার করে নিয়েছেন। কদিন পরেই মিঃ হকিন্স মারা যান।

একদিন জোনাথন ও মীনা হাইড পার্কে বসে আছে। হঠাৎ মীনা দেখল জোনাথন ম্লান আতঙ্কিত ফ্যাকাসে মুখে চেয়ে আছে রাস্তার একটা লোকের দিকে; সে আবার এক অপরূপ সুন্দরী মেয়ের দিকে তাকিয়ে একদৃষ্টে। লোকটা দীর্ঘকায় শীর্ণ, তার লাল ঠোঁটের আড়ালে হিংস্র পাশবিক সাদা দাঁত। জোনাথন আতঙ্কিত স্বরে বলল, 'ওই সেই লোক! আমি বুঝতে পারছি, ওই লোকটাই কাউন্ট। কিন্তু ওকে যে একেবারে তরুণ দেখাচ্ছে। হায় ভগবান একি হল!' জোনাথন আবার অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এরা ডঃ ভান হেলসিঙ-এর কাছ থেকে একটা টেলিগ্রাম পেল যাতে লুসি ও তার মার মৃত্যুসংবাদ আছে। মীনা দুঃখে ভেঙে পড়ে।

মীনা সারা রাত ঘুমোতে পারে নি। জোনাথন কে কী দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু সেই ভয়ংকর শয়তানটা এসেছে লণ্ডন শহরে। এবার মীনাকেও কিছু করতেই হবে। ইতিমধ্যে ডঃ ভান হেলসিঙ মীনাকে চিঠি লিখেছেন তার সাহায্য চেয়ে। এক ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর পরিণতি থেকে তিনি অন্যদের রক্ষা করতে চান বলেই মীনার সাহায্যপ্রার্থী, কারণ মীনাও এব্যাপারে বেশ কিছু জানে।

অধ্যাপক ভান হেলসিঙ মীনাদের কাছে এলেন। মীনা তাঁর দৃঢ়তা, বলিষ্ঠ

ব্যক্তিত্ব ও গভীর সহৃদয়তায় শ্রদ্ধান্বিত হল; উনিও লুসির বান্ধবী মীনার চরিত্র মাধুর্য সততা ও পবিত্রতার কথা বুঝলেন। মীনা ওকে লুসির কথা সব জানাল, জোনাথনের সেদিন কাউণ্টকে দেখার কথাও জানাল। ড্রাকুলা প্রাসাদে জোনাথনের দিনলিপিও ডঃ ভান পড়লেন। নতুন তথ্যাদি জানতে পেরে তিনি আনন্দে অধীর হলেন। জোনাথনেরও ওঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, সে বুঝতে পারছে কাউণ্টের অলৌকিক রহস্য উনিই ভেদ করতে পারবেন। অধ্যাপক এদের সহযোগিতা চাইলেন। সত্যিই জোনাথনের মত উদার ও অসমসাহসী পুরুষ, এবং মীনার মতো সৎ পবিত্র কর্তব্যনিষ্ঠ আন্তরিক স্বভাবের নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি।

কদিন বাদে মীনা খবর দিল, বিশেষ সংবাদ নিয়ে তারা সেইদিনই ডঃ ভানের কাছে যাচ্ছে। ডঃ ভান চলে যাবেন, তাদের অভ্যর্থনার ভার দিলেন জন সেওয়ার্ডের ওপর যার বাড়িতে ওরা থাকবে। ওরা এল, ওদের সঙ্গে কথা বলে সেওয়ার্ড খুশি, সত্যি ওদের মতো সুখী দম্পতি নেই। লুসির কথা হল, অনেক তথ্য জানা গেল। লুসির শেষ দিকের কথা শুনে মীনা ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল। জোনাথন বলল, কাউণ্ট ড্রাকুলার পাঠানো মাটিভর্তি বাক্সগুলো সম্বন্ধে খোঁজ খবর করা অত্যন্ত দরকার। এ ব্যাপারেই সে এসেছে। বাক্সগুলো ভার্ণা থেকে হুইটবী পৌঁছয়, সেখান থেকে কারফাক্সের পুরনো গীর্জায় পৌঁছবার কথা। অবশ্য সেখানে পঞ্চাশটা বাক্স সঠিক আছে কিনা খোঁজ নেওয়া দরকার।

জোনাথনের কথা শুনে সেওয়ার্ডের মাথায় বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। সে ভাবছে অনেক কিছু। লুসিও তার মৃত্যু, জাহাজের দুর্ঘটনা ভ্যামপায়ার, কাঠের বাক্সগুলো। ওগুলোর সঙ্গে কাউণ্টের কি সম্পর্ক ওই গীর্জায়? ভাবনায় তলিয়ে গেল সেওয়ার্ড।

জোনাথন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শয়তানটাকে শেষ করার প্রবল বাসনায় সে কাজ করে যাচ্ছে, খোঁজ করছে 'পরীক্ষার কাজের পঞ্চাশ বাক্স ভর্তি মাটির,' ভয়ংকর ড্রাকুলার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ায় সে প্রস্তুত। মীনাও পৈশাচিকতার অবসান চায়, লুসির হত্যার প্রতিশোধ চায়, তার স্বামীকে বাঁচাতে চায়। সে সকলের দিনলিপি ও সংবাদাদি সাজিয়ে গুছিয়ে পুরো ঘটনাগুলো সুসজ্জিত করে ফেলেছে টাইপ করে। গোটা ইতিহাসটা সুন্দর ফুটে উঠেছে, এতে সব কিছু বুঝতে পারা

যাবে ভাল মতো, কাজেরও খুব সুবিধে হবে। সেওয়ার্ড, আর্থার ও টমাস সকলেই চাইছে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে। আর ডঃ ভানের তুলনা নেই। প্রবীণ এই মানুষটি কর্তব্যের খাতিরে মানবতার তাগিদে সকলের কল্যাণকামনায় কঠোরতম পরিশ্রম করে চলেছেন।

সবাই মিলিত হয়েছে ডঃ সেওয়ার্ডের পড়ার ঘরে এক জরুরী আলোচনা সভায়। অধ্যাপক ভান হেলসিঙ প্রধান ভূমিকা নিয়ে ব্যাখ্যা করলেন সবকিছু—

আমরা এতদিনে অনেক কিছু জেনেছি। আমি এবার শত্রু সম্বন্ধে কিছু বলব। এবং আমাদের কর্মপদ্ধতি স্থির করব।

আমরা ভ্যামপায়ারের অস্তিত্ব জানি একটি মূল্যবান প্রাণের বিনাশে। আমরা জেনেছি এক ভয়ংকর পিশাচের কথা। এই পিশাচ মানুষের থেকে অনেক শক্তিশালী অনেক চতুর। এর সান্নিধ্যে আসা সমস্ত মৃত আজ্ঞাধীন। সে পশুর থেকে হিংস্র; সে যেখানে যেমন খুশি যে কোনও রূপে আসতে যেতে পারে; বজ্রবৃষ্টি ঝড় কুয়াশা এর অধীন; সব নিম্নশ্রেণীর প্রাণীকে ও আদেশ করতে পারে—ইঁদুর পেঁচা বাদুড় মথ শৃগাল নেকড়ে সকলকেই ঃ সে ছোট বড় হতে পারে, এমন কি অদৃশ্য হতে পারে! এই ভয়ংকর শত্রুর সঙ্গে আমরা লড়াইয়ে নেমেছি এবং পরিণতির কথা ভাবলে অতি সাহসীরও বুক কেঁপে ওঠে। যদি আমরা হেরে যাই আমরা এরই মতো ভয়ংকর রক্তপিপাসু পিশাচে পরিণত হব, নিষ্প্রাণ হৃদয়ে আমাদের প্রিয়জনের নিষ্ঠুর সর্বনাশ করব, আমাদের কাছে ঈশ্বরের দ্বার চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু আমাদের কর্তব্য পালন হবে। তোমরা কি আসবে না আমার সঙ্গে?

সকলেই দৃঢ় কঠিন প্রত্যয়ে তাদের অঙ্গীকার ঘোষণা করল।

অধ্যাপক ভান হেলসিঙ বলে চললেন···

'এবার ওই দানবের বৈশিষ্ট্য.সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। সে বেঁচে থাকে মানুষের রক্তপান করে। দেখেছি সে আরো তরুণ হয়ে যায়, সে অন্য কিছু খায় না, আয়নায় তার ছায়া পড়ে না। সে নেকড়ে বা বাদুড়ে পরিণত হয়, সে চাঁদের আলোয় ধূলিকণা হয়ে ভাসে, অতি সূক্ষ্ম দেহ নিতে পারে। সে যে কোনও জিনিসের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, সে অন্ধকারেও দেখতে পায়। তবু সে সবকিছু পারে না। তারও সীমাবদ্ধতা আছে, সে নিষ্ঠুর বন্দীর মতো

অসহায়। কেউ আহ্বান না করলেও সে কোথাও যেতে পারে না; দিনের বেলায় তার কোনও ক্ষমতা থাকে না; নির্দিষ্ট জায়গায় সে থাকে কফিনে বা নরকে বা অভিশপ্ত স্থানে; কিছু জিনিসের কাছে সে অসহায়, যেমন রসুন বা পবিত্র ধুলো বা ক্রুশের ভয়ে সে ভীত; বুনো গোলাপের ডাল কফিনে রাখলে সে বেরোতে পারে না। আর এরকম দানবকে হত্যা করার ব্যাপারেও সবাই দেখেছে। ড্রাকুলার ইতিহাস ঘেঁটে দেখা গেছে যে, শত শত বৎসর পূর্বেকার এক অতি শক্তিশালী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ অসম সাহসী ও অতি চতুর অভিজাত বংশীয় মানুষই এই ড্রাকুলা; কয়েক শতাব্দী ধরে সে ভীষণ ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। এই দুরন্ত শত্রুর সঙ্গে আমাদের লড়াই।'

'আমরা এখনই কাজ শুরু করব। আমরা নিশ্চয় শয়তানটাকে সেখানে পাব এবং তাকে হত্যা করব। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্তের মধ্যেই এটা 'করতে হবে।'

পরদিন ভোর রাতে সবাই বেরোল গীর্জার দিকে। যদিও জোনাথনের মন কেমন যেন মীনার জন্য অস্থির হচ্ছে। তারা বাড়িটাতে ঢুকল, শেষ রাতের চাঁদের আলোয় ছায়াগুলো ঘন দেখাচ্ছে। ঘরের একেবারে সামনে গিয়ে অধ্যাপক ব্যাগ খুলে প্রত্যেককে ক্রুশ আর রসুনের মালা দিলেন, পবিত্র ধুলোও দিলেন। দরজা খুলে সবাই ঢুকল। জোনাথন উপলব্ধি করছে অশরীরী উপস্থিতি যা সে ট্রানসিলভানিয়াতে পেয়েছে। সকলের একই অনুভূতি। মেঝেতে ধুলোর স্তর। সে ঘর ছাড়িয়ে আর একটা দরজার সামনে তারা দাঁড়াল। দরজা খুলতেই নাকে লাগল কদর্য ভ্যাপসা নারকীয় গন্ধ যা কাউন্টের মতো শয়তানের গায়ে থাকে। ঘরে পঞ্চাশটা বাক্সের মধ্যে মাত্র উনিশটা আছে। হঠাৎ জোনাথন শিউরে উঠল, আর্থারও—অন্ধকারে যেন কাউন্টের শয়তানী মুখ, ধারালো নাক, আগুন চোখ, লাল ঠোঁট দেখা গেল হঠাৎ। কিন্তু কেউ নেই ঘরে, কোথাও নেই, হঠাৎ এক কোণে ফসফরাসের মতো অগণিত তারা ঝলমল করে উঠল, অজস্র ইঁদুর কিচমিচ করতে লাগল। কিন্তু সবই মিলিয়ে গেল। সবাই ফিরে গেল।

জোনাথন বাড়ি এসে দেখল মীনা তখনও ঘুমোচ্ছে। কি রকম শীর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ও। যা দুশ্চিন্তা চলছে। বেশ বেলায় মীনার ঘুম ভাঙ্গল, ওর চোখে রাত্রির দুঃস্বপ্নের আভাস।

মীনা ঘুমোচ্ছিল। সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছে। কুকুরের চিৎকার, অদ্ভুত সব

শব্দ শোনা গেল। নির্জন নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নাকোকিত রাত। একটা সাদা হালকা কুয়াশা তাদের বাড়ির দিকে আসছে। কুয়াশা ঘন হতে হতে মেঘের রূপ নিল, দরজার ফাঁক দিয়ে ঢুকল, তার মাথায় আগুন জ্বলছে চোখের মতো। হঠাৎ মনে হল একটা সাদা মুখ তার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। এরকম স্বপ্ন সে আর দেখবে না। আচ্ছন্নের মতো মীনা ঘুমিয়ে পড়ল। পরদিন বেলায় তার ঘুম ভাঙে। মীনা ভীষণ ক্লান্ত অবসন্ন। ভাগ্যিস জোনাথন সকালেই কোথায় গেছে, না হলে কত কৈফিয়ৎ দিতে হত।

জোনাথন বেরিয়েছিল একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। বাকি একুশটা বাক্স কোথায় আছে তাকে জানতেই হবে। কাউণ্টকে শেষ করতেই হবে। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে সে শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল। অবশ্য সঠিক সংবাদ জোনাথন আনতে সক্ষম হয়েছে। দুটো সাতানব্বই নম্বর চিকস্যাণ্ড স্ট্রিটে, অন্য ছটা বেরমণ্ডসের জামাইকা লেনে। বাকি নটা গেছে পিকডিলী অঞ্চলের একটা পুরনো খালি বাড়িতে (তিনশ সাতচল্লিশ নম্বর) যেটা কাউণ্ট সম্প্রতি কিনেছেন।

কিন্তু শয়তান হাসছে নিষ্ঠুর হাসি। কাউণ্ট এদের ওপর নির্মম প্রতিশোধ নিতে চাইছে। একদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। কাউণ্ট তার মানব অনুচর এক ব্যক্তিকে নিষ্ঠুর অত্যাচার করে হত্যা করতে উদ্যত। তার কাছ থেকে জানা গেল কাউণ্ট মীনার সর্বনাশ করতে চায়। সবাই চমকে উঠল। তখন বেশ রাত। ডঃ ভান, সেওয়ার্ড ও আর্থার ছুটল। জোনাথনদের ঘরের দিকে। অজানা আশংকায় সকলের মন কাতর, ব্যথিত।

জোনাথনদের দরজা বন্ধ। সে আর মীনা ভেতরে আছে। কিন্তু কী রকম যেন ভয়ানক আতঙ্কের পরিবেশ। দরজা ভেঙ্গে তারা ভিতরে ঢুকল। কি ভয়ংকর দৃশ্য! ভয়ে আতঙ্কে তাদের চুল খাড়া হয়ে গেল, হৃৎকম্পন যেন থেমে গেল। জানালার ধারে বিছানায় জোনাথন পড়ে আহত অজ্ঞান অচেতন হয়ে। বাইরের দিকে মুখ করে সাদা কাপড় পরা মীনা নত হয়ে বসে, তার পাশে কালো পোশাক পরা রোগা লম্বা একটা লোক দাঁড়িয়ে—সেই কাউণ্ট। কাউণ্ট বাঁ হাতে মীনার হাতদুটো সজোরে ধরে, ডান হাতে ঘাড় ধরে গলাটাকে নামিয়ে এনেছে বুকের ওপর। মীনার শুভ্র বস্ত্র রক্তে মাখামাখি। কাউণ্টের বুকের কাছে জামাকাপড়

ছিন্নভিন্ন, সেখানে রক্ত বইছে। মনে হয় মীনা বাধা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এদের দেখে কাউন্ট ফিরে তাকালে পৈশাচিক আগুন নিয়ে, নরকের আগুনের আক্রোশে বেঁকে গেল, রক্তমাখা মুখ থেকে সাদা স্বদন্ত দুটো বেরিয়ে এল হিংস্র পশুর মতো। মীনাকে ছুঁড়ে ফেলে বিদ্যুৎগতিতে কাউন্ট এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সদা সতর্ক অধ্যাপক সঙ্গে সঙ্গেই পবিত্র ধুনোর মোড়ক তুলে ধরলেন তার দিকে. কাউন্ট থমকে দাঁড়াল। এরা সকলেই পবিত্র ক্রুশ ধরে এগিয়ে এগিয়ে আসছে। ভীত সন্ত্রস্ত কাউন্ট পিছিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ চাঁদ নিভে গেল, অন্ধকার ঘনিয়ে এল, একটা ঘন কালো মেঘ আকাশে মিলিয়ে গেল, ঘরে শুধু সূক্ষ্ম বাষ্পপুঞ্জ। অসহায় আতঙ্কিত মৃতপ্রায় মীনা ও জোনাথনের পরিচর্যা করে আস্তে আস্তে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক করে তুলতে সকলেই প্রাণপণ প্রয়াসী হলেন।

পরদিন। ক্রোধে ক্ষোভে জ্বালায় উন্মাদ হয়ে যাবে জোনাথন। শেষ পর্যন্ত মীনার ওপর এই নিষ্ঠুর আক্রোশ দেখাল কাউন্ট। প্রতিশোধ নিতেই হবে জোনাথনকে, প্রতিশোধ। সকলেই বিমূঢ় বেদনার্ত, কিন্তু কঠিন। অধ্যাপকের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে ভাবেই হোক শয়তানটাকে শেষ করতেই হবে। দিনের আলো থাকতেই তাকে হত্যা করতে হবে যখন সে অন্য পৈশাচিক বা অলৌকিক রূপ গ্রহণ করতে পারবে না।

সত্যি মীনার দিকে তাকানো যায় না। যেন সে নিঃশেষ হয়ে গেছে। কাউন্ট বোধ হয় এক রাতেই ওকে শেষ করতে চেয়েছিল! দুঃখবেদনায় সকলের বুক ফেটে যাচ্ছে।

পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে ওরা বেরোল কাউন্টকে খুঁজতে। সবাই এল কারফাক্সে। সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। অধ্যাপক বাক্সগুলো খুলে তাতে পবিত্র ধুনো দিয়ে দিলেন যেন শয়তান ব্যবহার করতে না পারে। তারপর পিকাডিলীর গীর্জা বাড়ি। সেখানে ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা বিশ্রী গন্ধে বোঝা গেল এটা সাম্প্রতিককালে কাউন্টের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু এখানে পাওয়া গেল আটটা বাক্স। আর একটা কোথায়? বাক্সগুলো খুলে পবিত্র দ্রব্য দিয়ে তাকেও শয়তানের অগম্য করা হল। তারপর আর্থার মরিস গেল পূর্ব দক্ষিণ প্রান্তের দুটো বাড়িতে। যেখানে অধ্যাপক, সেওয়ার্ড ও জোনাথন অপেক্ষা

করছে মরিস ও আর্থারের খাবারের জন্যে। আর্থার মরিস ফিরল। তারা কাউণ্টকে পায় নি, কিন্তু সেখানে মোট বারটা বাক্স তারা 'নষ্ট' করে দিয়েছে।

সবাই প্রতীক্ষারত। উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে উঠেছে। হঠাৎ দরজা খুলে সন্তর্পণে অমানবিক কুটিল গতিতে ঘরে ঢুকল কাউণ্ট—তারও কিসের যেন ভয়। এদের দেখে দানবীয় হিংস্রতায় তার মুখ বীভৎস হয়ে উঠল, ভীষণ ধারালো দাঁতগুলো ঝকঝক করে উঠল ক্রুরতায়, মুখে জান্তব ঘৃণার ছাপ প্রকট হয়ে উঠল। বিদ্যুৎগতিতে জোনাথন তার হাতের তীক্ষ্ণ কুকরী ছুরিটা সজোরে ছুঁড়ল। চক্ষের নিমেষে সরে গেল কাউণ্ট। আর একটা ধারালো আঘাত—তার বুকের জামা ছিঁড়ে গেল, একগাদা নোট ও সোনা বেরিয়ে পড়ল। দানব কাউণ্ট এবার জোনাথনকে শেষ করে বুঝি। কিন্তু সকলেই হাতে পবিত্র ধুনো ও ক্রুশ নিয়ে কাউণ্টের সামনে দাঁড়াল। কাউণ্ট পিছিয়ে গেল, কিন্তু ঘৃণার বিদ্বেষে পৈশাচিক নারকীয় ক্রোধে তার শরীর জ্বলছে।

কিন্তু ঈশ্বরের পবিত্রতার কাছে মানুষের প্রতিরোধের কাছে শয়তান কত অসহায়। কাউণ্ট জানালা দিয়ে বাইরে লাফাল। মিলিয়ে যাবার আগে তার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'তোরা ভেবেছিস আমার ক্ষতি করবি! ওরে ভেড়ার দল, আমি সবেমাত্র শুরু করেছি আমার প্রতিশোধ, হাজার হাজার বছর ধরে আমি তা করব। তোদের প্রেয়সী নারীদের আমি পেয়েছি, তাদের দিয়েই তোদের ধরে নেব। আমার আজ্ঞাধীন প্রাণী হয়ে থাকবি তোরা।'

আবার নতুন করে সবাইকে ভাবতে হচ্ছে। একটা মাটির বাক্স পাওয়া যাচ্ছে না। তার খবর কাউণ্ট জানে। কাউণ্ট বছর বছর তাতে থাকতে পারবে, কেউ জানবে না। কিন্তু এর মধ্যেই কি ভয়ংকর সর্বনাশ না ঘটতে পারে! মীনাকে অত্যন্ত সাবধানে রাখা হয়েছে। তার শরীর ও ঘরকে ঈশ্বরীয় পবিত্রতায় নিরাপদ করা হয়েছে। তা ছাড়া ঘরের বাইরে সারা রাত কেউ না কেউ পাহারায় থাকেই। মীনা উঠে জোনথনকে ধাক্কা দিয়ে তুলল—'এক্ষুণি অধ্যাপককে ডেকে আনো। রাতে আমাদের ঘরের কাছেও যেন এসেছিল। কিন্তু ঢুকতে পারেনি। আমাকেও সম্মোহিত করেছে। অধ্যাপককে খবর দাও। সকালের আগেই সম্মোহিত করলে আমি অনেক কিছু বলতে পারব।'

অধ্যাপক তাকে সম্মোহিত করলেন, জানতে চাইলেন, সে কোথায় কি করছে।

দূর থেকে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন মীনার স্বর ভেসে এল—অন্ধকারে শুনতে পাচ্ছি জলের ছলছল শব্দ। বাইরে ঢেউয়ের উঠানামা। আমি জাহাজের ভেতর। মাথার ওপর লোকের দ্রুত চলাফেরা, শেকলের শব্দ, নোঙরের আওয়াজ। আমি মৃতের মতো শুয়ে আছি।'

আবার বৈঠকে বসল। অধ্যাপক বললেন, 'মীনার কথাতে বোঝা যাচ্ছে যে, কাউণ্ট একটা জাহাজে আছে যেটা কোনও বন্দরে নোঙর করা। একটা ব্যাপার স্পষ্ট যে কাউণ্ট পালাচ্ছে। লণ্ডন তার পক্ষে নিরাপদ নয়। আমরা হন্যে হয়ে শিকারী কুকুরের মতো তাকে তাড়া করেছি। সে নিশ্চয় ফিরে যাচ্ছে ট্রানসিভানিয়ায়। ড্যানিয়ূবের মুখ দিয়ে বা কৃষ্ণসাগর হয়ে ফিরে যাবে—এ পথেই ও এসেছিল। 'দি টাইমস' পত্রিকার পাতা ঘেঁটে আমরা জেনেছি কি কি জাহাজ যাবে। দেখা গেছে 'জারিনা ক্যাথরিন' কৃষ্ণসাগর দিয়ে ভার্ণার দিকে গেছে। কাউণ্ট এতেই পালাচ্ছে। কেননা খবর নিয়ে জানা গেছে যে একজন রোগা লম্বা তীক্ষ্ণনাসা সাদা দাঁতওয়ালা লোক এসে একটা বড় বাক্স জাহাজে করে পাঠিয়েছে এবং তখন একটা যেন অস্বাভাবিক মুহূর্তে ঘন কুয়াশায় ছেড়ে হঠাৎ জোয়ারের সুযোগে জাহাজটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে গেছে। বাক্সটা ভার্ণার যাবে, সেখানে একজন কাগজপত্র দেখিয়ে ওটা ছাড়াবে। আমরা ইতিমধ্যে স্থলপথে ভার্ণার দিকে রওয়ানা হয়ে জাহাজের আগেই পৌঁছব।'

প্রথমে স্থির ছিল জোনাথন যাবে না। কারণ মীনা অত্যন্ত অসুস্থ এবং শয়তানর অশুভ প্রভাব ওর ওপর তখনও আছে; ড্রাকুলা ওর রক্তে ঢুকিয়ে দিয়েছে 'ভ্যামপায়ারের রক্ত দীক্ষা'। জোনাথনকে মীনার কাছে থাকা উচিৎ ওর নিরাপত্তার জন্য।

পরে দেখা গেল এদের অভিযানে জোনাথনের সাহায্য ও উপস্থিতি অপরিহার্য, সে না থাকলে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নাও হতে পারে। মীনা থাকবে লণ্ডনে, তার নিরাপত্তার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু অকস্মাৎ মীনা বলল যে সে যাবেই, তা না হলে সে নিরাপদ হবে না, এরাও নিশ্চয়ই নিরাপত্তা অনুভব করবে; এখানে থাকলে সে কাউণ্টের অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণে যা খুশি করতে পারে। তাছাড়া সে সঙ্গে থাকলে এদের সাহায্যও করতে পারবে, এবং দরকার হলে তাকে সম্মোহিত করে অনেক কিছু জানা যাবে।

শুরু হল ওদের ঐতিহাসিক যাত্রা। সকলে চারিং ক্রশ অতিক্রম করে রাতে প্যারিসে পৌঁছল; তারপর ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেসে সারা দিনরাত চেপে ভার্ণা। জাহাজ তখনও পৌঁছয়নি। মীনাকে সম্মোহিত করেও জানা গেল জাহাজ সমুদ্রে আছে। প্রায় এক সপ্তাহ বাদে টেলিগ্রাম এল 'জারিনা ক্যাথরিন' সকালেই দারদানেলাস ছাড়িয়েছে। তাহলে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই জাহাজ ভার্ণায় পৌঁছবে।

মীনা মোটামুটি ভালই আছে। অধ্যাপক ভান ও জন সেওয়ার্ডের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ওপর। ড্রাকুলার পৈশাচিক প্রভাবে যে কোনও মুহূর্তে যে কোনও অঘটন ঘটতে পারে। তবু মনে হয় মীনা আগের জীবনে ফিরে আসছে। জোনাথন শান্ত অথচ ভীষণ, বরফ শীতল হাতে শান দিচ্ছে তার কুকরীতে যার একটি মাত্র আঘাত কাউন্টকে শেষ করে দিতে পারে।

কিন্তু জাহাজের কোনও খবর নেই—এতদিন হয়ে গেল। ড্রাকুলা কি অন্য কোথাও পালাচ্ছে? সকলেই হতাশ, চিন্তান্বিত। হঠাৎ টেলিগ্রামে খবর জানা গেল যে ভার্ণায় নয়, জারিনা ক্যাথরিন দুপুর একটায় গালাজ বন্দরে আসবে।

এরা সকলেই ব্যর্থ হতাশায় ভেঙে পড়ল। এত প্রয়াস এত পরিশ্রম সব মিথ্যে হয়ে গেল? তবু এরা হারবে না, ভাগ্যের কাছে পরাজয় মানবে না, পিশাচকে পরাজিত করে বাঁচাবে ভবিষ্যৎ মানুষকে। অধ্যাপক স্থির করলেন তাঁরা ট্রেনে করে গালাজ যাবেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন মীনার মনের ওপর অলৌকিক প্রভাব বিস্তার করে ড্রাকুলা জানতে পেরেছে ওদের সকলের খবর এবং সে কারণেই জাহাজকে নিয়ে ফেলেছে গালাজ-এ। সেখান থেকে সে তার প্রাসাদে প্রবেশ করবে। সকলকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে প্রাসাদে ঢোকার আগেই ড্রাকুলাকে হত্যা করার। নতুবা কারো পরিত্রাণ নেই।

ট্রেন গালাজ-এ পৌঁছল। ভাগ্য এখানেও প্রতিকূল। জাহাজে গিয়ে বাক্সটার কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না। জাহাজের ক্যাপটেন বলল যে, জাহাজটা আসার অনেক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে। এবং গালাজে পৌঁছবার পর ইম্যানুয়েল হিলডারসীম নামে এক ব্যক্তি কাগজপত্র দেখিয়ে বাক্সটাকে নিয়ে যায়। ইম্যানুয়েলের কাছ থেকে জানা গেল যে পেত্রফ স্কিনস্কি নামক জনৈক ব্যক্তির আদেশানুসারে বাক্সটা নিয়ে গেছে। স্কিনস্কির খোঁজ নিতে গিয়ে এরা জানল যে সেণ্ট পিটার গীর্জা প্রাঙ্গণে কোনও বন্যজন্তু তার কণ্ঠ ছিন্নভিন্ন করেছে। কাউণ্ট তার অবস্থানের সংবাদসূত্রকে বিচ্ছিন্ন করতে চায়।

পরিকল্পনা হল সবাইকে নিয়ে। মীনাই মোটামুটি পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝিয়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্ণয় করে দিল। প্রাসাদে প্রবেশের আগেই কাউন্টকে ধরতে হবে। এখান থেকে জলপথ স্থলপথ রেলপথ তিনটিই ব্যবহার করতে হবে। আর্থার ও জোনাথন যাবে দ্রুতগামী স্টীমলঞ্চে; সেওয়ার্ড ও মরিস যাবে দুঘোড়া টানা গাড়িতে; অধ্যাপক ভান ও মীনা প্রথমে রাতের ট্রেনে ভেরেস্তিতে যাবে ও সেখান থেকে নিজেরাই গাড়ি নিয়ে যাবে বর্গো গিরিপথে।

জোনাথন ও আর্থার স্টীমলঞ্চ নিয়ে দ্রুত ছুটে চলেছে। আর্থার প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু জোনাথনের শান্তি নেই একবিন্দু। মীনার চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। ও কেমন আছে কে জানে। কি ভয়ংকর অভিযানে তারা বেরিয়েছে। অন্ধকার, কনকনে ঠাণ্ডা, রাত্রিতে অপ্রাকৃত অদ্ভুত কণ্ঠস্বর—এক ভয়ংকর অলৌকিকের দিকে তারা এগিয়ে চলেছে। কান্দুতে এসে তারা গেল বিসট্রিজের দিকে। এরাও এগোল। পথে শুনল একটা অ্যাকসিডেন্টে আর্থারদের লঞ্চ আটকে ছিল, পরে ঠিক হয়, কিন্তু কেমন যেন থেমে থেমে চলে।

মীনারা এসে পৌঁছয় ভেরসেতি-তে। সামনে আরও সত্তর মাইলের মতো পথ। অধ্যাপক ভান ঘোড়ার গাড়ি কিনে আনলেন। মীনা ভাবছে জোনাথনের কথা। ঈশ্বর সকলকে রক্ষা করুন। প্রবীণ অধ্যাপক ও তরুণী মীনা কঠিন কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে, পার্বত্য পথে ঘোড়ায় টানা গাড়ি চালিয়ে তারা চলেছে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। পথের মধ্যে মীনাকে সম্মোহিত করা হলে সে কয়েকবার বলল—'অন্ধকার, কাঠের শব্দ জলের ছলাৎ ছলাৎ!' তার মানে ড্রাকুলা তখনও নদীতে। অধ্যাপক ভান ও মীনা সকালে বর্গেই পৌঁছল তারপর বিসট্রিজের পথে।

একরাতে মীনাকে অস্বাভাবিক মনে হল। কোন অশুভ আত্মা যেন তাকে প্রভাবিত করছে। অধ্যাপক ভান ও মীনা প্রাসাদ পথে অরণ্যে এক গুহাতে রাত্রির আশ্রয় নিয়েছেন। অধ্যাপক ভান চারদিকে বড় গণ্ডী টেনে দিলেন ও মন্ত্রপূত করে দিলেন। মীনা যতই প্রভাবিত ও প্রলুব্ধ হোক, সে নিরাপদ। গভীর রাতে অকস্মাৎ ঘোড়াগুলো আর্তনাদ করতে লাগল, নেকড়ের গর্জন শোনা গেল, তুষার ঝড় বইতে লাগল। বরফগলা ও কুয়াশা এদের আচ্ছন্ন করে দিল। অকস্মাৎ তার মধ্যে থেকে তিনটি নারীমূর্তি আবির্ভূত হল ঠিক জোনাথন যেমন

দেখেছে। তারা লোভী লোলুপ কণ্ঠে মীনাকে ডাকছে—'এসো বোন এসো এসো।' মীনা ভয়ে আতঙ্কে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল। ভয়ংকর আতঙ্কের মধ্যে থেকেও অধ্যাপক উল্লসিত হলেন; কেন না মীনার চেতনায় সে অপার্থিব শয়তানের কোন ছাপ নেই।

অধ্যাপক ও মীনা কাউন্টের প্রাসাদেরকাছে পৌঁছলেন। পার্বত্য বন্ধুর অঞ্চল সত্যিই অদ্ভুত। জান্তব অলৌকিকতা শিউরে তোলে চেতনাকে। অপ্রাকৃত পরিবেশ আতঙ্কের পরিমণ্ডল রচনা করে, দূর থেকে ভেসে আসা নেকড়ের চিৎকার গায়ের রক্ত হিম করে দেয়। তারা একটা পছন্দমতো জায়গায় থামলেন। দূরবীণ দিয়ে চারপাশ লক্ষ্য করতে হচ্ছে। হঠাৎ চোখে পড়ল একদল জিপসী ধরনের পাহাড়ি লোক আসছে দ্রুতবেগে। তাদের মাঝখানে একটা গাড়ি। গাড়ির ওপরে একটা বড় সিন্দুক। ওরা খুব দ্রুত আসছে, সূর্য ডোবার আগেই ওরা ড্রাকুলার প্রাসাদে পৌঁছতে চায়। হঠাৎ দেখা গেল দক্ষিণ দিক থেকে দ্রুতবেগে দুটো ঘোড়া ছুটে আসছে সেওয়ার্ড ও মরিসকে নিয়ে। উত্তরপ্রান্ত থেকেও ঘোড়ায় চড়ে দুজন উল্কাবেগে আসছে—এসে পড়ল জোনাথন ও আর্থার। সবাই জিপসীদের গাড়িকে তাড়া করে এসেছে। মীনা একটু আড়ালে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে, অধ্যাপকও প্রস্তুত। চারপাশ থেকে নেকড়ের গর্জন ভেসে এল, বরফ পড়তে লাগল প্রচণ্ডভাবে, উজ্জ্বল সূর্য যেন তাড়াতাড়ি ডুবে যাচ্ছে, লাল অগ্নিবিন্দু ধেয়ে আসছে চারদিকে, তীক্ষ্ণ প্রবল ঝোড়ো হাওয়া বইছে।

কাছাকাছি এসে পড়ল জিপসীদের গাড়ি। জোনাথন ও মরিস প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল—'গাড়ি থামাও।' মুহূর্তের জন্য গাড়ির গতি স্তিমিত হল। দু'দিক থেকে জোনাথন ও আর্থার, মরিস ও সেওয়ার্ড বিদ্যুৎগতিতে ছুটে এল গাড়ির দু'পাশে। জিপসীদের নেতা জোরে গাড়ি চালাতে বলল। এরা চারজনেই হাতে রাইফেল তুলে নিল, সামনে থেকে মীনা ও অধ্যাপক তাক করল তাদের বন্দুক। চারদিক অবরোধ দেখে গাড়ি থমকে দাঁড়াল, জিপসীরাও হাতে তুলে নিল তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সূর্য প্রায় অস্ত যাচ্ছে, সামনে বিশাল প্রাসাদ, অজস্র নেকড়ের ভয়াল চিৎকার শিউরে দিচ্ছে পরিবেশ। লড়াই আসন্ন, না জানি কি ভয়ংকর সর্বনাশ ঘটবে। মীনার বুক কাঁপছে জোনাথনের জন্য, কিন্তু লড়াইয়ের উন্মাদনা তাকেও উদ্দীপ্ত করেছে।

জোনাথন চক্ষের নিমেষে গাড়ির উপর লাফিয়ে উঠে অবিশ্বাস্য শক্তিতে বাক্সটা তুলে মাটিতে আছাড় মারল। জিপসীদের ছুরি ঝলসে উঠল, তার আগেই পলকের মধ্যে জোনাথন লাফিয়ে পড়েছে। বিরাট কুকরী ছুরি দিয়ে সে বাক্সের ডালায় সজোরে চাপ দিল, ছুরিতে আহত মরিসও হাত লাগাল। প্রচণ্ড চাপে বাক্সের সামনের ডালা ভেঙে গেল, কাউণ্ট মৃত বিবর্ণ রূপে শায়িত কিন্তু ভয়াবহ প্রতিশোধ বাসনায় চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। ডুবন্ত সূর্য দেখে সেই ভয়াল চোখে বিজয়ের পৈশাচিক আভাস দেখা দিল।

কিন্তু চোখের পলক ফেলার আগেই জোনাথনের বিশাল ধারালো ছুরিটা অব্যর্থ ভয়ংকর বেগে ছুটে এসে কাউণ্টের গলায় বিঁধল, সঙ্গে সঙ্গেই মরিসের বাঁকানো তীক্ষ্ণ অস্ত্র কাউণ্টের বুকে ঢুকে গেল, মুহূর্তেই কাউণ্টের শরীর ধূলো হয়ে মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য, সেই মুখে শান্তির ছাপ আঁকা।

সামনে ড্রাকুলার বিশাল প্রাসাদ ঃ পশ্চাৎপটে আরও উজ্জ্বল আকাশ। অস্তগামী সূর্যের শেষ আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসির তার বন্ধুর ধারালো উদ্দাম সৌন্দর্য।

বিমূর্তছায়া

এডগার অ্যালেন পো

আপনারা যাঁরা এ কাহিনী পড়ছেন, তাঁরা এখনও নিশ্চয়ই জীবিতদের মধ্যে রয়েছেন। কিন্তু আমি, যে লিখছি, বহুদিন হল ছায়াঘেরা অন্ধকার আবর্তে পা দিয়েছি। কারণ, অদ্ভুত ঘটনা। অনেক গোপন জিনিস প্রকাশিত হবে, বহু শতাব্দী ধীরে ধীরে পার হয়ে যাবে, তারপর এইসব স্মৃতিগুলো আপনাদের চোখে পড়বে। আর যখন পড়বে, তখন কেউ কেউ হয়তো অবিশ্বাস করবেন, কেউ বা আবার সন্দেহ করবেন, আর মুষ্টিমেয় কয়েকজন হয়তো লৌহশলাকায় খোদাই করা এই অক্ষরগুলোর মধ্যে গভীর চিন্তার কিছু খোরাক পাবেন।

সেই বছরটা ছিল নগ্ন আতঙ্কের বছর, আর সেই সঙ্গে ছিল এমন এক নগ্ন অনুভূতি যা আতঙ্কের চেয়েও অনেক তীব্র, তীক্ষ্ণ-ভাষায় প্রকাশ করার মতো কোন নাম যার নেই। কারণ অনেক বিস্ময়কর ঘটনা ও ইঙ্গিত তখন ঘটে গেছে,

মহামারীর কালো ডানা বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দূর থেকে দূরে, সাগরে ও সমতলে। নক্ষত্র সম্পর্কে যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন স্বর্গের পরনে ছিল এক অশুভ পোশাক; আর আমি, গ্রীক অয়নোস, স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, এই সেউ সাতশো চুরানব্বইতম বছর এবং পালা বদলের শুরু হয়েছে— মেষ রাশির অনুপ্রবেশর সঙ্গে সঙ্গেই বৃহস্পতি গ্রহ যুক্ত হয়েছে ভয়ংকর শনি গ্রহের রক্তবলয়ে। শুধু পৃথিবীর গোলকের মধ্যেই নয়, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে তাহলে অন্তরীক্ষের অদ্ভুত আত্মা নিজেকে ক্রমে জোরালো করে তুলেছে প্রতিটি মানুষের ধ্যানে, কল্পণায়, প্রাণে।

টলিমেই নামক এক মলিন, অভিজাত একটি ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে, কয়েকটা লাল 'শিয়ান' সুরার বোতল সামনে রেখে এক রাতে আমরা বসেছিলাম—আমাদের সাতজনের একটি দল। সেই ঘরের এক এবং একমাত্র প্রবেশপথ একটি বিশালাকায় পিতলের দরজা। এই দরজার পরিকল্পনা শিল্পী করিনোস্-এর এবং দুর্লভ কারিগরির নিদর্শন হিসেবে ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা ঘরের ভেতর থেকে। সেই বিষাক্ত ঘরের চারপাশে ভারীকালো পর্দা আমাদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করেছে আকাশের চাঁদ, ভয়ংকর নক্ষত্রমণ্ডলী, এবং নির্জন জলপথ—কিন্তু অশুভের ইঙ্গিত কিংবা ততটা আড়াল করতে পারেনি। আমাদের ঘিরে চারপাশে আরও অনেক কিছু ছিল যার কোন স্পষ্ট বর্ণনা আমি আপনাদের দিতে পারছি না—তার কিছু বাস্তব, আর কিছু ভৌতিক আবহাওয়া—অদ্ভুত ভারী—শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসা এক অনুভূতি— দুশ্চিন্তা—আর বহু কিছু ছাপিয়ে অস্তিত্বের এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। প্রতিটি ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণভাবে সপ্রাণ ও জাগ্রত, অথচ চিন্তা-শক্তি অচেতন, সুপ্ত হলে প্রতিটি দুর্বল স্নায়ু মানুষ যে অবস্থা অনুভব করে। এক প্রচণ্ড ভার আমাদের অবলম্বন করে ঝুলছে—আমাদের প্রতিটি অঙ্গে—ঘরের প্রতিটি আসবাবে—আমাদের সুরার পাত্রে; এবং প্রতিটি জিনিস সেই ভাবে অবদমিত, পরাজিত— ব্যতিক্রম শুধু আমাদের পানোৎসবকে আলোকিত করে রাখা সাতটি লোহার বাতিদানের উজ্জ্বল শিখা। সুদীর্ঘ তন্বী আলোর রেখায় ওরা নিজেদের শূন্যে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে, অচঞ্চল ম্লান

ভাবে জ্বলছে; আর আবলুস কাঠের বৃত্তাকার টেবিলে বাতিদানের শিখার দ্যুতি যে আয়না তৈরি করেছে, তার মসৃণতলে প্রতিফলিত আমাদের প্রত্যেকের বিবর্ণ মুখ এবং তাদের হতাশ চোখের অস্থির জ্বলন্ত দৃষ্টি। অথচ তবুও আমরা হাসছিলাম, রীতি অনুযায়ী আনন্দ প্রকাশ করছিলাম—যা একরকম হিস্টিরিয়া গ্রস্ততা; আমরা গাইছিলাম অ্যানাক্রিওনের গান—যা উন্মত্ততারই লক্ষণ; আর গভীর চুমুক দিচ্ছি সুরার পাত্রে—যদিও লাল সুরা আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছিল রক্তের কথা। কারণ আমাদের আরও একজন সঙ্গী, তরুণ জেলিয়াস সেই ঘরে উপস্থিত মৃত, এবং সটান ভঙ্গীতে শায়িত, আচ্ছাদিত;—উপরোক্ত দৃশ্যের অশরীরী আত্মা ও অপদেবতা। হায়! আমাদের আনন্দে সে কোনও অংশ নেয়নি, কিন্তু তার প্লেগে বিকৃত চেহারা ও চোখ, যে চোখ থেকে মহামারীর আগুন অর্ধেক নিভিয়ে দিয়েছে, 'মৃত্যু' যেন আমাদের খুশিতে ভাগ নিল,—মৃত্যু আসন্ন এমন মানুষদের আনন্দে, খুশিতে ঘটনাচক্রে যেমন কোনও মৃতদেহ কচ্চিৎ অংশ নিয়ে ফেলে। যদিও আমি, অয়নোস্, বুঝতে পারছি মৃতের দু-চোখ আমারই দিকে, তবুও প্রবলভাবে সচেষ্ট হলাম সেই চোখের তিক্ত অভিব্যক্তি অনুভব না করতে, এবং আবলুস কাঠের আয়নার গভীরে এবং স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে তীব্র ধ্বনশীল স্বরে গেয়ে চললাম টিউস-পুত্রের গান। কিন্তু ক্রমে আমার গান রুদ্ধ হয়ে এলো, তাদের প্রতিধ্বনি ঘরের কালো পর্দায় আবর্তিত হয়ে ক্ষীণ অস্পষ্ট হয়ে এলো, এবং এক সময়ে মিলিয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য! যে কালো পর্দার গভীরে আমার গানের শব্দ লীন হয়ে গেছে, সেই গভীর আড়াল থেকে এগিয়ে এলো এক কৃষ্ণকায় অনির্দিষ্ট আকৃতির ছায়া—চাঁদ যদি আকাশে খুব নিচে থাকত তা হলে কোনও মানুষের যে রকম ছায়া ফেলতো ঠিক সে রকম এক ছায়া। কিন্তু এ ছায়া কোনও মানুষের বা দেবতার নয়, কোনও পরিচিত জিনিসেরও নয়। ঘরের পর্দার ভাঁজে কিছুক্ষণ কেঁপে উঠে অবশেষে ওটা এগিয়ে এলো আমাদের পূর্ণ দৃষ্টির সামনে, পিতলের দরজার ওপরে আশ্রয় নিল। কিন্তু সে ছায়া অস্পষ্ট, নিরাকার, অনিশ্চিত, এবং কোনও মানুষের কিংবা দেবতার নয়। আর সেই ছায়া অধিস্থাপিত, এবং কোনও মানুষের কিংবা দেবতার নয়।

আর সেই ছায়া অধিস্থাপিত হল পিতলের দরজায়, তোরণের ঠিক নিচে, এবং নিশ্চল, শব্দহীন, কিন্তু সেখানে স্থির ও অস্তিমান। আর দরজার যে জায়গায় ছায়টা অবিচল, যদি আমার স্মরণ করতে ভুল না হয়ে থাকে, সেটা আচ্ছাদিত অবস্থায় জেলিয়াসের পদপ্রান্তের ঠিক কাছেই আছে। কিন্তু আমরা জমায়েত হওয়া সাতজন, পর্দার গভীর থেকে ছায়াটাকে মূর্ত হতে দেখে তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে সাহসহীন হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছি, এবং আবলুস কাঠের আয়নার অতলে স্থির দৃষ্টিতে অবিরাম চেয়ে থেকেছি। আর অবশেষে আমি, আয়নোস, মৃদু স্বরে ছায়াটার কাছে জানতে চেয়েছি তার নিবাস ও পরিচয়। এবং সেই ছায়া উত্তর দিল, 'আমি এক ''ছায়া'', আর আমার নিবাস টলিমেই— এর ভূগর্ভস্থ সমাধির খুব কাছে, এবং ক্লেদময় মৃত্যু নদীর তীরে হিলিউশন-এর সেই মলিন সমতলভূমি থেকেও খুব দূরে নয়', আর তখনই আমরা সেই সাতজন, নিজেদের আসন ছেড়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ঠের মতো উঠে দাঁড়ালাম আতঙ্কে, দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলাম, শিউরে উঠলাম, ত্রাসে হতবুদ্ধি, কারণ ছায়ার কণ্ঠস্বর কারো ধ্বনির উত্থান পতন নিয়ে বিষণ্ণভাবে আমাদের কানে এসে পৌঁছলো, আমরা স্পষ্ট চিনতে পারলাম তাদের পরিচিত বাচনভঙ্গী, আমাদের বহু সহস্র মৃত বন্ধুদের মিলিত কণ্ঠস্বর!

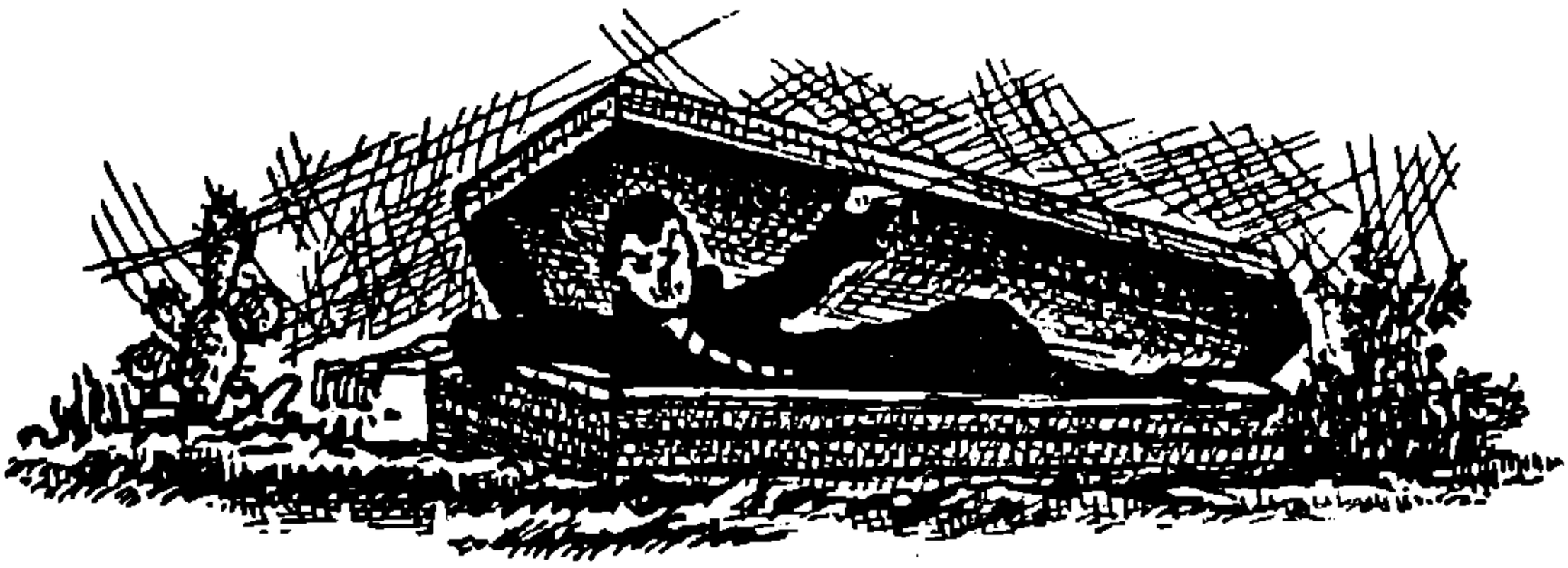

রিপোর্টার

রবার্ট আর্থার

কিছুতেই আমার সময় কাটে না। ভারি বিরক্তিকর রাতটা। হেডকোয়ার্টারে কাগজের রিপোর্টাররা বসে আছে পুলিশী সংবাদের সন্ধানে। বিশেষ করে এক্সপ্রেস পত্রিকার সাংবাদিক ব্র্যাডলী বসে বসে অধৈর্য হয়ে উঠছে। একটা মজা না করলে, কাউকে নিয়ে অভিনব কিছু না করলে, আর পারা যাচ্ছে না।

সজোরে হাত ছুঁড়ে সে বলল, 'চলো বুড়ো পপকে নিয়ে মজা করা যাক।' পপ হেণ্ডারসন রাত্রিবেলায় মর্গ পাহারা দেয়। পপের বয়স সত্তর ছাড়িয়েছে, হাত পা বিশেষ নাড়তে চায় না, বুদ্ধিও যেন লোপ পেয়েছে। অনেক আগেই ও রিটায়ার্ড করত, কিন্তু বেচারার বাড়িতে অনেক ঝামেলা, আর বউটাও পঙ্গু। তাই কতৃপক্ষ দয়া করে ওকে রেখেছে। অবশ্য কাজটা ওর সহজই।

'কি ধরনের মজা করতে চাও'— রেকর্ড পত্রিকার আইন আদালত বিভাগের রিপোর্টার ফারনেস জানতে চাইল। ব্র্যাডলী তার পরিকল্পনা বুঝিয়ে বলল।

কিন্তু ফারনেস খুশি হল না। সে বলল, 'বুড়ো পপকে ছেড়ে দেওয়াই ভাল।' ক্লনিকল-এর রিপোর্টার মরগানেরও তাই মত। কিন্তু ছটফটে ব্র্যাডলী কিছু না করে থাকতে পারে না। অগত্যা সকলেই মত দিল।

মর্গের দিকে তারা এগোল। বুড়ো পপ তার অফিসে ঘরে বসে ঝিমোচ্ছে।

'কখন তার ডিউটি শেষ হবে।'

মর্গের একদিকে কুড়িটা লম্বা বাক্স ভর্তি কুড়িটা খোপ। প্রত্যেকটা বাক্সে একটা করে লোক কোনওরকমে শুয়ে থাকতে পারে। নড়াচড়ার কোনও উপায় নেই। অবশ্য ওখানে যারা থাকে তারা কেউই নড়াচড়া করে না। সবগুলোই রেফ্রিজারেটেড অর্থাৎ বরফ আধারে রাখা এবং প্রায় সবকটাই মৃতদেহ ভর্তি।

ব্র্যাডলী বলল, 'পপ, আমরা ১১ নং খোপটা দেখতে চাই। মনে হচ্ছে ওখানেই সেই হারিয়ে যাওয়া নিউইয়র্ক ব্যাঙ্ক কর্মীর মৃতদেহটা আছে।'

''১১ নম্বর?'—পপ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে ওদের নিয়ে গেল। ১১ নম্বর খোপের ছিটকানি খুলে বাক্সটাকে পুরো টেনে আনল, তাতে চাদরে ঢাকা একটা মৃতদেহ। ব্র্যাডলী চাদরটা খুলে মৃতের মুখ দেখার ভান করল।

'চেহারা দেখে ওই রকম মনে হচ্ছে। পপ, তুমি কি কষ্ট করে ওর ফাইলটা আনবে?'

'ঠিক আছে মিঃ ব্র্যাডলী।' পপ চলে গেল, তার পেছনে পেছনে গেল ফারনেস। তারা বাইরে যাওয়া মাত্র ব্র্যাডলী ও মরগ্যান পরিকল্পনামতো তাদের কাজে লাগল। ফারনেস কাজের অছিলায় পপকে অফিসঘরে আটকে রেখেছিল। মরগ্যান এসে বলল, 'না পপ, আমাদেরই ভুল হয়েছিল। তুমি ১১ নম্বরকে ঠিক জায়গায় রেখে এস, আমরা চলি।'

পপ ধীর পদক্ষেপে মর্গে ঢুকল। সে খোপগুলোর কাছে গেছে, হঠাৎ একটা চাদরের তলা থেকে যেন আর্তনাদ শোনা গেল। সাদা চাদর ঢাকা একটা মৃতদেহ উঠে বসল, মুখের চাদর সরে গেল, অল্প আলোয় বৃদ্ধ স্থবির পপ বুঝতে পারল না ওটা ব্র্যাডলীর মূর্তি।

'আমি কোথায়?'—শুষ্ক শূন্য গলায় ব্র্যাডলী বলল। 'তোমরা—আমাকে নিয়ে কি করেছ?' বিস্মিত বিমূঢ় পপ থমকে দাঁড়িয়ে, ব্র্যাডলীর আঙুল তার দিকে উঁচিয়ে আছে।

'তুমি আমায় কি করেছ? তুমি—আমায়—খুন—করতে—চেয়েছ।'

ব্যাপারটা খুব স্থূল জড় বুদ্ধি পপের পক্ষে মারাত্মক। তার পা যেন আটকে গেছে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। পরক্ষণেই সে উন্মত্তের মতো ছুটল।

'হায় ভগবান, ও বেঁচে উঠেছে!' পপ চেঁচাচ্ছে। 'ও বেঁচে উঠেছে।' পপ তার পক্ষে অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ছুটছে ডিউটিরত পুলিশ সার্জেন্টের কাছে।

১২ নং খোপ থেকে বেরিয়ে এল। হাসতে হাসতে হাসতে চলল প্রেসরুমের দিকে বন্ধুদের কাছে। যদিও তার বন্ধুরা পপকে নিয়ে এরকম ঠাট্টায় মোটেই খুশি নয়।

পপ আসছে খিটখিটে বদমেজাজী সারজেন্টকে নিয়ে। পপের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে—'সত্যি বলছি মড়াটা উঠে বসল, আমার দিকে চেয়ে কথা বলল।' তারা মর্গে ঢুকল। বেরোল কিছুক্ষণ পরে। সার্জেন্ট ক্রুদ্ধ, সে পপকে যাচ্ছেতাই গালাগালি দিচ্ছে। রিপোর্টারদের সামনে দিয়ে যাবার সময় সে জ্বলন্ত চোখে তাকাল। বেচারা পপ আরো হতবুদ্ধি, আরো মন্থর।

ব্র্যাডলীর ওপর বিরক্ত হয়ে চলে গেল মরগ্যান আর ফারনেস। ব্র্যাডলী একা বসে সিগারেট টানছে—'যারা ঠাট্টা পছন্দ করে না তাদের আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।' পপ এল তার কাছে, নিরীহ স্বরে বলল, 'আপনার ওরকম করা উচিত হয়নি মিঃ ব্র্যাডলী। এতে আমার ক্ষতি হবে। একে সার্জেন্ট আমায় দেখতে পারে না, আমার নামে লাগায়, তার ওপর এরকম ঠাট্টা ওর পছন্দ নয়। ও বলছিল আপনারাই এসব করেছেন। এরকম হলে সার্জেন্ট আমার নামে রিপোর্ট করবে, আমার চাকরি চলে যাবে। আপনি আমাদের মতো সামান্য লোকের সঙ্গে এরকম ঠাট্টা করবেন না, মিঃ ব্র্যাডলী।'

বিরক্ত ব্যাডলী পথে বেরল। বাইরে অন্ধকার, ভীষণ ঠাণ্ডা। পপকে নিয়ে মজাটা তেতো হয়ে গেল। আর কাউকে নিয়ে একটা মজা করলে মন্দ হত না। পথ চলতে চলতে ডক এলাকার কাছে একটা বারে সে ঢুকল।

জায়গাটা ছোট নো রা। একটু পান করার পর ব্র্যাডলীর মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। আর একজনের পেছনে লাগলে মন্দ হয় না। রাত গভীর, বার প্রায় খালি। শুধু দোকানদার, সে, আর গাট্টাগোট্টা বেঁটেখাটো একটা লোক—বোঝা যায় জাহাজে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়। লোকটা মনের আনন্দে মদ গিলছে। ব্র্যাডলী

ভাবল ওই জাহাজটির পেছনেই লাগা যাক। নীচু হয়ে জুতোর ফিতে খোলার ভান করল ব্র্যাডলী, তারপর জুতোর গায়ে দেশলাই কাঠি ঘষে আগুন জ্বেলে লোকটার পায়ে ফেলল নীচু হয়ে।

চমকে চেঁচিয়ে উঠল লোকটা, তার জুতোমোজায় আগুন লেগে গেছে। সে একপায়ে লাফাচ্ছে, আর একপায়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছে।

ব্র্যাডলী আর হাসি চাপতে পারল না, অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। কি মজার রসিকতাই না হয়েছে। লোকটা পা নামিয়ে অতি ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে চাইল ব্র্যাডলীর দিকে। তারপর চোখের নিমেষে প্রচণ্ড জোরে মারল এক ঘুঁষি। লোহার মতো লাগল ব্র্যাডলীর মুখে, ঠোঁট কেটে গেল, দাঁত ভেঙে গেল, ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। টলতে টলতে ব্র্যাডলী পড়ে গেল পেছন দিকে। ঘাড়টা পাশের কঠিন রেলিঙে লেগে যেন ভেঙে গেল, মাথার খুলিতে একটা প্রবল যন্ত্রণা অনুভব করল ব্র্যাডলী, তারপর সব আলো নিভে গেল।

লোকটার চোখে তখনও বিদ্বেষ—'ব্যাটা আমার পায়ে আগুন দিয়ে মজা করতে চেয়েছিল।

দোকান মালিক বলল, 'তুমি যা একটা ঝেড়েছ না মাইরি; ব্যাটা মড়ার মত শুয়ে আছে।'

'মুখে একটা ছোট্ট ঘুষি চালিয়েছি, তাতেই দুটো দাঁত ভেঙেছে। ব্যাস। আবার এরকম করতে এলে বাছাধনের মনে থাকবে মারটা।'

'কিন্তু ওর মাথাটা কেমন যেন বেঁকে গেছে। মনে হচ্ছে—' বার মালিক ঝুঁকে ব্র্যাডলীর নাড়ী দেখল, বুকটাও দেখল। তার মুখ সাদা হয়ে গেল। 'লোকটা মরে গেছে'—সে শুকনো গলায় বলল, 'একেবারে বরফ হয়ে গেছে।'

'মরে গেছে?' বেঁটে লোকটা অস্থির ভাবে হাত নাড়ল, 'মাইক, এটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট। আমি এমন জোরে মারিনি যে লোকটা মরে যাবে। তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছ এটা অ্যাকসিডেণ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'ঠিক ঠিক, এটা অ্যাকসিডেণ্ট ছাড়া আর কিছু নয়।' বার মালিক ছুটে গিয়ে দরজায় তালাচাবি দিল, বাইরের সব আলো নিভিয়ে দিল, ভেতরের আলো কমিয়ে দিল। তারপর এল ব্র্যাডলীর কাছে। 'বুঝলে হে কিড, এরকম খুন জখম ভাল নয়। পুলিশগুলো এমনিতেই পেছনে লেগে আছে, আর খুন জখম হলে

তো কথাই নেই। তাছাড়া তুমি তো জোর মারদাঙ্গা করে দুবার শ্রীঘর ঘুরে এসেছে।'

'আমি জানি', কিড একটু কটুভাবেই বলল, 'আমার মেজাজ অল্পেই চড়ে যায় আর সঙ্গে সঙ্গে আমি ঘুঁষি চালিয়ে দিই। এতেই ঝামেলা পাকায়। ওসব থাক, এখন বল তো কি করতে হবে।'

বার মালিক ব্র্যাডলীর পকেট ঘেঁটে কাগজপত্র বার করল। একটু নরম সুরে সে বলল, 'কিড ব্যাপারটা মোটেই ঠিক করলে না। ছোকরা কাগজের লোক, এ যে পুলিশের থেকে বেশি ঝামেলা হল।'

'কাগজের লোক, এরকম বদমাইশি্ করছিল?' কিড ক্ষেপে গিয়ে বলল, 'আমার একটা ঘুঁষি খেয়েই ঘাড় ভেঙে পড়ে আছে। উঃ মহাবিপদ ঘটল।'

'আরে ভেবো না ভেবো না। আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওকে ধরে ডকের কাছে নিয়ে গিয়ে নীচে ফেলে দোব।

মাইক ব্র্যাডলীর পকেট হাতড়ে কাগজপত্র ও সবকিছুই বার করল। ঘরের আলো নিভিয়ে আস্তে আস্তে পেছনের দরজা খুলল। সামনেই অন্ধকার নোংরা নির্জন পথটা সোজা চলে গেছে। দুজনে ব্র্যাডলীকে মাঝখানে রেখে জড়িয়ে ধরে হাঁটবার ভঙ্গিতে নিয়ে চলল যেন ও বেহেড মাতাল হয়ে গেছে। অন্ধকার নির্জন পথে ওরা আস্তে আস্তে এগোল। চারপাশ নিঃশব্দ নির্জন থমথমে। তারপর ঝপ করে একটা শব্দ।

ব্র্যাডলীর চেতনা ফিরে এল হঠাৎ। নিঝুম আচ্ছন্ন হয়ে আছে সে, পাশ ফেরার চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। তার শরীর অবশ, মাংসপেশীগুলো অনড় হয়ে আছে। তার কোনও যন্ত্রণার বোধ নেই, কোনও অনুভূতি নেই। কিছুতেই বুঝতে পারছে না সে কোথায় শুয়ে আছে।

তার মনে পড়ল পড়ে যাবার সময় তার ঘাড়ে আঘাত লেগেছিল। স্কুলে পড়বার সময় একদিন ফুটবল খেলতে গিয়ে তার শিরদাঁড়ায় জোরে ঘা লাগে তাতে সে একমাস বিছানায় শুয়ে চিল। এবারেও তেমন হয়েছে। বরং মনে হয় চোট আরো বেশি, কেন না পড়ার সময় হাড়ভাঙার শব্দ শুনেছিল সে।

একটা জীর্ণ গলার স্বর ব্র্যাডলীর কানে ভেসে এল। কে যেন বলছে, 'মড়াটা তোমার জিম্মায় রইল। ওটা ডাকের ধারে পড়েছিল। মুখ দেখে মনে হচ্ছিল

কেউ মেরে ফেলে গেছে। কাছে গিয়ে দেখি ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে—অবশ্য অমন ঠাণ্ডায় পড়ে থাকলেও জ্যান্ত মানুষও জমে যায়। লোকটার পরিচয় পাওয়া যায়নি। ওকে বেশ আরামে শুইয়ে রাখ, কাল মড়াটা কাটাছেঁড়া হবে।'

কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল। ব্র্যাডলী বুঝতে পারল তাকে তোলা হচ্ছে। ব্র্যাডলীর ঘাড়ের ব্যথা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। সে চোখ মেলল সম্পূর্ণ চেতনা না থাকলেও বুঝল কোথায় এসেছে। সে আস্তে আস্তে ডাকল—'পপ, পপ।'

বুড়ো পপ শুনতে পায়নি। সে ব্র্যাডলীর হাত পা সোজা করে দিচ্ছে। মড়ার খোপে একে ঢোকাতে হবে। ব্র্যাডলীর ডাকে হতবুদ্ধি পপ থমকে দাঁড়াল। তার চোখে মুখে অস্বস্তির চিহ্ন। ব্র্যাডলী আপ্রাণ প্রয়াসে বলল, 'পপ, আমি ব্র্যাডলী। এখনও বেঁচে আছি। যাও ডাক্তার ডেকে আন।'

পপ হেণ্ডারসন চমকে তাকাল। ব্র্যাডলীর ওপর ঝুঁকে পড়ল। স্থবির জড়ানো কণ্ঠে বলল, 'মিঃ ব্র্যাডলী, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনার মুখ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।' 'ও কিচ্ছু না,' ব্র্যাডলী প্রাণপণ চেষ্টায় বলল, 'আমি বেঁচে আছি, আমাকে এখান থেকে বার কর। এক্ষুণি একটা ডাক্তার ডাকতে হবে।'

পপ হেণ্ডারসন ইতস্ততঃ করছে, বুঝতে পারছে না কি করবে। একটু আগে মিঃ ব্র্যাডলী তাকে এভাবেই ঠকিয়েছিল। একটা সাদা চাদর হাতে নিয়ে সে বলল, 'মিঃ ব্র্যাডলী, আপনাকে আগেই বলেছি আর ইয়ার্কি করবেন না। একবার যা করেছেন যথেষ্ট, একরাত্তিরে দুবার এরকম করবেন না।'

সে ব্র্যাডলীর শরীরটা মড়া ঢাকা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে দিল। 'আর একবার বোকা বনলে সার্জেন্ট রবার্টস আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না,' পপ রুক্ষ গলায় বলল। 'না মিঃ ব্র্যাডলী, একরাতে দুবার ওরকম ঠাট্টা মোটেই ভাল না।'

সে আস্তে আস্তে বাক্সটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ১২ নম্বর খোপটার মুখ ভাল করে এঁটে দিল। তারপর মর্গের দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এল। অফিসে বসে বসে ঝিমোচ্ছে পপ—কখন ডিউটি শেষ হবে।

বড়দিনের গল্প

চার্লস ডিকেন্স

বড়দিনের ঠিক আগের দিন। স্ক্রুজ এণ্ড মারলি ফার্মের মালিক স্ক্রুজ আফিসে বসে কথা বলছেন। মারলি অবশ্য মারা গেছে। বছর সতের আগে—ঠিক এই দিনেই। স্ক্রুজ এখন ফার্মের একমাত্র মালিক। স্ক্রুজের মতো কৃপণ, লোভী, কটুভাষী কর্কশ স্বভাবের লোক খুব কমই আছে বলে মনে হয়। তার শরীর মনে কোথাও উত্তাপ ভালবাসা সহৃদয়তা আন্তরিকতা কিচ্ছু নেই। কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে না—'কেমন আছেন? আমাদের বাড়ি কবে আসবেন?' কোনও ভিখিরি তার কাছে কিছু চায় না, ছেলেরা জানতে চায় না কটা বাজল। জন্তু জানোয়ারও তাকে বোধহয় এড়িয়ে চলে। স্ক্রুজ কিন্তু এসব ব্যাপার একদম করে না—লোকের বন্ধুত্ব ভালবাসা দিয়ে কি হবে? তার টাকা হলেই হল। সন্ধ্যে ঘনায়। বাইরে অসহ্য ঠাণ্ডা ঘনকুয়াশা কালো অন্ধকার। তবু লোক আনন্দে অধীর। বড়দিন এসেছে। মহামানব যীশুর পুণ্য আবির্ভাব কাল। স্ক্রুজের ভাগনে ফ্রেড

এসে বলেন, 'বড়দিনের শুভেচ্ছা গ্রহণ কর, ভগবান তোমার ভাল করুন।'

স্ক্রুজ অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলল, 'চুলোয় যাক বড়দিন। তোমার মতো গরীবের এতে কী দরকার? যত্তো সব···।'

ফ্রেড বিস্মিত হয়। শুভ পবিত্র বড়দিনকে কেউ কী কটুক্তি করে, সেকথা কল্পনা করা যায় না। তবু সে মামা স্ক্রুজকে পরের দিন খাবার নিমন্ত্রণ করল। বিরক্ত ক্রুদ্ধ স্ক্রুজ তাকে ভাগিয়ে দিল।

এমন সময় দু'জন বিশিষ্ট লোক এসে বড়দিনের শুভ মুহূর্তে গরীব ছেলেমেয়ের জন্য কিছু সাহায্য চাইল স্ক্রুজের কাছে। স্ক্রুজ তাদেরও প্রায় একইভাবে তাড়িয়ে দিল। বলল, 'কেন কোনও জেলখানা বা অনাথ আশ্রম নেই ওদের জন্য!' স্ক্রুজ তার ক্লার্ক ববকে অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে বড়দিনের জন্য কালকের দিনটা ছুটি দিয়ে অফিস বন্ধ করে দিল।

মহামানব যীশুর আবির্ভাবকে স্মরণ করে পৃথিবীর সকলেই আনন্দে অধীর; কিন্তু স্ক্রুজের বিরক্তির সীমা নেই।

রাত হয়েছে। স্ক্রুজ খাওয়া দাওয়া শেষ করেছে। তার নিষ্প্রাণ নিরানন্দ ঘরে সে বসে। এমন সময় ও কি! এক প্রেতমূর্তি তার ঘরে প্রবেশ করল—এ যে তার প্রাক্তন বন্ধু মারলির ভূত। মারলি বলল, সে সারাজীবন প্রেম ভালবাসাহীন কঠিন কঠোর জীবন কাটিয়েছে, তাই আজও সে শৃঙ্খলিত, আজও তার শান্তি নেই বিশ্রাম নেই, আছে খালি অনুতাপের দাহ। স্ক্রুজও তার পথে চলেছে, তবে চেষ্টা করলে সে এরকম দুর্ভাগ্য থেকে মুক্তি পেতে পারে। সে স্ক্রুজকে বলল—'পরপর তিনরাত্রি তিনটি প্রেতাত্মা তোমার কাছে আসবে। তারা না এলে তোমার কোনও মুক্তি নেই, এমন কি পরিত্রাণও নেই।'

মারলির মূর্তি এই বলে মিলিয়ে গেল। স্ক্রুজও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

যখন স্ক্রুজের ঘুম ভাঙল গভীর অন্ধকার। সে কি ঘুমিয়েই পুরোদিন কাবার করে দিল! সে মারলির প্রেতমূর্তির কথা ভাবছে। একটা বাজল। হঠাৎ একটা হাত তার মশারি তুলল; তার সামনে দাঁড়িয়ে এক প্রেতমূর্তি—শান্ত সুন্দর শিশুমূর্তি যেন। সে অতীত বড়দিনের আত্মা—স্ক্রুজের অতীতের। আত্মা স্ক্রুজকে নিয়ে গেল অতীত দিনের এক কালে—স্ক্রুজ সবিস্ময়ে দেখল তার ছেলেবেলার

জীবন। বড়দিন। ছেলেরা আনন্দ উৎসবে মেতে রয়েছে। প্রেত স্ক্রুজকে নিয়ে গেল এক স্কুলবাড়িতে যেখানে একটি নিঃসঙ্গ একাকী ছেলে দুঃখ বেদনায় নিথর হয়ে বসে আছে। হঠাৎ দরজা খুলে ছেলেটির ছোট বোন ঢুকল, আনন্দ উজ্জ্বল স্বরে সে বলল, 'দাদা আমি তোকে বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি!' সে ভালবাসায় উচ্ছ্বাসে অধীর। দাদাকে নিয়ে তার কতই না আনন্দ।

স্ক্রুজ সবিস্ময়ে দেখল যে, ছেলেটি সে নিজে আর মেয়েটি তারই বোন। গভীর বেদনার সঙ্গে স্ক্রুজ স্মরণ করল এই বোনটি বিয়ের পরই মারা যায়। এক ছেলে রেখে মারা গিয়েছিল, যাকে সে কাল ভাগিয়ে দিয়েছে।

প্রেতমূর্তি এবার তাকে নিয়ে এল তার পুরনো কর্মক্ষেত্রে। তার মালিক বৃদ্ধ ফেজিউইগ সবাইকে নিয়ে বড়দিনের আনন্দ উৎসবে মত্ত হয়ে ওঠে—গান নাচ খাওয়া দাওয়া অফুরন্ত আনন্দে সবার মন প্রাণ পূর্ণ করে দেয়। তরুণ স্ক্রুজ সামান্য কর্মচারী মাত্র—কিন্তু সেও কত আনন্দ পেল। হঠাৎ স্ক্রুজের মনে পড়ল তার কর্মচারীকে সে কত রূঢ়ভাবে চলে যেতে বলেছে এই বড়দিনের আনন্দময় পরিবেশে। বেদনায় তার মন ভরে উঠল।

প্রেতমূর্তি তাকে দেখাল আর একটি ছবি। যুবক স্ক্রুজ একটি ঘরে বসে, সেখানে একটি সুন্দরী মেয়ে। স্ক্রুজের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ের কথা, কিন্তু স্ক্রুজের অর্থলোভ ও নানা উচ্চাকাঙ্খায় জন্য মেয়েটি চলে গেল। দৃশ্যটা আবার আর একটু পালটে গেল। একটা ঘরে স্বামী স্ত্রী ও তাদের বাচ্চা মেয়ে বসে—তাদের সুখের সংসার। স্বামী স্ত্রীকে বলল যে, একটু আগে তার পুরনো বন্ধু স্ক্রুজকে দেখল, সে কত একা কত নিঃসঙ্গ। তার কেউ নেই।

স্ক্রুজ সইতে পারছে না আর। প্রেত তাকে নিয়ে গেল তার ঘরে। স্ক্রুজ গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

পরদিন রাত একটায় স্ক্রুজের ঘুম ভাঙল। এবার এল দ্বিতীয় প্রেতমূর্তি। সে বলল—'আমি বর্তমান বড়দিনের আত্মা। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

স্ক্রুজ তার সঙ্গে এল শহরতলীতে, স্ক্রুজের কর্মচারী বব ক্র্যাচিট (Cratchit)-এর ঘরে। সবাই আনন্দমগ্ন—বব, তার স্ত্রী, কর্মস্থল থেকে আসা মেয়ে মার্থা, মেজ মেয়ে বেলিন্দা, ছেলে পিটার, এমন কি বিকলাঙ্গ পঙ্গু ছোট্ট সুন্দর ছেলে

টিমও। বড়দিনের সামান্য উপহার পেয়েও তাদের আনন্দের সীমা নেই। টিমকে দেখে স্ক্রুজের নাম যেন আতঙ্কের সৃষ্টি করে। তবু এই আনন্দের দিনে তারা কারুর অমঙ্গল চায় না, তাঁরা স্ক্রুজের সুখ শান্তি মঙ্গল কামনা করে। তাদের আন্তরিকতা সমবেদনা সহৃদয়তা দেখে স্ক্রুজের হৃদয় মথিত হয়।

তারপর তারা গেল খনি শ্রমিকদের বাস অঞ্চলে। সেখানে স্ক্রুজের ভাগনে ফ্রেড থাকে। একটা সুন্দর উজ্জ্বল আলোকিত ঘরে সবাই আছে—ফ্রেড, তার সুন্দরী স্ত্রী, তাদের বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন, প্রত্যেকে হাসিখুশি, সুখী, উচ্ছল। ফ্রেড বলল, 'সত্যি, মামা স্ক্রুজের জন্য খুব দুঃখ হয়। ওরকম স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক লোক দেখা যায় না। মামাকে বাড়িতে ডাকলুম, এল না। এই আনন্দ উৎসবে যোগ না দিতে পেরে মামা নিজেরই ক্ষতি করছে।' প্রেমে প্রীতিতে আনন্দে ভালবাসায় তারা বড়দিন কাটাল, যদিও তারই মধ্যে স্মরণ করল স্ক্রুজকে। স্ক্রুজের হৃদয়েও আনন্দের স্পর্শ লাগল।

মিলিয়ে গেল দৃশ্য। তারা যাচ্ছে। ছায়ামূর্তির বস্ত্রের প্রান্তভাগে দেখা গেল দুটি শিশু—হতভাগ্য দুর্দশাগ্রস্ত নিঃস্ব রিক্ত দু'টি ছেলেমেয়ে। বোঝাই যাচ্ছে এদের বাপ মা আত্মীয় স্বজন কেউ কোথাও নেই। দারিদ্র্যে অনাহারে এরা মৃত্যু বরণ করবে।

স্ক্রুজ বলল, 'এদের আশ্রয় দেওয়া দরকার, না হলে এরা শেষ হয়ে যাবে।'

ছায়ামূর্তি উত্তর দেয়, 'কেন, কোনও জেলখানা বা অনাথ আশ্রম নেই?'

স্ক্রুজের মনে পড়ল সে আগে একথাই বলেছিল। সে কত হৃদয়হীন, কত নিষ্ঠুর। ওরা ফিরে গেল।

তারপর এল তৃতীয় ভূত। ঘন কালো কাপড়ে তার সর্বাঙ্গ ঢাকা। কেবল হাতদুটো বেরিয়ে আছে। তাকে দেখলে ভয় হয় আতঙ্ক জাগে। সে বলল, 'আমি ভবিষ্যৎ বড়দিনের আত্মা। যা ঘটবে তাই আমি তোমাকে দেখাব।'

স্ক্রুজ তার সঙ্গে এল শহরে। স্ক্রুজ শুনতে পেল কয়েকজন ব্যবসায়ী অবজ্ঞায় অনাদরে একজনের কথা বলছে, সে মারা গেছে। প্রেতমূর্তি এবার স্ক্রুজকে নিয়ে গেল শহরের এক নিকৃষ্ট অঞ্চলে এক পুরানো নোংরা মাল কেনা-বেচার দোকানে। সেখানে বুড়ো বদমায়েস এক দোকানদার বসে। এমন সময় তিনজন অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর মেয়ে-পুরুষ এল তিনটে বোঝা নিয়ে। বুঝতে পারা গেল

এক বেওয়ারিশ হতভাগা বুড়ো মারা গেছে ও তার জিনিসপত্র এরা চুরি করে এনেছে বিক্রি করবার জন্যে। এদের বেচাকেনার পালাও শেষ হল। এভাবেই একটা লোকের জীবন সমাপ্ত হল, যে বেঁচে থাকতে সকলকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে, আর মৃত্যুর পর এই হয়েছে তার পরিণতি। স্ক্রুজ ভয়ে আতঙ্কে কাঁপছে। ওই হতভাগ্য লোকটা তো তারই মতো, সেও এই পথেই এগোচ্ছে।

দৃশ্য পালটাল। তারা একটা ঘরে। অন্ধকারে শয্যাবিহীন জীর্ণ খাটে অযত্ন শায়িত একটি দেহ—তাকে দেখার কেউ নেই, তার জন্য দুঃখ করার কেউ নেই, কাঁদবারও কেউ নেই। অসহ্য আর ভয়ংকর শীতল অন্ধকারে শুধু একটা প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। আর্তযন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে স্ক্রুজ। সে বলে, 'এই শহরে কি কেউ নেই যে এই লোকটির মৃত্যুতে, যার হৃদয় বেদনায় ভরে যাবে?

তারা এল এক ছোট দুঃখী পরিবারে। স্ত্রী ব্যাকুল হয়ে অপেক্ষা করছে, তার স্বামী দ্রুত আসছে—তার মুখে বেদনার ছায়া থাকলেও আনন্দের চিহ্নও অস্পষ্ট নয়। সে বলল, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমরা এখন ঋণমুক্ত। সেই বুড়োটা যার কাছ থেকে আমরা ধার নিয়েছিলুম সে গতকাল মারা গেছে।' বাড়ির সকলেই এই সংবাদে আনন্দিত, যদিও তারা জানে মৃত্যু কত বেদনার।

স্ক্রুজ কাতরভাবে বলল, 'মৃত্যুতে ব্যাকুলতা বেদনা কি কোথাও নেই?'

তারা গেল স্ক্রুজের কর্মচারী ববের ঘরে। হাসি খুশি পরিবারটি নির্বাক নিস্তব্ধ বেদনামথিত। কারণ ছোট টিম আজ মারা গেছে। সকলের বুকে গভীর কান্না জমে আছে, কখনও চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠছে। টিমের মৃত্যুর থেকে বড় বেদনা এদের জীবনে আর কিছু নেই।

স্ক্রুজ প্রেতকে বলল যে, সে জানতে চায় মৃত লোকটির পরিচয়। প্রেত তাকে নিয়ে গেল সমাধিস্থলে। একটা সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে সে আঙ্গুল দিয়ে দেখাল—স্ক্রুজ দেখল সমাধিফলকে লেখা আছে তারই নাম।

সে দুঃসহ যন্ত্রণায় চিৎকার করে বলল, 'না না না, এ কখনও হতে পারে না।'

প্রেতমূর্তি স্থির।

স্ক্রুজ আবার কান্নাভরা স্বরে বলল, 'আমি এখন আগের মতো নেই। হে

শুভ আত্মা, তুমি আমায় শান্তি দিয়েছ, দয়া করেছ। আমায় সাহায্য কর যেন আমার জীবনকে পালটে ফেলে তোমার দেখানো ছবি জীবন থেকে মুছে ফেলতে পারি।'

সহৃদয় মূর্তি বিচলিত।

স্ক্রুজ আবার বলল, 'আমি বড়দিনকে সম্মান করব, সারা বছর একে মানব। আমি মানুষকে ভালবাসব। যা শিক্ষা আমি তোমাদের কাছ থেকে পেয়েছি তা অবশ্যই পালন করব।'

স্ক্রুজের কান্না হাহাকারে ভরিয়ে তোলে এ পৃথিবীর বাতাসকে।

ঘুম ভেঙে গেল স্ক্রুজের। সে তার নিজের ঘরে নিজের বিছানাতেই শুয়ে আছে। এক অদম্য আবেগে অপরূপ আনন্দে সে অধীর উন্মথিত। সে অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতকে দেখেছে, সে নতুন করে বাঁচবে। আত্মারা তার মধ্যে আছে—তাকে শিক্ষা দিয়েছে তার বন্ধু মারলি, বড়দিন আর ভগবান। সে ভাল হবে, সবাইকে নিয়ে বাঁচবে। তার নিজেকে মনে হচ্ছে পালকের মতো হালকা, দেবদূতের মতো সুখী, স্কুল ছাত্রের মতো আনন্দময়।

স্ক্রুজ দৌড়ে গিয়ে জানালা খুলল। আজ বড়দিন, আকাশে কোনও মেঘ নেই, কুয়াশা নেই; চারদিক পরিস্কার উজ্জ্বল আনন্দময়, উচ্ছল ঠাণ্ডা, সোনালী রোদ, উদ্ভাসিত আকাশ, মধুর পবিত্র বাতাস, গীর্জার সুস্বর ঘন্টাধ্বনি। তাতে স্ক্রুজের মন আনন্দে ভরে উঠল।

স্ক্রুজ দোকানের সব চেয়ে বড় পাখির মাংস কিনে পাঠাল তার কর্মচারী ববের বাড়িতে, কিন্তু নিজের নাম জানাল না। কি আনন্দই না ওরা পাবে! পথে বেরোল স্ক্রুজ—হাসি খুশি উৎফুল্ল। সে সবাইকে প্রীতি ভালবাসা জানাতে লাগল। হঠাৎ সেই লোকদের সঙ্গে দেখা যারা গরীব ছেলেমেয়েদের জন্য টাকা চাইতে গিয়েছিল। স্ক্রুজ তাদের এত টাকা দিতে চাইল যা ভাবা যায় না, কারণ স্ক্রুজ তো বুঝেছে, জীবনের মানে খুঁজে পেয়েছে।

স্ক্রুজ বিকেলে ফ্রেডের বাড়ি গেল। তাকে দেখে সবাই অবাক। কিন্তু স্ক্রুজের কাছে আজ সবই মধুময়, আনন্দ-নিবিড়।

পরদিন। স্ক্রুজ আফিসে গেল। বব এল একটু দেরিতে। স্ক্রুজ কৈফিয়ৎ চাইল।

বব দেরি হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইল। বলল যে, কাল সবাই বড়দিনে আনন্দ উৎসব করেছে তাই তার দেরি হয়েছে।

স্ক্রুজ রাগত স্বরে বলল, 'আমি এরকম সহ্য করব না। তোমাকে এর জন্য শাস্তি পেতে হবে।'

বব ভীত, নির্বাক।

স্ক্রুজ বলল, 'তুমি দেরি করে এসেছ এর শাস্তিস্বরূপ তোমার মাইনে বাড়ানো হল!'

বব হতবাক! স্ক্রুজ কি ঠাট্টা করছে! তা নয়, স্ক্রুজ আরও বলল যে, সে ববের মাইনে বাড়াবে, তার পরিবারকেও সাহায্য করবে।

স্ক্রুজ তাইই করল। হয়ত অনেক বেশি করল। ছোট্ট টিম কিন্তু মরে যায় নি। স্ক্রুজ তাকে সারিয়ে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করল, টিম এখন তো তার আদরের সন্তান।

স্ক্রুজের মতো আন্তরিক বন্ধু, সহৃদয় প্রভু, সৎ লোক সারা দেশে এখন খুব কমই আছে। ভগবান যীশু এরকম সব লোকের শুভবুদ্ধি দেন। তাহলে পৃথিবীতে আর দুঃখ থাকবে না।

ধূসর আতঙ্ক

এনথোনি হর্নার

জানালা দিয়ে তাকিয়েই হঠাৎ করে একটু চিন্তিত হয়ে উঠলো বেকারের মুখ। চারপাশ এমনই ঝাপসা। রাস্তার পাশে বাড়ি ছাড়া পড়েনা আর কিছু। একটু নার্ভাস মতো হ'য়ে ঠোঁট চেটে নিলেন।

আমার মনে হচ্ছে বাসের দেরি হবে, তাই না?

হেড ক্যাশিয়ারা নাকে একটা শব্দ তুলে বললেন, দেরি মানে? এ অবস্থায় আর চলবেই না। পকেট থেকে ঘড়ি বের করে ভুরু কুঁচকোলেন তিনি। ছ'টা বাজতে দশ মিনিট, হেঁটে যাওয়াই ভালো, বড় জোর ঘন্টাখানেকের রাস্তা। তুমি বরঞ্চ দরজার দিকে দ্যাখো। কোট আর হ্যাট পরে তিনি বেকারকে 'গুডনাইট' করলেন। হেড ক্যাশিয়ারের মিলিয়ে যাওয়া শরীর দেখতে দেখতে অধৈর্য বেকার হাঁটলেন তাঁর পেছনে। যদিও তাঁর বাড়ি একেবারে উল্টোমুখো।

নানা ভাবনায় তাঁর কপালে ঘামের বিন্দু। মিরিয়ামের কাছ থেকেও কোনো

সহানুভূতি পাওয়া যায় না। আমার মনে হয় তোমার গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। কুয়াশায় তুমি এরকম ছেলেমানুষ হয়ে যাও কেন? এভাবে কথা শুনতেই হ'তে পারে।

বেকার কিছুই বলেন না। বিয়ের পর দু'একবার তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেছেন স্ত্রীকে। কিন্তু স্ত্রী কোনও কথাই শোনেন না।—এসব তোমার আতঙ্ক। সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের এসব থাকে না।

জানালা থেকে উঠে এলেন বেকার। চারাপাশে পুরু কুয়াশার চাদর। এখানে থাকার ভরসা আর তার নেই। কেয়ার টেকার সাড়ে ছ'টাতেই দরজা বন্ধ করেছে।

আশপাশে দারুণ কুয়াশা। মিনিট কুড়ির ভেতর নিজেকে সম্পূর্ণ হারালেন তিনি। বিপন্ন অবস্থায় চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। দৌড়তে শুরু করলেন। হাত ছুঁড়ছেন। চেহারা আক্রমণাত্মক। লোকজনের সঙ্গে দুবার ধাক্কা। তারপর বিশাল একটা থামে হোঁচট খেয়ে গড়াতে গড়াতে একেবারে খানায়।

তার ধারণা নেই কখন আলোর রেশ এলো চোখে। একটা বার-এ এসে ব্র্যাণ্ডি খেলেন। মালিক সান্ধ্য দৈনিক পড়ছিলেন, তার দিকেও নজর করলেন। খদ্দের আর মাত্র একজন। ছোট খাটো চেহারা। মাথায় টুইডের ক্যাপ আর স্টিল ফ্রেমের চশমা। সে তার একটি আঙুল খুলছিল, এবং লাগাচ্ছিল।

দু'নম্বর পেগ ব্র্যাণ্ডি শেষ করার পর এই দেখে বেকারের তো চোখ চড়ক গাছ! নিজের মনেই যুক্তি খাড়া করলেন। নকল আঙুল, কিন্তু একদম আসলের মতো।

গ্লাস মুখে তুলে বেকার দেখতে পেলেন লোকটি প্রত্যেক আঙুলই খুলছে। তাহলে কি গোটা হাতটাই নকল!

বেকার গ্লাস রাখলেন, তারপর সেই লোকটিকে গিয়ে বললেন, আপনার হাতটা একটু অন্যরকম, তাই না?

সে লোকটি অবাক হয়ে বলল, 'অন্যরকম? কেন?'

নকল হাতে নকল আঙুল, আর কি।

লোকটি কথা বলতে বলতে বার এর মালিকের দিকে ঘুরলো। বাড়িওয়ালা তখন কাগজ রেখে কথা শুনছিল। নকল মানে—কি বলতে চান আপনি, বাড়িওয়ালা বলল।

বেকার কিছু বলার আগেই বাড়িওয়ালা তার বাঁ হাতের কব্জি খুলে টেবিলে রাখলো।

বেকার বোকা, হতভম্ব। মাথার ভেতর বাজনা সবটাই মিথ্যে। চোখের ভুল। কোনোরকমে মুখে হাসি টেনে বেকার বাইরে এলেন। স্নায়ুর ওপর খুব চাপ পড়ছে।

চারপাশে কুয়াশা, আরও ঘন। বড় জোর সিকি মাইল ছুটেই দম বেরনোর উপক্রম। মুখে ব্র্যাণ্ডির বিচ্ছিরি স্বাদ। কুয়াশা আর কনকনে বাতাস ভেঙে তিনি পৌঁছলেন একটি বাস গুমটিতে। মনের ভেতর একলা থাকার মন খারাপ গাঢ় হয়ে আছে। আরও নানান অশান্তি।

অনেকটা সময় কাটে। একটা ধূসর আতঙ্ক তাঁর সমস্ত জীবন ঘিরে রেখেছে। কুয়াশার ভয় কাটিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ালেন। সাড়ে নটা। এগারটার আগে বাড়ি যাবেন না। তখন মিরিয়ম বিছানায়। ও আট ঘন্টা ঘুমে বিশ্বাসী।

দীর্ঘ পদযাত্রায় মাথা পরিস্কার। সেই শুঁড়িখানার ভয়টাও এখন যুক্তি দিয়ে বোঝার চেষ্টা। নেহাৎই চোখের ভ্রম, কিন্তু কেন? এটা কি নেহাৎই আত্ম সম্মোহন? যা হোক ব্যাপারটা কেটে গেলেই ভালো। তারপর শুয়ে পড়লেন মিরিয়ামের পাশে।

দশ মিনিট কি তার একটু বেশিই হবে। হঠাৎ মনে হল মিরিয়ামের নাক ডাকছে না। উঠে আলো জ্বালালেন।

এক মুহূর্ত! বেকার দেখলেন তাঁর বউয়ের গলায় স্ক্রুয়ের প্যাঁচ। তারপর ড্রেসিং টেবিলের দিকে দেখলেন। তাঁর স্ত্রীর মুণ্ডু ওখানে, কোঁচকানো চুল ঠিক ঠিক জায়গা মতো।

বিছানা ছেড়ে উঠতে চাইলেন বেকার। তাঁর গলায় তখন হিস্টিরিয়ার গোঁ গোঁ। আধো হাসি আধা আর্তনাদের মধ্যেই কালো পরদা নেমে এলো তাঁর ওপর।

জড়ো করা পাউডার ফাউণ্ডেশান ক্রিমের কৌটো আর ছোট্ট তেলের পাত্রের ওপর অজ্ঞান হয়ে যেতে যেতে একপলকও ড্রেসিং টেবিলের দিকে দেখলেন না বেকার।

দি রেড কেন

ই. এফ. বোজম্যান

ওর নিষ্পাপ মুখে পরিশ্রমী ও স্বাধীন জীবনের সৌন্দর্য নিঃস্বার্থভাবে ছড়িয়ে আছে। অন্তত প্রথম দেখায় আমার তাই মনে হয়েছিল। কারখানাগুলোর কাছ থেকে নির্জন জঙ্গলের দিকে এগিয়ে যাওয়া রাস্তার উজ্জ্বল নিওন আলোর নিচে ওকে আমি প্রথম দেখি। কম ব্যস্ত শিল্প অঞ্চলও ধূ ধূ প্রান্তরকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে এই নির্জন গভীর জঙ্গলে।

সময়টা ডিসেম্বরের কুয়াশায় ঘেরা এক সন্ধ্যে। শত শত গাড়ি, স্কুটার, বাস ঝাঁকে ঝাঁকে বিভিন্ন কারখানা থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চলেছে শহরের দিকে। বহুদিন পর ব্যবসার কাজে এই জেলায় আমাকে ফিরে আসতে হয়েছে, এবং মনে মনে ঠিক করেছি, কারখানাগুলো বন্ধ হলেই আমার এক পুরোনো প্রিয় বান্ধবীর সঙ্গে আমি দেখা করতে যাব। তিরিশ বছর ওর সঙ্গে আমার দেখা

সাক্ষাৎ নেই। ওর বাড়িতে পৌঁছবার সবচেয়ে সহজ পথ জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে অসংখ্য হিজিবিজি মেঠো পথের একটি পথ ধরে চলা।

কারখানা থেকে বের হয়ে পাকা রাস্তা ধরে শ'খানেক গজ এগিয়ে গেলাম, তারপর ভাসা ভাসা মনে পড়া একটা মেঠো পথে মোড় নিলাম। গাছ ও ঝোপের ফাঁক দিয়ে বহুদূরের বাড়িগুলোর জানালার আলোর বিন্দুগুলো জোনাকির মতো ক্ষণিকের জন্যে দেখা দিয়েই মিলিয়ে যেতে লাগল। বেশ ভাল করেই জানি, এ ছাড়া বাকি পথটুকু আর কোনও আলোর সন্ধান পাওয়া গেল না। ওর বাড়ির পথটা চিনে যেতে খুব কষ্ট হল না, কারণ যেখানেই বুনো ঝোপঝাড় রাস্তায় উঠেছে মনে হয়েছে সেখানেই মেঠো পথটুকু অ্যালফল্টদিয়ে বাঁধিয়ে কৃত্রিমভাবে রক্ষা করা হয়েছে।

পাকা রাস্তা পেছনে ফেলে যখন এ পথটা ধরেছি তখন ভীষণ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, এ পথ শুধু আমি একাই বেছে নিইনি। ফিরে তাকিয়ে ঘনিয়ে ওঠা অন্ধকারে সেই কালজয়ী মুখের লোকটিকে দেখতে পেলাম।

'খুব ঠাণ্ডা পড়েছে,' বলে আমি একটু থমকে দাঁড়ালাম, ছায়া শরীরকে আমার পাশাপাশি আসতে সময় দিলাম।

'যা বলেছেন,' উত্তর এলো, এবং ছোটখাটো বলিষ্ঠ গড়নের জনৈকা মহিলা আমার পাশে এসে উপস্থিত হল, 'দেখবেন, আজকের রাতটা কিন্তু একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার হবে।'

'এই জঙ্গলটুকু আপনার সঙ্গে গেলে আপনার কোনও আপত্তি আছে? পথটা যা নির্জন চিন্তা করবেন না। আমার এসব অভ্যেস হয়ে গেছে।'

'যা দিনকাল পড়েছে তাতে শত সাবধান হয়েও নিস্তার নেই। কাগজে নিশ্চয়ই পড়েছেন, কিছু উটকো লোক এ অঞ্চলে দিনরাত ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

'এ পথে আমি একাই যাতায়াত করি—দিনে রাতে, সবসময়ে, কিন্তু এ পর্যন্ত কেউ আমাকে অসম্মান করার চেষ্টা করেনি—যদি করতো, তাহলে অবশ্য উপযুক্ত শিক্ষাই পেত। অবশ্য আমার হাতে সময়-সময় একটা লাঠি থাকে।'

অন্ধকার সত্ত্বেও ওর হাতের লাল রঙের ছড়িটা আমার নজরে পড়ল। বুঝলাম, দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করলে এই বস্তুটি আত্মরক্ষার জন্যে এক কার্যকরী অস্ত্র।

'নাঃ, সন্দেহ নেই যে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা আপনার আছে!'

'জানেন, আততায়ীরা কিছু করে ওঠার আগেই আমি ওদের চমকে দিই, আর সবচেয়ে অন্ধকার গলিঘুঁজিগুলো আমি এতো ভাল করে চিনি যে ভূত ছাড়া যে কেউই আসুক না কেন, আমি নিজেকে ঠিক রক্ষা করতে পারব।'

'ভূত!' আমি হাসিতে ফেটে পড়লাম, 'ভূতে আমি বিশ্বাস করি না, তবে সাধারণ মনুষ্যত্বের খাতিরে আসুন, এই পথটুকু আমরা একসঙ্গে যাই!'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝোপের আড়াল থেকে একটা মানুষের ছায়া আবির্ভূত হল, এক পলক তাকাল আমার সঙ্গিনীর দিকে, কিন্তু ওর সঙ্গে আমাকে দেখে দ্রুত পায়ে সামনের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে গেল।

'দেখলেন তো,' আমি বললাম, 'সৌভাগ্য বলতে হবে, আমি আপনার সঙ্গে ছিলাম।'

'সত্যিই আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত' ও বলল, 'কিন্তু আসলে ওই ভদ্রলোক আমার পাশে থাকেন। আমার বছরখানেক আগে থেকে উনি ওখানে আছেন। এই তো সেদিন ওর ঘাস ছাওয়া হল।'

'তার মানে?' আমি বললাম।

'পৃথিবীকে দেখেছি কম দিন তো হল না। সারাটা জীবন ধরে ভগবানে আর নিজের সঙ্গতিতে বিশ্বাস করতে শিখেছি। একথা আপনাকে বলতে পারি, প্রতি দশজন লোকের মধ্যে ন'জনই ভালো লোক—সে আপনি বিশ্বাস করুন আর নাই করুন।'

'আর দশ নম্বর লোকটি?'

'সে হয় সাধু—নয় তো ঘোরতম পাপী।'

'যদি সেই পাপীর সঙ্গে আপনার মোলাকাৎ হয়? তখন আপনি কী করবেন?'

'সেই পাপীকে রক্ষা করতেই যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাকে আমি সবসময় সেই কথাই বলি।'

বেশ কিছুক্ষণ আমরা নীরবে পথ চললাম। এমন সময় দেখি, সরু পিচের রাস্তাটা একটা ঝর্ণাকে ঘিরে এগিয়ে গেছে। এ যেন গ্রাম্য প্রাশান্তির এক অপরূপ দৃশ্য, অপরূপ করা রূপ, এবং স্যাঁৎস্যাঁতে কুয়াশা ঘেরা সন্ধে তাকে আরো তুঙ্গে তুলে ধরেছে। ঝর্ণার প্রায় অদৃশ্য কালো জলের ঘুম পাড়ানি রিমঝিম শব্দ

ভুলিয়ে দেয়, যে, কাছেই হাজারো জীবনের স্পন্দন ও প্রাণশক্তি নিয়ে রয়েছে এক চঞ্চল শহর।

ঝুলে পড়া গাছের শাখা ও চারাগাছের নিচ দিয়ে পথটা এখন এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছে। তাদের গা থেকে ক্ষণে ক্ষণে ঝরে পড়ছে সঞ্চিত বৃষ্টি ও কুয়াশার ফোঁটা। আমার সঙ্গিনী হঠাৎই যেন মৌন হয়ে পড়েছে, ফলে আশ্বস্ত হবার জন্যে ওর দিকে ঘুরে তাকালাম। দেখলাম, মুখটা অন্যদিকে ফেরানো, এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া খুবই সামান্য, শান্ত।

'আপনার একা লাগে না,' ওকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এই যে সকাল-সন্ধে, শীত-গ্রীষ্ম একা একা এতটা পথ আসেন?'

'একা? একা লাগবে কেন? এ জায়গাটায় আমার প্রচুর বন্ধুবান্ধব থাকে, আর দিনে-রাতে কখনও এক মিনিটের জন্যেও আমার নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় না। সারা জীবনে কখনও মনে হয়নি। শুধু একবার ভাবুন তো, শহরের ঠিক ওপাশেই হাজার-হাজার যুবক এক বিশাল পাকা রাস্তা তৈরি করছে; এবং দু-হাজার বছর আগে রোমের সৈন্যরা 'আকনিড ওয়ে' ধরে কুচকাওয়াজ করতে করতে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ের ওপরে শিবিরে ফেলবে বলে। আপনি হয়তো জায়গাটা চেনেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল করেই চিনি। ওই তো, কবরখানার ঠিক পাশেই—

'হ্যাঁ—'

মেঠো পথের এক চৌমাথায় এসে পৌঁছলাম আমরা। ও সেখানে হঠাৎ থেমে পড়ল।

আমি এবার বাঁ দিকে যাব। আপনি নিশ্চয়ই সোজা গিয়ে বড় রাস্তায় পড়বেন?'

'হ্যাঁ—আপনি কি করে জানলেন?'

আমার প্রশ্নকে আমল না দিয়ে ও বলল, 'এখন নিশ্চয়ই আপনার আর একা লাগবে না, অন্ধকারেও নিশ্চয়ই ভয় পাবেন না, কি বলেন? আপনার রাস্তা তো আর বেশি নেই।'

আমি অবাক হয়ে হেসে ফেললাম, বললাম, 'কিসের ভয় পাবো?'

'কে বলতে পারে। তার চেয়ে বলি কি—আমার লাঠিটা আপনি ধার নিন,

কেউ এলে আটকাতে পারবেন—অবশ্য ভূত ছাড়া।' এ কথা বলে ও চাপা স্বরে হাসলো।

'না। আপনার লাঠিটা আমি নিতে পারব না?'

কিন্তু ও নাছোড়বান্দা। বলল, 'পরের বার দেখা হলে না হয় ফেরৎ দিয়ে দেবেন। আর মনে রাখবেন, কখনও নিজেকে একা ভাববেন না, এক মুহূর্তের জন্যেও না। আপনাকে শুধু একটু অন্য কথা ভাবতে হবে, এই যা।' ও একটু ইতস্তত করল, যেন মনের ভেতরে বলতে চাওয়া কথাগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে, 'যেমন ধরুন, আজকের এই ঘটনা আপনি কখনও ভুলতে পারবেন না! এই যে সময়টুকু আমরা একসঙ্গে হেঁটে এলাম, একথা চিরকাল আপনার মনে থাকবে। কক্ষনো ভুলবেন না। কক্ষনো না! বলুন! এবং ও ছোট্ট করে হাসল।

আমি নতুন করে প্রতিবাদ জানাবার আগেই ও বাঁদিকের পথ ধরে এগিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল ঘন অন্ধকারে! 'শুভরাত্রি', আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম। কোন উত্তর পেলাম না। সুতরাং যে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি সেদিকেই মনযোগ দিলাম। ইতিমধ্যে অন্ধকার অনেক গাঢ় হয়েছে। চড়াইয়ের শেষ একশো গজ পথ হাতের লাঠি দিয়ে কাঁটাঝোপ সরিয়ে পার হতে পেরে খুশি হলাম। বড় রাস্তায় পড়লেই কয়েকটা লাইট-পোস্টের দেখা পাওয়া যাবে, হ্যাঁ, ওই তো! সামনের জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে আলো ছিটকে পড়েছে রাস্তায়—আমার মনে পড়ে গেল তিরিশ বছর আগের লণ্ঠনের আলোর কথা। পাথরে বাঁধানো একটা পথ খেয়ালিভাবে এগিয়ে গেছে আগোছালো ফুলের বাগানের মধ্যে দিয়ে—বসন্তে ও গ্রীষ্মে সেই ফুলের বাগানে রঙের আগুন খেলে যায়—সদর দরজার কাছে।

আর সদর দরজার ঠিক পেছনে, বসবার ঘরে, সাদা সুস্বাগতম ভাব নিয়ে জ্বলে থাকা তাপচুল্লীর খুব কাছে বসে থাকবে শক্ত সামর্থ ছোটখাটো সেই মহিলাটি, যার সঙ্গে আমি দেখা করতে চলেছি। হয়তো সে ঝুঁকে থাকবে নিজের প্রিয় সেলাইয়ের কাজের ওপর, এবং আমাকে দেখে নিশ্চয়ই চিনতে পারবে—কারণ একসময় আমি তার বাড়িতে ভাড়া ছিলাম—সে আমরা যতোই পালটে গিয়ে থাকি না কেন। তার চেহারা ও কণ্ঠস্বর মনে করতে চেষ্টা করলাম, ঠিক তিরিশ বছর আগে সে যেমন বলতো, 'অল্পেতে এতো চিন্তা কোরো না, খোকা,

এবং আমার মনে পড়ে গেল, এ পাড়া ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তার জন্যে কি উপহার আনবো। সে বলেছিল, তার পছন্দ একটু অন্য ধরনের, কারণ তার অসংখ্য পরিচিতজনদের অনেকেই তাকে ডাইনি খুড়ি বলত।

'সুন্দর দেখে একটা ঝাঁটা আনলে কেমন হয়?' আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, কারণ ঝাঁটা ডাইনি বুড়িদের এক নম্বর হাতিয়ার। আমার কথায় সে হেসে উঠেছিল, তারপর বলেছে, তার সবচেয়ে পছন্দ একটা হাতল ছাড়া লাল রঙের ছড়ি। এবং আমিও তাই এনে দিয়েছিলাম। সেটা নেওয়ার সময় তার কালজয়ী মুখে যে সুন্দর হাসি ফুটে উঠেছিল তা আমি কোন দিনও ভুলবো না···

কি বললাম যেন? কালজয়ী মুখ? আমার শরীরে শিহরণ খেলে গেল। সে কি ভয়ে, না নির্জনতার জন্যে?

শক্ত হাতে ছড়িটা চেপে ধরে সদর দরজায় ওটা দিয়ে আঘাত করলাম।

এক অচেনা মুখ দরজা খুলে দিল।

'কেউ আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম, তারপর মানুষটির মুখে ফুটে ওঠা অভিব্যক্তি দেখে ইতস্ততঃ করলাম, 'আমি··· বিশেষ করে ওকে দেখতেই এসেছি, তাড়াতাড়ি বলে চললাম, 'লণ্ডনের ও প্রান্ত থেকে···' আমার স্বর শুন্যতায় মিলিয়ে গেল।

'কেন আপনি শোনেন নি?' স্বাভাবিক গতানুতিক স্বরে সে বলল, 'বছরখানেকেরও বেশি হল উনি মারা গেছেন, তারপরই তো এ বাড়িটা আমরা কিনেছি।'

খোলা দরজা দিয়ে আলোর বন্যা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাঁধানো পথের ওপর। ফিরে যাবার জন্য ঘুরে রওনা হতেই হাতে ধরা ছড়িটা আমার নজরে পড়ল। ওটার রঙ লাল। আমি চমকে উঠলাম। তাহলে আমার সঙ্গে রাস্তায় দেখা সেই মহিলাই আমার বন্ধুর প্রেতাত্মা, আমি তাড়াতাড়ি করে আকাশের দিকে তাকিয়ে ভগবানকে উদ্দেশ্য করে বললাম।

'ঈশ্বর ওর আত্মাকে শান্তি দিন।'

ডাইনীর গল্প

চার্লস ল্যাম্ব

ছোটবেলা থেকেই আমি খুব দুর্বল স্বভাবের মেয়ে, আমার মন ছিল অত্যন্ত ভাবপ্রবণ। আমার বাবা মা, বিশেষ করে আমার মা, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। তারা খুব হাসিখুশি আনন্দ উচ্ছল, আমোদ-আহ্লাদ হই-চই পার্টি বন্ধুবান্ধবের বাড়ি যাতায়াত, এই সবই ছিল তাদের মনোমতো। কিন্তু আমি একেবারে অন্য ধরনের মেয়ে বলে বাবা মা আমাকে একদম পছন্দ করত না, এমন কি আমার দিকে মোটেও মন দিত না। ওরা উৎসবে আমোদপ্রমোদে মত্ত হলে আমি চলে যেতাম বাড়ির নির্জন নিস্তব্ধ কোনও জায়গায়। একা থাকতে আমার খুব ভাল লাগত। অথচ আমার মনে একটা ভয় বাসা বেঁধেছিল। বাড়িতে আমার একটা ছোট পড়ার ঘর ছিল, সেখানে থাকতে আমার খুব ভাল লাগত। এখানে বসে বসে আমি সব বই পড়তাম যদিও সেসব বই বোঝার বয়স ও ক্ষমতা আমার ছিল না। ঝড় বৃষ্টি হলে বা রোদ্দুরের তেজ থাকলে আমি যখন বাইরে যেতে

পারতাম না, কিংবা বাবা মা যখন কোথাও বেড়াতে যেত, আমি ওখানে ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতাম। আমার পিসীমার কোলেও আশ্রয় নিতাম। পিসীমা আমার শুকনো মুখ দেখে বলত, 'ওইসব যাচ্ছেতাই বই পড়ে পড়েই তোর এই দশা হয়েছে।'

কিন্তু ওই বইগুলো আমার খুব প্রিয় ছিল। অনেক টাকাপয়সা পেলে, এমন কি রানি হওয়ার সুযোগ পেলেও বই ছাড়তে পারতাম না। পিসীমা কিন্তু ওগুলো কিছুতেই পড়ত না, বলত, 'বুড়ো হয়েছি, পড়লে চোখে বড় কষ্ট হয়।' কিন্তু আমি বুঝতে পারতাম পিসীমা আসলে এসব এড়াতে চায়। কেননা ঘন্টার পর ঘন্টা ঠাকুরদেবতার বই পড়েও পিসীমার চোখের কিছু ক্ষতি হত না। পাছে আমার বই পড়তে বলি তাই এই অজুহাত।

পিসীমা আমার বাবার নিজের বোন। পিসীমা বাবার থেকে বয়সে বেশ বড়। বিয়ে করেনি পিসীমা, আমাকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে। আমি চিরকাল একা একা বাড়িতে থাকি। বাবা-মা দূরে দূরে থাকে, কাছাকাছি বলতে কেবল পিসীমা। তাই আমাদের সম্পর্ক খুব গভীর আর নিকট ছিল। পিসীমা বলত, 'পৃথিবীতে আমি খালি তোকেই ভালবাসি, আর কাউকে নয়।' সেটা সত্যি। আমার বাবা মার সঙ্গে পিসীমার সম্পর্ক যে খুব খারাপ ছিল তা নয়, কিন্তু পিসীমা ভাবত যে বোধ হয় বাড়িতে তার যথেষ্ট সম্মান নেই। আমি ছাড়া পিসীমাকে আর কেউ ভালবাসার ছিল না। পিসীমা তার সমস্ত ভালবাসা আমাকে উজাড় করে দিত, আমিও পিসীমাকে সেইরকমই ভালবাসতাম। বাবা-মাকে যে ভালবাসা দিতে পারিনি, পিসীমাকে সেই ভালবাসা দিয়েছিলাম।

কিন্তু পিসীমাকে আমার কেমন যেন ভয় করত। পিসীমা চিরদিনই একটু চুপচাপ, কথাবার্তা বেশি বলত না। আমাকে আদর করার সময় যেন পিসীমার অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেত। তাতে আমার কেমন যেন লাগত। চশমার ফাঁক দিয়ে পিসীমার চোখের অদ্ভুত চাহনিতেও আমি ভয় পেতাম। আমাকে জড়িয়ে ধরে পিসীমা কি সব বিড়বিড় করে বলত—এগুলো ধর্মের কথা হলেও আমার শুনতে মোটেই ভাল লাগত না, কেমন যেন রহস্যের ভাব জাগাত। আমার দুর্বল স্বভাব, ভীতু মন, কারুর মধ্যে অদ্ভুত কিছু দেখলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়ত। পিসীমাকে দেখলেও আমার সেই অনুভূতিই জাগত।

যে বইগুলো আমি পড়তাম, সেগুলোও ছিল অদ্ভুত ধরনের। বইগুলো ঠিকমতো বুঝতে না পারলেও কেমন যেন রহস্যরোমাঞ্চ ও ভয়ের ভাব জাগাত। আমি পড়তাম সেই ধর্মযাজকদের কথা যাদের ধর্মের নামে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল, ধর্মবোধ যাদের মধ্যে প্রবল উৎকটভাবে দেখা গিয়েছিল। গল্পের সঙ্গে ছবি থাকত অগ্নিশিখার, আমি তাতে হাত দিয়ে যেন আগুনে পোড়ার স্বাদ পেতে চেষ্টা করতাম, ভাবতাম দেখি আগুনে পুড়লে কেমন লাগে। তারপর গাছগাছড়া নিয়ে একটা বই ছিল, তাতে ছিল গাছপালার অনেক ছবি। একটা ইতিহাসের বই ছিল অদ্ভুত ধরনে, যেটা আমার খুব ভাল লাগত। তাতে ছিল চীনা দেবতার ছবি। ড্রাগনের ভয়ংকর চিত্র—এরা আমার কল্পনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করত। একটা ছিল বাইবেলের গল্প যাতে নোয়া-র বিরাট জাহাজ ও সব জীবজন্তুদের ভেতরে যাওয়ার ছবিটা আমার মনে গেঁথে আছে। যদি পৃথিবীতে আবার ভয়ংকর প্লাবন আসে তাহলে এরকম একটা বিরাট জাহাজ কিভাবে তৈরি করা যাবে আমি ভাবতাম। আরও ভেবে ভেবে ঠিক করেছিলাম ছোট্ট সুন্দর প্রাণীদের এর ভেতরে তুলতে হবে, খারাপ দেখতে জীবজন্তুদের এর মধ্যে কখনওই নেব না। খুব বোকা ছিলুম বলেই এসব হয়তো ভাবতাম—আসলে ভগবানের এই দৃষ্টিতে কোনও কিছুই অসুন্দর বা কুৎসিত নয়, সব সুন্দর, সকলেই ভীষণ ভাল। আমি তখন কমবয়সী ছোট মেয়ে, অত জ্ঞান আমার তখনও হয়নি।

ভূতপ্রেত বিশেষতঃ ডাইনীর গল্প আমার খুব প্রিয় ছিল। ডাইনীদের নিয়ে একটা বই আমার খুব ভাল লাগত। এতে ডাইনীদের অদ্ভুত সব গল্প ছিল, আমি ঠিক সেগুলো বুঝতে পারতাম না, আর সেইজন্যেই বোধহয় এরা আমাকে আরও বেশি আকর্ষণ করত। গল্প পড়ে আমি ডাইনীদের সম্বন্ধে একটা ধারণা করেছিলাম। তারা ছিল বুড়ি, তারা ভূতেদের বশে এনে লোকের ক্ষতি করত, গোরুবাছুর মারত, মাঠে ফসল নষ্ট করত। যে সব লোক তাদের ক্ষতি চাইত ডাইনীরা তাদের মূর্তি তৈরি করে আগুনে পোড়াত, গায়ে কাঁটা ফোটাত; যাদের মূর্তিতে এসব করা হত তারা সেখানে যত দূরেই থাক না কেন এইসব অসহ্য কষ্টযন্ত্রণা ভোগ করত। আমি এখন বুঝতে পারি এসব উদ্ভট অদ্ভুত গাঁজাখুরী গল্প, কিন্তু ছেলেবেলায় এসব পড়ে আমি ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতাম। আমি

এত নির্বোধ ছিলাম যে, বয়স্কা বৃদ্ধা দেখলেই আমার ভীষণ ভয় করত। হায় ভগবান, আমি তখন কি বোকা ছিলাম!

ডাইনীদের গল্প পড়ে পড়ে আমার মনে এমন ভীষণ ভয় ঢুকেছিল যে রাত্তির বেলায় ভয়ে প্রায়ই আমার ঘুম ভেঙে যেত। আমি স্বপ্নে দেখতাম যেন একটা ডাইনী আমার ঘরে লুকিয়ে আছে। আমি এখন বুঝতে পারি এসব বোকামী। আসলে ছোটবেলায় আমি ভীষণ নার্ভাস ছিলাম, আর আমাকে সত্যি কথা বুঝিয়ে দেওয়ার মতো কেউ ছিল না, শিখিয়ে দেওয়ারও কেউ ছিল না। অযত্নে অবহেলায় আমি আগাছার মতই বেড়ে উঠেছিলাম, বাবা-মা'র ভালবাসা আমি কখনও পাইনি। তাই এইসব আজে বাজে ভাবনা আমাকে গ্রাস করত।

একবার গভীর রাতে এইরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল, ভয়ে আঁতকে উঠলাম। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। পাশের ঘরটা পিসীমার। ভয়ে যেন জমে গিয়ে আমি আস্তে আস্তে পিসীমার ঘরে গেলাম—চমকে উঠলাম আতঙ্কে! সেই বুড়ি পিসী তখনও শোয়নি, অর্ধেক চোখ খুলে বসে আছে, নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে চশমা, মাথা ঝুঁকে আছে বইয়ের উপর। বিড়বিড় করে কি সব যেন বকছে—সেই অদ্ভুট মূর্তি ও পোশাক যেন ডাইনীদের মতো!

ও কি ডাইনী? ওই ম্লান অন্ধকারের মাঝখানে বসে বিড় বিড় করে কি বকছে—শয়তানের কাছে কারুর ক্ষতি করার জন্যে মন্ত্র পড়ছে নাকি? আমি ওই ডাইনীর কোলে শুয়ে ভয় কাটাতে যাচ্ছিলুম! ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে এলাম আমার বিছানায়। সারারাত কিছুতেই ঘুম এল না, ছটফট করলাম, আর মাঝে মাঝে দেখলাম ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন। ভয় অন্ধকার আর আতঙ্কে সারা রাত কেটে গেল। অবশেষে সকাল হল।

দিনের আলোয় আমার ভয় কিছুটা কমল বটে, কিন্তু সেই আতঙ্কের ছবিটা মনের মধ্যে গেঁথে রইল। বাবা-মা যখন পিসীমার সঙ্গে কথা বলল, আমার ভয় সবটাই প্রায় মিলিয়ে গেল। পিসীমাও আমাকে কোলে নিয়ে কত আদর করল—আনন্দে যেন আমার চোখ জলে ভরে এল।

কিন্তু আবার সেই রাত! সেই অন্ধকার নির্জনতা, ছায়াচ্ছন্ন ঘরে বসে অদ্ভুত ভঙ্গীতে বিড়বিড় করা—আমার পিসী কি সত্যি ডাইনী? পিসীমা আমাকে এত আদর করে ভালবাসে ভগবানের কাছে মঙ্গল প্রার্থনা করে। আবার এই ডাইনীই মন্ত্র পড়ে লোকের ক্ষতি করে, আমার ক্ষতি চায়। হায় ভগবান, একি অভিশাপ!

এই ভয়ঙ্কর মনের অবস্থায় আমার দিন কাটতে থাকে। কাউকে কিছু বলতে পারি না, ভয়ে আতঙ্কে মনটা কেমন যেন হয়ে যেতে থাকে। আমি কি তাহলে শেষ হয়ে যাব!

এমন সময় একদিন দূর সম্পর্কের এক মাসী এসে আমাকে তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। আমার নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা, বাড়ির অদ্ভুত পরিবেশ, আমার শরীর ও মনের দূরবস্থা দেখে আমার বাবা-মাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে আমাকে নিয়ে এল তাদের বাড়িতে। আমার অবশ্য যাওয়ার একেবারেই ইচ্ছে ছিল না। সেই পড়ার ঘর, অন্ধকারে একা একা ঘোরা, আমার পিসীমা যে একই সঙ্গে ভয়ের ও আনন্দের—এসব ছেড়ে আমি যেতে চাইনি।

তবু আমাকে আসতে হল কিন্তু ফল হল আশ্চর্যরকম।

আমাদের বাড়ি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে আমি এলুম। নির্জন ঘর, অন্ধকার পথ, নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বদলে পেলাম অন্য কিছু অনেক কিছু—আলোকিত উজ্জ্বল বাড়ি, সবাই হাসিখুশি, আনন্দে পরিপূর্ণ, আমার সমবয়সী ছেলেমেয়েরা হাসছে খেলছে। ওরা ভূতের বা ডাইনীর গল্প আমাকে পড়তে দিত না, তার বদলে পড়তাম সুন্দর সুন্দর বই যার থেকে আমি আনন্দ শিক্ষা দুই-ই পেতাম। এই আনন্দময় উজ্জ্বল পরিবেশে আমার মনের ভয় কেটে গেল একেবারে, আমি প্রাণ খুলে হাসতে শিখলাম, খুশিমনে খেলতে শিখলাম। এখন মিথ্যে অযৌক্তিক ভূত প্রেত ডাইনীদের কথা শুনলে ভয় তো করতই না, বরং হাসি পেত, মজা লাগত।

মাস তিন চার এই সুখ-সুন্দর আনন্দময় পরিবেশে কাটিয়ে আমি বাড়ি ফিরলাম। জীবনের মানে তখন আমার পালটে গেছে। পিসীমাকে আমি আরও ভালবাসতে লাগলাম—মনে হল পিসীমা কত সুন্দর কত স্নেহপ্রবণ কত পবিত্র। আমি লোকের সঙ্গে মিশতে শিখলাম, মানুষজনকে এবার সত্যিই ভাল লাগত। বাবা-মা আমার পরিবর্তন দেখে খুব খুশি হল। আমিও বাবা-মাকে নতুন করে ভালবাসতে শিখলাম। আমি স্কুলে ভর্তি হলাম। লেখাপড়া খেলাধুলো নিয়ে আনন্দেই দিন কাটতে লাগল।

এখন বুঝতে পারি ভূত প্রেত ডাইনীদের আজেবাজে গল্প পড়ে নিজের কি ক্ষতিই না করেছিলাম। মিথ্যে ভয় আর আতঙ্ক মানুষকে কত নীচই না নামিয়ে দেয়। তাই আমার অনুরোধ কেউ কোনওদিন আজেবাজে ভূত-প্রেতের বই পড়ো না।

ভূতুড়ে বাড়ির গল্প

লর্ড হ্যালিফ্যাক্স

(প্রখ্যাত ভৌতিক কাহিনীকার লর্ড হ্যালিফ্যাক্স-কে লেখা ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুলাই তারিখের একটি চিঠির প্রতিলিপি; চিঠির লেখক চার্লস জি. এস. এস্কোয়ার)।

প্রিয় লর্ড হ্যালিফ্যাক্স,

আপনার অনুরোধ মতো একটুও রঙ না চড়িয়ে আমার সাদামাঠা গল্পটা জানাচ্ছি। বাড়িটার নাম, '...নিবাস'। বিশ্বাস করে আপনাকে নামটা বললাম, কিন্তু অনুরোধ রইল, যদি কখনও এ ঘটনা আপনি কোনও পত্রিকায় প্রকাশ করেন তাহলে আমার এবং বাড়িটার নাম, দুই'ই দয়া করে গোপন রাখবেন। ভুতুড়ে ঘটনা সংক্রান্ত বিভিন্ন গল্পের মধ্যে সেগুলোই আমি দাম দিই যেগুলো কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর শোনা। এছাড়া অন্যান্য সব কাহিনী প্রচারের পথে এতো ডালপালা গজিয়ে ফেলে যে তার মধ্যে কতটুকু যে সত্যি তার নিছকই অনুমানের ব্যাপার হয়ে পড়ে।

আমার অভিজ্ঞতা ভয়ঙ্কর তাতে সন্দেহ নেই আর সেই জন্যেই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, কোনও রকম ভৌতিক কাণ্ডকারখানার মধ্যে আর কোনওদিন মাথা গলাচ্ছি না।

যে বাড়িটার কথা বলছি, সেটা একটা পুরনো জীর্ণ প্রাসাদ। বাড়িটা তৈরি হয় ১৭৪০ সাল নাগাদ, এবং ওই বাড়িতে বসে নেলসন লেডি হ্যামিল্টনকে অনেক চিঠিই লিখেছেন, যার শুরু হয়েছে 'প্রিয়...নিবাস' বলে। আমি ও আমার নিমন্ত্রণকর্তা, দুজনে তখন সমুদ্রে নৌকোবিলাসে ব্যস্ত ছিলাম। ফিরে এসে দেখি তাঁর আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি টই টম্বুর—ওরা সব কয়েকদিন থাকবে বলে এসেছে। ড্রেসিংরুমে আমার শোবার ব্যবস্থা করা হল। এর আগে একবার এসে শুনেছিলাম বাড়িটা নাকিভূতুড়ে এবং বাড়ির সব মেয়েরাই এক অদ্ভুত ছায়ামূর্তিকে ভেসে বেড়াতে দেখেছে। ওদের বিশ্বাস সে নাকি ওদের ঠাকুরমার মা। বাড়ির চাকরবাকরেরা এসব দেখে ভয় পেয়ে বেশিদিন থাকতে চায় না। সবই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে নৌকা বেয়ে এসে খুবই ক্লান্ত লাগছিল এবং আমি শুতে যাওয়ার আগে ভূতের ব্যাপারে কোনও রকম আলোচনা হয়নি।

মাঝরাতে ঘুমটা ভেঙে গেল, স্পষ্ট টের পেলাম এক অপার্থিব ছায়া আমাকে ঘিরে রেখেছে। হঠাৎ আমার বিছানার ঠিক পাশেই আবির্ভূত হল এক বৃদ্ধ মানুষ কিংবা এক মহিলার ছায়ামূর্তি, তার ভয়ংকর মুখ আমারই ওপর ঝুঁকে রয়েছে। আমি যে সম্পূর্ণ জেগেই ছিলাম তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি যেন মুহূর্তে পঙ্গু হয়ে গেছি, হাত-পা একচুল নড়াবার ক্ষমতা নেই। শুধু অপলক চেয়ে রয়েছি সেই কালান্তক পিশাচের দিকে, আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছি, এই আনুমানিক অবস্থা থেকে একটি বার যদি রেহাই পাই তাহলে জীবনে আর কোনওদিন প্রেতচক্র, প্ল্যানচেট, এসবে ভুলেও নাক গলাবো না। কারণ চোখের সামনে এই বাস্তব ছায়ামূর্তির আবির্ভাব এতই ভয়ঙ্কর যে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

পরদিন সকালে নিমন্ত্রণকর্তাকে একান্তে ডেকে সমস্ত ঘটনা বললাম। উনি বললেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, কারণ তিনি ছাড়া এ বাড়ির প্রত্যেকেই কোনও না কোনও সময় এধরনের ছায়ামূর্তিকে দেখেছে।

এরপর বিশ বছর কেটে গেছে এবং ঘটনাটা আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম।

ওই বাড়িতে অনেকবার যাতায়াত করেছি কিন্তু আর কিছুই দেখিনি। তারপর একদিন আবার আমন্ত্রিত হয়ে সেখানে গেলাম। বাড়িতে আমার নিমন্ত্রণকর্তা একাই ছিলেন। দুজনে কিছুক্ষণ বিলিয়ার্ড খেলে রাত করেই শুতে গেলাম। সেদিন দাঁতের ব্যথায় আমি বেশ কষ্ট পাচ্ছিলাম, সুতরাং বিছানায় শুয়েও একফোঁটা ঘুম এল না। প্রথম বারে এ বাড়িতে এসে যে ঘরে ছিলাম, এ ঘরটা বাড়ির সে অংশে নয়, অন্য দিকে।

সময়টা ছিল গরমের শুরু; কিন্তু কেন জানি না হঠাৎই আমার কেমন শীত শীত করতে লাগল। আমার পা থেকে শুরু করে সারা দেহ যেন সত্যি বরফ হয়ে যাচ্ছে। শত জামাকাপড় গায়ে চাপানো সত্ত্বেও ঠাণ্ডা ভাবটা দ্রুত বেড়ে চললো; মনে হল, এই বুঝি আমার হৃৎপিণ্ডটা থেমে যাবে, এবং এরই নাম বোধহয় মৃত্যু।

ঠিক তখনই একটা অপার্থিব কণ্ঠস্বর, যা কানে শোনা যায় না। কিন্তু অনুভব করা যায়, যেন আমাকে লক্ষ্য করে বার বার বলতে লাগল 'আবার আমি এসেছি। আবার আমি এসেছি—কুড়ি বছর পরে।' হুবহু বিশ বছর আগেকার অনুভূতি আমার মনে জেগে উঠলো, সাহস যুগিয়ে মনে মনে বলে উঠলাম, 'এবার আমাকে পুরো ব্যাপারটা ভাল করে দেখতে হবে জানতে হবে, আগের বার আমি ভুল দেখেছিলাম, নাকি সত্যিই ভূত বলে কিছুর অস্তিত্ব আছে। আমি যে জেগে রয়েছি তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কারণ স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমার দাঁতের অসহ্য যন্ত্রণা।'

অপার্থিব সেই অশরীরী নিঃশব্দ স্বরে আবার আমাকে বলল, 'ফিরে তাকাও। ফিরে তাকাও।'

এ ধরনের ঘটনায় সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তাই হলো। ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এমন এক অপরিসীম আতঙ্ক আমাকে গ্রাস করল। ফিরে তাকিয়ে দেখি, ঘরের এক কোণে অদ্ভুত এক আলোর স্তম্ভ সর্পিল গতিতে ধুলোর ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘুরে চলেছে। সে আলোর রঙ সাদা। আমি অপলকে দেখতে লাগলাম, ওটা ধীরে ধীরে আমার কাছে এগিয়ে আসছে।

'আবার আমি এসেছি'। অশরীরী স্বর বার বার বলতে লাগলো। বিছানার পাশে রাখা দেশলাইয়ের দিকে হাত বাড়ালাম। ওটা যতই আমার কাছে এগিয়ে আসছে ততই ক্ষিপ্রতায় মানুষের আকার নিতে শুরু করেছে। খুব কাছে এসে,

আমার চোখের ঠিক সামনে, ওটা বিশ বছর আগেকার ছায়ামূর্তির রূপ নিলো। না, কোনও রকম ভুল আমি দেখিনি। সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে চিৎকার করে উঠলাম, 'কে তুমি?' কোনও উত্তর না পেয়ে তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে একটা মোমবাতি ধরালাম।

পরদিন সকালে নিমন্ত্রণ কর্তাকে আমার ভাগ্যে কি ঘটেছে জানালাম। উনি কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, এবং আমি আসার আগে সপ্তাহ তিনেকের মধ্যে এ বাড়িতে ঘটে যাওয়া রহস্যময় ঘটনার বর্ণনা দিলেন।

প্রথম ঘটনার সময় উনি ড্রেসিংরুমে ছিলেন, এমন সময় একজন চাকর এসে খবর দেয় তাঁর বন্ধু দেখা করতে এসেছেন। উনি তাড়াহুড়ো করে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতে শুরু করেন, এবং প্রথম সারি শেষ করে দ্বিতীয় সারির ধাপে পা দেওয়ার জন্য বাঁক নিতেই উনি লক্ষ্য করেন একটা লোক ছুটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছে। আমার বন্ধু তৎক্ষণাৎ তাল সামলাতে না পেরে মুখোমুখি ধাক্কা এড়াতে দুটো হাত সামনে বাড়িয়ে দেন এবং ছুটে আসা লোকটিকে সরাসরি ভেদ করে পার হয়ে যান।

দ্বিতীয় ঘটনার দিন সন্ধ্যায় নৌবাহিনীর এক অফিসার তার বাড়িতে বিলিয়ার্ড খেলতে আসেন এবং সঙ্গে নিজের পোষা কুকুরটিকে নিয়ে আসেন। কুকুরটা টেবিলের নিচে শুয়ে ছিল। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে ঘরের কোণে অদৃশ্য কিছুর দিকে তাকিয়ে তারস্বরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করে। চিৎকার করতে করতে ওটার মুখ থেকে ফেনা ঝরতে লাগল, গায়ের প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। তাঁরা কুকুরটাকে শান্ত করতে বৃথাই চেষ্টা করতে লাগল, ঘরের সেই কোণ লক্ষ্য করে আবার পিছিয়ে আসতে লাগলো। আমার বন্ধু, কিংবা সেই নৌ-অফিসার কিন্তু দেখতে পাননি। শেষে কুকুরটা ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ঘরের কোণটায় গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল, কিন্তু সেই সঙ্গেই তীক্ষ্ণ আর্তনাদে কেঁউ কেঁউ করে ডেকে উঠলো। কেউ যেন ওটাকে ভয়ঙ্কর শক্তিতে ঝাঁকুনি দিয়ে ফেলে দিল মেঝেতে। পরক্ষণেই কুকুরটা মারা যায়। ওঁরা দুজনের কেউই কিন্তু এ মৃত্যুর কোনও সমাধান করতে পারেন নি।

ইতি—

চালর্স জি. এস.।

ভূতের সন্ধানে আমরা

এইচ. আর. ওয়েকফিল্ড

'নমস্কার' বন্ধুগণ, আমি টনি ওয়েলডন বলছি। ভূত ধরার জন্য যে আমরা লাগাতার অভিযান চালাচ্ছি, এটা তারই একটি অভিযান।

আমরা আশা করছি, এবারের অভিযান আগের দুটির চেয়ে অনেক বেশি আকর্ষণীয়। আমাদের আয়োজনের কোনও ত্রুটি রাখিনি, এখন ভূতেরা কৃপা করে দেখা দিলেই হয়। আজ রাতে আমার সঙ্গী প্যারিসের অধ্যাপক মিগনোঁ। প্রেততত্ত্বের গবেষক হিসেবে তাঁর বেশ নাম ডাক আছে। তাঁর সঙ্গী হতে পেরে আমি নিজেকে ভীষণ গর্বিত বোধ করছি।

আমরা বর্তমানে মাঝারি সাইজের চারতলা এক বাড়িতে রয়েছি। লণ্ডনের কাছাকাছি রাজ জর্জের আমলের একটি পুরনো বাড়ি। এই বাড়িটা বেছে নিয়েছি কারণ অবশ্য একটাই। বাড়িটার ইতিহাস সত্যিই ভয়ঙ্কর। তৈরি হওয়ার পর থেকে বাস করে তিরিশজন এই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে সে খবর আমরা কিছুদিন হল পেয়েছি। কানাঘুষোয় শুনেছি এই সংখ্যটা নাকি তিরিশেরও অনেক বেশি।

এই বাড়িতে যে সব আত্মহত্যাগুলো হয়েছিল সেগুলো রীতিমতো বিচিত্র ভাবে ঘটেছিল। কেউ কেউ সিলিংয়ে দড়ি বেঁধে ঝুলে পড়েছে, কেউ নিজেই গুলি করেছে নিজের মাথায়, কেউ বা আবার লাফিয়ে পড়েছে বাড়ির ছাদ থেকে, তাছাড়া কম করে ন'জন এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়ে আত্মহত্যা করেছে। মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে তারা সোজা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাড়িটার প্রায় একশো গজ দূরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে চলে গেছে একটা নদীতে। শেষ যে লোকটি এখানে আত্মহত্যা করেছিল তাকে নাকি ভোরবেলায় উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটন্ত অবস্থায় দেখা গেছে। আর এমন ভাবে চেঁচিয়ে কাউকে ডাকছিল, যেন তার সঙ্গে আরও অনেকে দৌড়াচ্ছে। বাড়িওয়ালা বলেছে, কোনও লোকই নাকি এ বাড়িতে থাকতে রাজী নয়, আর দালালরাও এ বাড়ি বিক্রির চেষ্টায় ব্যর্থ হয়েছে। বাড়িওয়ালা নিজেও এ বাড়িতে থাকতে চান না। কারণটা অবশ্য খুবই স্পষ্ট। যদিও তিনি কারণ খুলে বলতে চান না। তাহলে নাকি আমাদের মনে একপেশে চিন্তা এসে যাবে। তিনি বলেছেন অধ্যাপকের গবেষণার সিদ্ধান্ত যদি মনের মতো না হয় তাহলে বাড়িটাকে একেবারে ভেঙে ফেলে নতুন করে তৈরি করবেন। তাতে অন্তত 'ভূতুড়ে বাড়ি' বদনামটা ঘুচবে।

যাক, পরিচয়ের পালা এতক্ষণে শেষ হল। আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হয়েছেন যে, এই ভয়ঙ্কর ভূতুড়ে বাড়িটির আগাপাসতলা পরীক্ষা করে একবার দেখা দরকার, তাতে ফলাফল অর্থাৎ, ভূত-টুত, কিছু পাওয়া যাবে কিনা সে-কথা আমি হলফ করে কিছু বলতে পারি না। কারণ দেখা গেছে, এ রকম পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের সময় হঠাৎ করে বিনা নোটিশে ছুটি নিয়ে নেওয়ার অদ্ভুত অভ্যেস ভূতগুলো বেশ ভালই রপ্ত করেছে।

আচ্ছা, এবারে তাহলে কাজের কথায় আসি, আমি এখন বসে আছি বাড়িটার একতলার একটা বড়-সড় হলঘরে, পালিশ করা একটা কাঠের টেবিল আমার সামনে রয়েছে। ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র সাদা পলিথিনের চাদরে ঢাকা, যাতে ওগুলোর কোনওরকম ক্ষতি না হয়। ঘরের দেওয়াল পালিশ করা ওক কাঠের তৈরি। বাড়ির সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে, শুধু আমার ঘরে একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। আমি এখানে মাইক নিয়ে বসে আছি। আপনাদের ধারাবিবরণী শোনাবার জন্যে। আর অধ্যাপক মিগনোঁ সেই ফাঁকে

বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছেন যদি কিছু পাওয়া যায় তার খোঁজে। উনি মাইক পছন্দ করেন না, কারণ তাতে ওঁর কাজের নাকি অসুবিধে হয়, আর তাছাড়া এ ধরনের তদন্তের সময় আপন মনে প্রলাপ বকার এক বদ-অভ্যাস ওঁর মধ্যে আছে—ওঁর কাছেই অবশ্য সে কথা শুনেছি। খবর দেবার মতো কোনও কিছুর খোঁজ পেলেই অধ্যাপক আমার কাছে নিজেই চলে আসবেন। আশা করি বুঝতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না আপনাদের। আচ্ছা, এই নিন, অধ্যাপক এসে গেছেন, অভিযানে রওনা হওয়ার আগে উনি আপনাদের সঙ্গে দু'চার কথা বলতে চান। আসুন প্রফেসর মিগনোঁ—'

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আমি প্রফেসর মিগনোঁ বলছি। এই বাড়িটার রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে অশুভ শক্তি লুকিয়ে রয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এর প্রভাব বেশ ভালই টের পেয়েছি এতক্ষণে। এই বাড়ির ভয়ঙ্কর অতীতের অশুভ শক্তি ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। এ বাড়ি না ভেঙে ফেললে কোনও নিস্তার নেই। আমার বন্ধু, মিস্টার ওয়েলডন, হয়তো সে-রকম কিছু অনুভব করছেন না, কারণ তিনি আমার মতো প্রেততত্ত্ব বিশারদ নন। এবারে সত্যিই কি ভূত-প্রেতের দেখা আমরা পাব? নাঃ, সে-কথা হলফ করে আমি আপনাদের কিছু বলতে পারি না। তবে অশুভ শক্তি যে জমাট বেঁধে রয়েছে এই প্রাচীন বাড়ির আনাচে কানাচে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। হয়তো কোনও বিপদেও আমাদের পড়তে হতে পারে। একটু পরেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে হয়তো। এবার টর্চ নিয়ে রওনা হব। তারপর আবার ফিরে আসব আপনাদের কাছে। জানাব আমার অনুসন্ধানের সব ফলাফল। তবে মনে রাখবেন, ভূত-প্রেতকে মনপ্রাণ দিয়ে আমরা ডাকতে পারি, কিন্তু তারা যে সব সময় সে ডাকে সাড়া দেবে, তার কোনও ঠিক নেই। দেখা যাক কি হয়?

'বন্ধুগণ, এতক্ষণ বিশেষজ্ঞের মতামত আপনারা শুনলেন। সত্যি কথা বলতে কি, এই বিশাল ঘরে একা একা বসে এই কথাগুলো শুনে আমার বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। প্রফেসরের এ-কথা ঠিক নয় যে প্রেততত্ত্ব বিশারদ না হওয়ার ফলে আমি কিছুই টের পাচ্ছি না। কারণ জায়গাটা আমার মোটেই সুবিধের মনে হচ্ছে না। আমার মনে হচ্ছে, বাড়িটার ভিতরে যেন আমাদের ঠিক মেনে নিতে পারছে না, আমরা চলে গেলেই বোধহয় খুশি হয়। সদর দরজা পার হওয়ার

সময়েই আমি বেশ টের পেয়েছি। না, আমি ঠাট্টা করছি না, আর আপনাদেরও মিথ্যে আসা দিচ্ছি না। যা সত্যি তাই বললাম।

চারিদিক চুপচাপ। আমি এখন আমার চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিচ্ছি কোথায় কি আছে। আলোটা নানা রকম সব অদ্ভুত ছায়া ফেলছে। দরজার পাশেই দেওয়ালে একটা কিম্ভুতকিমাকার ছায়া পড়েছে। না, ওটা বোধ হয় বুককেসের ছায়া। ঘরে ঢুকেই সাদা চাদর তুলে উঁকি মেরে দেখেছিলাম। ভাবতে অবাক লাগছে যে আপনারা আমার কথা এতক্ষণ শুনছেন। আপনাদের দু-চারজনকে সঙ্গী হিসেবে পেলে আমার মন্দ হত না। বাড়িওলা বলেছে, এ বাড়িতে নাকি ইঁদুর আর ছুঁচোর ভয়ঙ্কর উপদ্রব। হ্যাঁ, এখন ওদের চলা ফেরার শব্দ বেশ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে বিশাল চেহারার ইঁদুরই হবে, আপনারাও আশা করি ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।

আপাতত আপনাদের আর বিশেষ কিছু বলার নেই। শুধু এটুকু জানিয়ে রাখি, ঘরে একটা বাদুড়ও উড়ে বেড়াচ্ছে, না কোনও পাখি নয়, বাদুড়ই হবে। ওটাকে ঠিক দেখিনি, তবে এইমাত্র যখন উড়ে গেল তখন তার ছায়াটা কেবলমাত্র দেখেছি। যাবার সময় আমার মুখের কাছে ডানা ঝাপটে গেল। বাদুড়ের চরিত্র সম্পর্কে বিশেষ কোনও জ্ঞান আমার নেই, তবে আমার ধারণা ছিল শীতকালে ওরা চুপচাপ ঘুমিয়েই থাকে। হতে পারে এ বেচারা হয়তো অনিদ্রায় ভুগছে। ওই, আবার আসছে—এবার আমার মাথায় ঝাপটা মেরে গেল।

ওপরতলায় অধ্যাপকের চলাফেরার শব্দ এখন বেশ স্পষ্ট, শোনা যাচ্ছে। আপনারাও চেষ্টা করলে হয়তো শুনতে পাবেন। নিন, ভাল করে একবার কান পাতুন।

আরে, কি হল! শুনতে পাচ্ছেন ওঁনার চলার শব্দ? অধ্যাপক নিশ্চয়ই কোনও চেয়ার-টেয়ার উল্টে ফেলেছেন—ভারী চেয়ার, শব্দ শুনে যা মনে হচ্ছে! কে জানে, কিছুর খোঁজ পেলেন কি না। ওঃ, বাদুড়টা আবার জ্বালাতে আসছে মনে হয় আমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে। প্রত্যেকবার উড়ে যাওয়ার পথে আমার মুখ ছুঁয়ে যাচ্ছে ডানা দিয়ে। কি বিশ্রী গন্ধ বাবা, বাদুড়গুলো বোধ হয় কোন স্নান-টান করে না। এটার গা থেকে তো পচা গন্ধ বেরোচ্ছে।

ওপরতলায় অধ্যাপক কি উল্টে ফেলেছেন কে জানে, সিলিংয়ে একটা ছোট্ট

দাগ দেখতে পাচ্ছি। হয়তো কোনও ফুলদানী উল্টেগিয়ে থাকবে। আরে! শুনতে পেলেন শব্দটা? নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন। মনে হয়, ওক কাঠের তক্তা খোলার কোনও শব্দ। ওঃ, ঠিক যেন বাজ পড়ার মতো! আমার পায়ের ওপর দিয়ে কি যেন ছুটে গেল, হয়তো কোনও ইঁদুর। ইঁদুরকে আবার আমি ভীষণ ঘেন্না করি।

সিলিংয়ের দাগটা ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে। ভাবছি উঠে গিয়ে দরজার কাছ থেকে অধ্যাপককে ডেকে দেখব, উনি আছেন কিনা। আশা করি আপনারা আমার ডাক ও তাঁর উত্তর, দুই-ই স্পষ্ট শুনতে পাবেন, কি বলেন?

প্রফেসর!—প্রফেসর!—

নাঃ, কোনও উত্তর নেই, ভদ্রলোক অবশ্য কানে একটু কম শোনেন। নিশ্চয়ই ভূতের খোঁজে তোফা আছেন। এ সময় বার বার ডেকে বাগড়া দিলে উনি বিরক্ত হতে পারেন। দু-চার মিনিট একটু অপেক্ষা করে দেখি কি হয়। বন্ধুগণ, আপনাদের নিশ্চয়ই খুব নিরস একঘেয়ে লাগছে আমার এই ধারা-বিবরণী। কিন্তু যা দেখব, শুনব তাই তো আমাকে—ওই তো, প্রফেসরের কাশির শব্দ শুনলাম। আপনারা শুনতে পাননি? বেশ ঘড়ঘড়ে গলায় দু-দুবার কাশির শব্দ? শব্দটা মনে হয় এলো—আচ্ছা প্রফেসর কি চুপি চুপি নীচে নেমে এসেছেন তারপর লুকিয়ে লুকিয়ে আমার সঙ্গে মজা করছেন। কারণ, সত্যি বলছি, বন্ধুগণ, জায়গাটা আমার যেন কেমন লাগছে। হাজার টাকা দিলেও এ বাড়িতে কোনও দিন থাকছি না—সরে যা, হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার! বাদুড়টা—হুঃ! কি বিশ্রী দুর্গন্ধ, বাবাঃ—

এবারে ভাল করে শুনুন—ইঁদুরগুলোর শব্দ শুনতে পাচ্ছেন? ওঃ, এখান থেকে কোনওরকমে এখন বেরোতে পারলে বাঁচি। এখন বেশ বুঝতে পারছি, অতগুলো লোক কেন এ বাড়িতে আত্মহত্যা করেছে। গোটা জীবনে শান্তি না পেয়ে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সবশেষে শান্তি পেয়েছে।

এই হতচ্ছাড়া বাড়িটা মোটেই আর সুবিধের ঠেকছে না। আগে যে দুটো বাড়িতে অভিযান চালিয়েছিলাম, সেখানে এ রকম কোনও মনে হয়নি, অথচ এখানে—অধ্যাপকের হল কী? কাশির শব্দটা ওঁরই ছিল তো? কিন্তু তাহলে—ওঃ, সর্ সর্, ঘেয়ো জানোয়ার কোথাকার! এই বাদুড়টাই দেখছি আমাকে শেষ করবে! আমাকে মারবে বলে বোধহয় ঠিক করেছে।

আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে পেরে বেশ ভাল লাগছে, বন্ধুগণ, আপনারা যদি পাল্টা উত্তর দিতে পারতেন তাহলে আমার আরোও ভাল লাগত। শুধু নিজের স্বর শুনতে কেমন যেন বিচ্ছিরি লাগছে। একা একা এভাবে বসে একটানা কথা বললে নানা রকম উদ্ভট সব চিন্তা মাথায় এসে ভিড় করে। কখনোও ব্যাপারটা খেয়াল করে দেখেছেন? মনে হয় কেউ কথার উত্তর দিচ্ছে।

ওই তো!—না, শব্দটা আপনাদের শুনতে পাওয়ার কথা নয়, কারণ ওটা হয়েছে আমার মাথায়, মনের ভেতরে, কল্পনায়। অদ্ভুত, না! হ্যাঁ, ওটা আমার হাসির শব্দ। আপানাদের নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত লাগছে, বন্ধুগণ, কিন্তু আমার একটুও লাগছে না। এ পর্যন্ত ভূতের কোনও পাত্তা নেই, অবশ্য ইতিমধ্যে প্রফেসর যদি না দু-একটা ধরে থাকেন—

ওই যে এবারে নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন! ওঃ, কাঠের কি বীভৎস শব্দ!—যাক্ তবু তো কিছু সুনতে পেলেন আপনারা! হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রফেসর! প্রফেসর! হুঁঃ, জব্বর প্রতিধ্বনি হচ্ছে—

এবার বন্ধুগণ, কিছুক্ষণ আমি চুপচাপ থাকব। নিশ্চয়ই আপনারা এতে কিছু মনে করবেন না। দেখা যাক, কোন শব্দ আমরা শুনতে পাই কিনা—শুনতে পেয়েছেন? কিসের শব্দ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? বাড়িটা যেন একটু কেঁপে উঠল, জানালাগুলো খটখট করে উঠলো। নাঃ, আমি বরং কথাই বলতে থাকি! জানিনা, এ রকম পরিবেশ কতক্ষণ সহ্য করা যায়। এ তো যে কোনও মানুষকেই কাৎ করে দেবে দেখছি—আরে। দাগটা অনেক বড় হয়ে গেছে আগের চেয়ে—হ্যাঁ, সিলিংয়ের দাগটা। এক্ষুণি হয়তো চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা পড়বে। দেখে মনে হচ্ছে রঙিন কোনও তরল। অধ্যাপকের কিছু হয়নি তো? না, মানে, হতে পারে উনি হয়তো কোনও আলমারির ভেতর নিজেকে বন্ধ করে রেখেছেন, খোঁজ করছেন—আসলে বাড়ির আসবাবপত্রগুলো তেমন সুবিধের নয়—

এবার হলফ করে বলতে পারি ওই ছায়াটা অনেকটা সরে গেছে। অবশ্য হতে পারে, আলোটা আমি সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখেছি। সত্যি, ছায়ার খেলা বড় বিচিত্র। এটা দেখে মনে হচ্ছে একটা লোক দু'হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে। বেশ মজায় আছি, তাই না? আমার এক মাসি গ্যাস বার্ণার খুলে

আত্মহত্যা করেছিল, আসলে—জানি না, হঠাৎ এ কথা কেন আপনাদের বললাম। এ তো এখানকার নাটকের বাইরে—

প্রফেসর! প্রফেসর! কোথায় গেল বেতো ফরাসী বুড়োটা? বাড়িওয়ালাকে তো আমি সোজা বলব এ বাড়ি ভেঙে ফেলতে। তখন তোমরা কোথায় যাবে! একটু পরে ওপরে গিয়ে বরং দেখে আসব অধ্যাপকের কি হল। হ্যাঁ, যে মাসির কথা আপনাদের বলছিলাম—

বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, এই একইভাবে বসে অপেক্ষা করার ব্যাপারটা ভীষণ কাহিল করে দেয়। আপনাদের খুব একঘেয়ে লাগছে বন্ধুগণ। তাহলে রেডিও বন্ধ করে দিন, নয় অন্য কোন প্রোগ্রাম শুনুন। আমি হলেও তাই করতাম—

দেখছেন, একটু আগে আপনাদের কি বলেছিলাম। সিলিং থেকে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে পড়তে শুরু করেছে।

ওঃ ভগবান!

প্রফেসর! প্রফেসর! প্রফেসর! সিঁড়ি বেয়ে ওঠা যাক! কোন্‌দিকের ঘরটা? ডানদিক বা বাঁদিক? ডান, বাঁ, ডান, বাঁ—বাঁদিকের ঘরেই রয়েছে। ভেতরে যাওয়া যাক—

শুভ সন্ধ্যা। প্রফেসরকে নিয়ে কি করেছ তোমরা? জানি, উনি মারা গেছেন—দেখছ না, আমার হাতে ওঁর রক্ত? কি করেছ তোমরা ওঁকে নিয়ে? সরে যাও, সরে দাঁড়াও বলছি। কি করেছ দেখি? কি বলছ—আমাকে গান গাইতে হবে? ট্রা—লা—লা

রেডিও বন্ধ করে দে বোকার দল।

সত্যি, কি অদ্ভুত—হা-হা-হা-হা! আমার হাসি শুনতে পাচ্ছেন বন্ধুগণ—বন্ধ করে দে রেডিও!

ওখানে কে শুয়ে আছে! ওটা প্রফেসর হতেই পারে না—তাঁর তো এমন লাল দাড়ি ছিল না! এ কি! তোমরা এমন ভিড় করছ কেন? সরে দাঁড়াও, সরে যাও বলছি।

বল, কি করতে হবে আমাকে! কি? নদীতে যেতে হবে? হা—হা এক্ষুণি? তোমরাও সঙ্গে আসবে? বাঃ, বেশ। চল তাহলে! নদীতেই যাওয়া যাক! নদী! সোজা নদী!

শুনলেন তো আমার ধারাবিবরনী। কেমন লাগলো?

ভয়ার্ত সেই মৃতের মুখ

ও.ডনেল

ভূত নিয়ে সেদিন স্যার রোল্যান্ড সেলাভলের সঙ্গে কয়েক বছর আগে তার যে ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল সেই কথাই তিনি সেদিন আমাদের বলছিলেন।

প্যাডিংটন থেকে পেনজ্যান্স যাওয়ার পথে তার ট্রেনটা হঠাৎ থেমে গেল। ট্রেন চালক ঘোষণা করলেন ট্রেন আর যাবে না। সামনে ব্রিজ ভেঙে গেছে। ফলে নিরুপায় হয়ে কাছাকাছি একটা হোটেলে ঘর নিতে হল।

এক তলায় পেছন দিকের ঘর। ঘরের মধ্যে গুমোট গন্ধ। ঘরের মাঝখানে মেঝেতে তার ব্যাগটা রাখা রয়েছে। আর ঘরের একেবারে দেয়াল জুড়ে এক মস্ত আলমারি। আর ঘরের একদিকে আছে গ্যাসের উনুন। আগুন জ্বেলে শীতের রাতে স্যার রোল্যাণ্ড আগুন পোয়াচ্ছেন। পথের ধকলে ক্লান্ত দেহ। রোল্যাণ্ড আগুন পোয়াতে পোয়াতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম এসে গেল। বিছানায় শুয়ে পড়লো। ঘরে হঠাৎ হাসির শব্দে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় বসে তিনি আলমারির

দরজায় এক রহস্যময় নীল আলো দেখনে পান। তিনি যতই দরজার দিকে এগুতে থাকেন ততই আস্তে আস্তে যেন দরজাটা খুলে যায়, আর ধীরে ধীরে সেই অদৃশ্য রহস্যময় বস্তুটি দরজার ভিতর থেকে ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে।

একটা নিগ্রো মানুষের কাটা মুণ্ডু ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে আসছে।

আর সেই কাটা মুণ্ডুর দুটো চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। এবার দরজাটি আরও খুলে গেল। একি! মুণ্ডুটি তো কাটা নয়। একটা গোটা নিগ্রোই যেন এগিয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

তার হাতে একটা ধারালো ছুরিও রয়েছে। ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে খাটের দিকেই এগিয়ে আসছে। যতই নিকটে আসছে ভীত সন্ত্রস্ত স্যার রোল্যান্ড ততই যেন তাকে ভাল করে নিরিক্ষণ করছে। এবার আরও নিকটে এগিয়ে আসছে। যেন প্রায় তার বিছানার পাশেই এসে পড়েছে। একেবারে খাটের ধারে গায়ের উপরে আসা মাত্রই স্যার রোল্যাণ্ড ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বেরিয়ে পড়া মাত্রই দেখে সেই নিগ্রো ছায়ামূর্তি আর নেই। দ্রুত পায়ে সাহেব বাইরে চলে গেল। রোল্যাণ্ড এবার বাইরে শীতে জ্ঞান ফিরে পেয়ে ভয়ে ভয়ে আবার ঘরে ফিরে এল। ভয়ে, লজ্জায় সে ঘরে ফিরে দেখে সেই ছায়া মূর্তিটা কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। এরপর বিছানায় শুয়ে এসব সাত সতেরো ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছেন তা তিনি টের পাননি। অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে রোল্যাণ্ড সকালে জেগে ওঠেন।

এধারে খবর পান রেললাইন সারানর কাজ চলছে। এখনও শেষ হয়নি। নিরুপায় হয়ে সাহেব একটা গোটা দিন শুয়ে বসে কাটিয়ে দেন। ধীরে ধীরে রাতও এগিয়ে আসে। আরও একরাত তাকে এখানেই কাটাতে হয়। কারণ রেল লাইন চালু হতে আরও কিছু সময় লাগবে।

আগের রাতের মতো এ রাতেও তিনি সেই ফায়ার প্লেসের ধারে বসে আগুন পোহান। তারপর ঘুম পেলে বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু মাঝ রাতে ঘুম ভেঙে যায়। দেখেন তার পাশে শুয়ে আছে এক মৃত মানুষ। তার হিমশীতল দেহের স্পর্শে তিনি হঠাৎ জেগে ওঠেন। বিছানায় উঠে বসে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামতে যান। কিন্তু নামতে কিছুতেই পারেন না। এধারে তার মুখে কোনও

কথা সরছে না। তার দেহে যেন বিছানা থেকে নামার কোনও ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। চেষ্টা করেও টেনে নিজ দেহকে বিভৎস এই মৃতদেহের পাশ থেকে সরাতে পারেন না। আর সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে পান সেই দেরাজের উন্মুখ দরজা দিয়ে রহস্যে ঘেরা সেই নীল মৃদু আলো বেরিয়ে আসছে। আর সেই আগের রাতের মতো সেই দেরাজের ভিতর থেকে বিবৎস নিগ্রো মানুষটি বেরিয়ে আসছে। হাতে তার সেই পরিচিতি ধারালো ছুরি। চোখে তার হিংসা দ্বেষপূর্ণ কুটিল ব্যঙ্গের হাসি। তবে তার চোখ স্যার রোল্যাণ্ডের দিকে নিবন্ধ নয়। তার চোখ নিবন্ধ রোল্যাণ্ডের পাশে শায়িত সেই মৃত দেহের দিকে। আর নিগ্রো মানুষটি এগিয়ে এসে যেই তার ছুরি দিয়ে আঘাত করতে যাবে স্যার রোল্যাণ্ডের ঘোরটা কেটে যায়। মিলিয়ে যায় সেই নিগ্রো মানুষ আর তার রাতের সঙ্গী। সাহেব দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবে এবার আর ঘরে না ফিরে কফি কর্ণারে বসে বসে ভাবতে লাগল ব্যাপারটা কি?

এরপরে স্যার রোল্যাণ্ড হোটেলের মালিককে সব ঘটনা খুলে বলল। আর তাকে বকাবকি করতে লাগল। এই রকম ভূতুড়ে ঘরে অত টাকার বিনিময়ে তাকে দেওয়ার জন্য। হোটেলওয়ালাও তার ভুলের জন্য দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইল। আর এইরকম ভূতুড়ে ঘটনার পুনরাবৃত্তির কথাও সে তার সঙ্গে স্বীকার করল।

আর বলল যে, প্রায় একটা বছর আগে এই হোটেলটা ছিল কোনও এক বিপত্নীক ভদ্রলোক মিঃ স্টিভেন্সের ব্যক্তিগত আবাস। ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ থেকে ধনরত্ন নিয়ে এসে ভাগ্য ফিরিয়ে ছিল এই ভদ্রলোক। এই বাড়িতে এই নিঃসঙ্গ মৃতদার ভদ্রলোকের একমাত্র সঙ্গী ছিল এই নিগ্রো চাকর। টম নামে এই নিগ্রো যাকে সে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। মিঃ স্টিভেন্স তার ধনরত্ন বোকামি করে বাড়িতেই রেখেছিলেন। ফলে লোভের বসে টম নামের সেই চাকরটি একদিন স্টিভেন্সকে হত্যা করে ধনরত্ন নিয়ে পালিয়ে যায়। পুলিশ অনেক খোঁজাখুজি করেও তার কোনও খোঁজ পায় নি।

সব শুনে স্যার রোল্যাণ্ড বলেন যে, এই দেরাজটা একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক্। তাই করা হল।

দেরাজটা গিয়ে দেখা গেল যে তার পেছন দিকে একটা স্প্রিং আছে, আর আছে একটা গোপন কক্ষ। আর এই কক্ষের ভিতরে পড়ে আছে একটা পুরো কঙ্কাল। কঙ্কালের পাশেই পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত ছুরি। পুরনো রক্তের দাগ আজো যেন সেই ছুরির গায়ে লেগে আছে। আর তার পাশে জমা হয়ে আছে ডাঁই হয়ে অনেক স্বর্ণমুদ্রা যা ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তখন চালু ছিল। আপাততঃ এত দিন পরে দেখে যা মনে হয় তাতে নিগ্রো চাকরটি এই দেরাজের ভিতরের ধনরত্নের সন্ধান পেয়ে প্রলুব্ধ হয়। আর লোভের বসে দেরাজের গোপন কক্ষে ঢুকে পড়ে। কিন্তু বের হওয়ার কোনও পথ খুঁজে পায় না। আটকে পড়ে দিনের পর দিন না খেয়ে না দেয়ে অনাহারে সে মারা যায়। আর সেই থেকেই মৃতের আত্মার গোপন কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসার ব্যর্থ চেষ্টা চলেছে অবিরত। প্রতি রাতে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সেই রহস্য আজ এতদিন পর খুঁজে পাওয়া গেল।

দি কোকোনাট ট্রায়াল

ডন. নলটন

বারে বসে সে-সব কথাই হয়, যে কথা কেউ তার বউ অথবা অফিসের বসকে বলতে পারে না। লোয়ার ব্রডওয়ে এমনি এক বার। দেয়ালের গায়ে পুরনো স্টিকার, প্ল্যাকার্ড। পানীয় দেওয়া মানুষটির দিকে তাকালে মনে হবে এক সপ্তাহ দাড়ি কামায়নি। বারে বসে ছিলাম কেন? আমার বাঁ পাশে একজন তরুণই বা ছিল কেন? দুজনেই ছিলাম চুপচাপ, টুকটুক করে খাওয়া চালাচ্ছিলাম।

আমার বাঁ দিকে ছেলেটি, ছেলেই বলব তাকে, কিন্তু আমার থেকে বড়সড়— গায়ে পড়েই যেন জানাল, ও নৌবাহিনীতে ছিল, কদিন হল ছুটিতে এসেছে। ছেলেটি দেখতে বেশ, হঠাৎই বলতে শুরু করে। আমার মনে হল, এসব কিছু তার মনে অনেকদিন ধরেই জমে আছে। এসব কথা ও তার জাহাজী বন্ধুদের বলতে সাহস পায়নি। বাড়িতেও না। এই নয় যে তারা ওর গল্প বিশ্বাস করবে না, গল্পটা তাদের বোকা প্রমাণ করবে।

ছেলেটি শুরু করল, আমরা একটা ড্রেস্ট্রয়ারে ছিলাম। একটা দ্বীপের এক মাইলের মধ্যে নোঙর করলাম। যুদ্ধের মহড়া দেওয়া একটা ট্যাঙ্কারকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট দিনে পাওয়ার কথা। পাইনি। রেডিও মারফত সব কথাবার্তা হল। জানা গেল পরদিন ট্যাঙ্কারকে দেখতে পাওয়া যাবে।

দ্বীপে একটা আগ্নেয়গিরি আছে। খুব বড় নয়। অনেকটা, যেমন জাপানি সিনেমায় দেখা যায়। তার মাথা থেকে সামান্য ধোঁয়া আসছে। সমুদ্রের পাড়ে, দ্বীপের সীমানায় কিছু সমতল জমি আছে। তার ওপর একসারি নারকেল গাছ। এর আগে আমি নারকেল কেন, তালগাছও দেখিনি। যাই হোক বিল স্কট আর আমি অনুমতি নিয়ে একটা ডিঙি চেপে নারকেল গাছগুলোর দিকে চললাম।

পাড়ে তোলার বদলে ডিঙি নোঙর করলাম। কারণ স্রোত সম্বন্ধে আমাদের কোনও ধারণাই নেই। তারপর গাছগুলোর দিকে তাকালাম। এটা যদিও আমার কাছে নতুন নয়, তবুও বলি গাছ দেখে ধাক্কাই লাগল। কোনও ডালপালা ছাড়া বিশাল কাণ্ড উঠে গেছে। একদম মাথায় বড়সড় পাতা আর এক ঝাঁক ফল।

মাটিতে একটা নারকেল পড়েছিল। আমি কুড়িয়ে নিলাম। বিল ভাবল পাথর ছুঁড়ে ও আরও একটা পাড়তে পারে। ও পাথর খুঁজছে, এর মধ্যেই জন কুড়ি লোক আমাদের ঘিরে ফেলল। কারোর হাতে বন্দুক, কারও বর্শা আর ছুরি—সব আমাদের দিকে তাক করা।

ছেলেটি একটু থামল। পানীয়তে চুমুক দিয়ে আবার শুরু করল, 'এ দ্বীপে মানুষ থাকতে পারে কখনও ভাবনাতেও আসেনি।'

'কিরকম চেহারা ওদের?' জিগ্যেস করি।

একটু ভেবে ও বলে, 'মেলানো মেশানো ছিল—কেউ চেহারায় নিগ্রো, কেউ পলিনেশীয়, কয়েকজন মালয়যী, জাপানী। সাদা চামড়ারও কয়েকজন।'

খুব দশাসই চেহারা কারোর নয়। গায়ে তেমন বলার মতো জামাকাপড় নেই। ওরা নিজের ভাষায় কথা বলছিল। কিছু না বুঝলেও একটা ব্যাপার বুঝেছে ওরা আমাদের বিচারের জন্যে দ্বীপের ভেতরে নিয়ে যেতে চায়।

বড়সড় গাছের ফাঁক দিয়ে কিছুটা যাওয়ার পর একটু পরিস্কার মতো জায়গায় এলাম। আগ্নেয়গিরি আর সমুদ্রের মধ্যে যে একখানি জায়গা আছে, ভাবতেই পারিনি। এইখানেই একটা কিছু, যাকে ঠিক বাড়ি বলা যায় না, ছাদ আছে

দেয়াল নেই। একটা গাড়ি বারান্দা আছে। জায়গাটার পেছনে একজন মহিলাকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। সব চাইতে অবাক হয়েছি গাড়ি বারান্দার ওপর একটি লোককে বসতে দেখে।

লোকটি সাদা চামড়ার, যদিও রং এখন কিছু মলিন, বয়েসে বৃদ্ধা। মাথায় চুল বরফ-সাদা। খুব বলশালী ছিল এক সময়। এখন চেহারা কিছু শিথিল। চিবুকের ভাঁজ, ভুরু দেখে মনে হয় দেখতে শুনতেও বেশ ভালোই ছিল।

চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল বুড়োমানুষ। বাঁদরের মতই কিচিমিচির করছিল আশেপাশের যারা, আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল, তাদের কথার জবাব দিল নিজের ভাষায়। আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'তোমরা চুরি আর বেআইনী ভাবে ঢুকে পড়ার জন্যে অভিযুক্ত। এটা খুবই অপরাধ। এজন্যে তোমাদের বিচার হবে। আমি বিচারক। আর আমার লোকজন আর তোমাদের মধ্যে দোভাষীও হব আমি।'

উনি চলতে আরম্ভ করলেন। পেছন পেছন আমরাও। বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গায়, বিশ্বাস কর আর নাই কর, একটা বড়ো চেয়ার। ডান দিকে এর মুখোমুখি দুটো বেঞ্চি। বাঁ দিকে দুটো নিচু চেয়ার—বড় চেয়ারের মুখোমুখি।

বিচারক উঁচু চেয়ারে বসল। আমরা নিচু দুটোয়। ওদেশীয় বারোজন দুজন দুজন হিসেবে বেঞ্চিতে। আমরা বোকার মত বলছিলাম, কেন এই দ্বীপে এসেছি। আর দ্বীপের অধিবাসীরা কেন বিশ্বাস করবে আমরা শুধু নারকেল গাছ দেখতেই এসেছি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'বিচার শুরু হওয়ার আগে বিচারপতি কি তোমাদের কিছু বলেছিল?

'নিশ্চয়ই।' ঢাউস চেয়ারে বসে সে বলল, 'সাধারণ আইন অনুযায়ী তোমাদের বিচার হবে। তোমাদের পক্ষে উকিলও থাকবে। আমি দুপক্ষের উকিলকেই বিচার শুরু হবার আগে তোমাদের বক্তব্য অনুবাদ করে শোনাব। তারপর তারা তাদের আবেদন নিবেদন জানানোর পর আমি জুরীদের রায় দেবার নির্দেশ দেব।'

বিচার শুরু হল। সরকারী উকিল খুবই আক্রমণাত্মক ঢঙে বক্তব্য শুরু করল। দেখলাম ক'জন জুরি কথা শুনে মাথা নাড়ছে। বিচারক আমাদের দিকে ফিরল।

তোমাদের সুবিধের জন্যে বলি, সরকার পক্ষের বক্তব্য সংক্ষেপে হল যে—এ দ্বীপে বেআইনী প্রবেশ বারণ। আর চুরি হচ্ছে একটা বড় অপরাধ। সরকার পক্ষ তোমাদের দুজনকেই অভিযুক্ত করছে। তোমাদের একজনের হাতে নারকেল ছিল। আর একজন পাথর ছোড়ার জন্যে তৈরি ছিল। সরকার পক্ষ চাইছে তোমাদের মৃত্যুদণ্ড হোক। পুড়িয়ে মারা হয় এখানে। আইন না জানা—কোন অজুহাতই নয়।'

'হায় ভগবান!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। 'তোমরা ভয় পাওনি?'

'নিশ্চয়ই।' কিন্তু এবার উঠে দাঁড়াল আমাদের উকিল। যার স্বরে ছিল বিশ্বাস আর শক্তি। আমার বিশ্বাস ছিল এবার একটা কিছু হবেই।

এবার সব শুনে-টুনে বিচারক আমাদের দিকে ঘুরে বলল, 'তোমাদের উকিল দারুণ কথা বলেছে। সে বেআইনি ভাবে ঢুকে পড়া, নারকেল চুরির চেষ্টা—সবাই মেনে নিয়েছে।' কিন্তু একটা কথা সে বলেছে, তোমরা ভেবেছ এ দ্বীপ বসতিহীন—যে দ্বীপ কারুর দখলে বা মালিকানাধীন নয়, সেখানে বে-আইনি ঢুকে পড়া কি ভাবে হতে পারে। আইন না জানার ব্যাপারে সে বলেছে, যে দ্বীপে লোকজন নেই, সেখানে আইনই বা কিভাবে থাকে? সবশেষে সে বলেছে, যে জাহাজ থেকে তোমরা এসেছ, সেটা আমেরিকার যুদ্ধ জাহাজ—এখন আমি জুরিদের ধরব।'

'এরপর সে জুরিদের কি বলল তা আমার জানা নেই, আমাদের অনুবাদ করেও সে আর কিছু বলেনি। বিচারক বসে পড়ল। জুরিরা তাল ঝোপের পেছনে গিয়ে কথা বলল। মিনিট দশেক বাদে বেঞ্চিতে এসে তারা বসে পড়ল।'

এরপর আমার মনে হ'ল জুরিরা এসে বিচারকদের সঙ্গে রায় নিয়ে আলোচনা করল। বিচারক আমাদের রায় শোনাল, অবশ্যই অনুবাদ করে, তোমরা নির্দোষ। আমি তোমাদের অভিনন্দিত করি।

এরপর আমরা আমাদের নৌকোয় ফিরে গেলাম। ভাগ্যিস নোঙর করা হয়েছিল। কারণ স্রোত বদলে গেছে। এখন তীর থেকে ওটা প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে। সাঁতরে যেতে হবে।

বিল স্কট বিচারককে জিগ্যেস করল, 'তুমি কে? এই দ্বীপে কীভাবে এলে?'

বিচারকের রেখাঙ্কিত মুখ রাগী হয়ে উঠল। বলল, 'কেন এবং কীভাবে আমি এই দ্বীপে এসেছি, তা কখনও কোন জীবিত মানুষকে বলা যাবে না।'

তারপর হঠাৎ তার মুখ নরম হ'ল। বলল, ঠিক আছে, আমি তোমাদের একটা সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি তোমরা জান এটা একটা আগ্নেয়গিরি-দ্বীপ।'

সবাই যে যার পথে ফিরে গেল। আমরা সাঁতরে ডিঙিতে উঠলাম। পরদিন সকালে ট্যাঙ্কার পাওয়া গেল। আমরা তেল-টেল ভরে নিলাম। তারপর নিজেদের রাস্তায় চলা। কিন্তু তুমি কি জানো ওই লোকটি কে?

'কোন্ লোকটি?' আমি জিগ্যেস করি।

'কেন বিচারক।' শেষ কথা তিনি বলেছিলেন, 'এটা একটা আগ্নেয়গিরি-দ্বীপ।'

'তিনি কে?'

নিঃসন্দেহে আগ্নেয় গিরির মুখ।

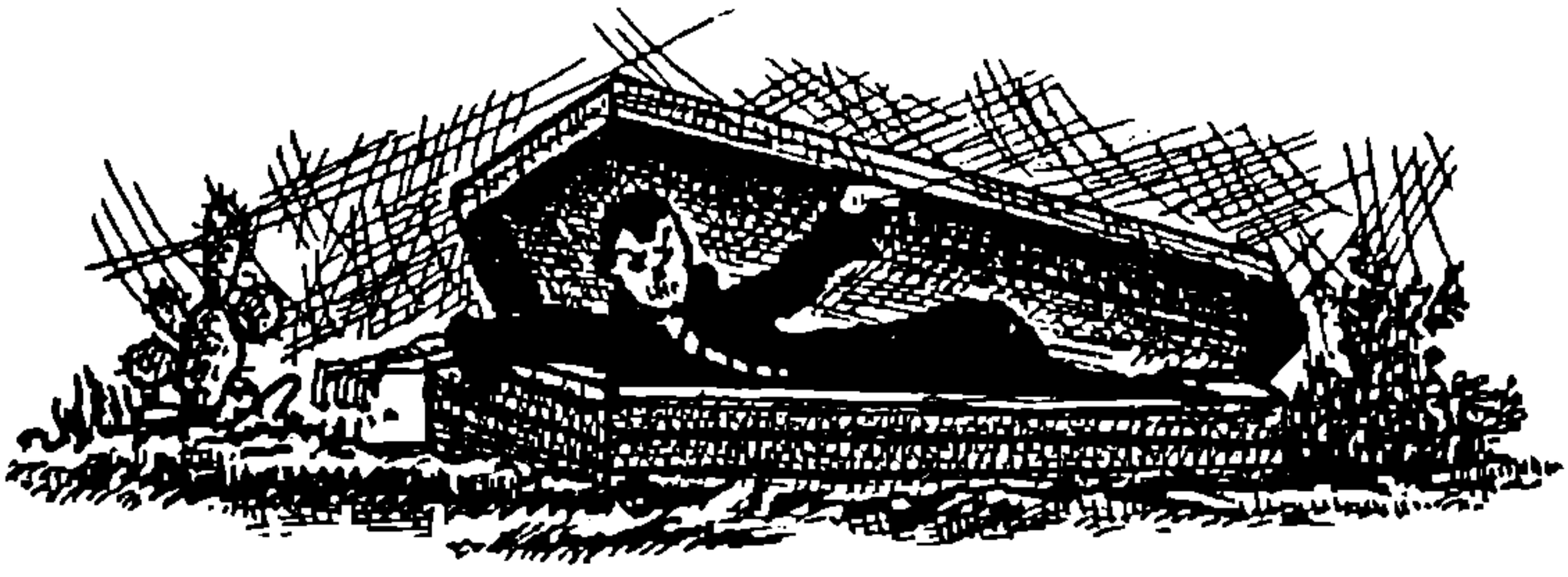

দি পেগ ডল

রোজমারি টিম্‌পারলে

সবকিছুই শুরু হয়েছিল একেবারে সাধারণ ভাবেই। প্রতিদিনের মত সেদিনও অ্যালান কাজ থেকে বাড়ি ফিরছিল। সবেমাত্র সে বাড়ি ভাঙার ঠিকাদারের কাজ শেষ করেছে।

'দেখ, কাজের জায়গায় আজ কি পেয়েছি', সে তার স্ত্রীকে বলল।

তার স্ত্রী জিনিসটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি ওটা?'

'বহুদিনে পুরনো একটি পুতুল।'

এত পুরনো যে জিনিসটাকে পুতুল বলে চিনতেই বড় কষ্ট হচ্ছিল। পুতুলটির মাথা আর কাঁধ অমসৃণ, দেহটি ক্রমশঃ সরু হয়ে গেছে, রঙের সামান্য একটু ছোপও আর লেগে নেই।

'এটি খুব কম করেও একশো বছর আগের। ক্ল্যাভার হল যে বাড়িটা আমরা এইমাত্র ভাঙলাম ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেটি একটি অনাথ আশ্রম ছিল। পুতুলটি হয়তো সেই আশ্রমের কোনও শিশুর ছিল।'

'কি চমৎকার'! জোয়ান ছোট্ট পুতুলটিকে হাতের ওপর তুলে নিল আর দেখতে লাগল সেটিকে। 'আচ্ছা, এটির কি কোনও মূল্য আছে?'

'আমার তো সে রকম মনে হয় না। আমি ভেবেছিলাম অ্যালমা হয়তো পুতুলটিকে পছন্দ করতে পারে।'

জোয়ান হাসল। কেননা তাদের সাত বছরের মেয়ে অ্যালমা পুতুল মোটেই ভালবাসে না। পুতুলের ব্যাপারে নিতান্তই অনাসক্ত সে। অবস্থাপন্ন আত্মীয়স্বজন আর বন্ধু-বান্ধবেরা বিভিন্ন সময় তাকে কত সুন্দর সুন্দর পুতুল দিয়েছিল। কিন্তু অ্যালমা সেগুলো একবার ছুঁয়েও দেখেনি—সেগুলি পুতুলের আলমারিতে অবহেলিত হয়ে দিনের পর দিন পড়ে রয়েছে।

অ্যালমা ঘরে ঢুকল। ছোট্ট মেয়ে। এক মাথা কালো চুল। ঠিক ভারতীয়দের মতো সুন্দর দু'টি চোখ, মণি দু'টি বাদামী রঙের। মায়ের হাতের পুতুলটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে সে,—'ওটা কি?'

খুকুমণি, এটি আদ্যিকালের একটি পুতুল। তোমার বাবা বাড়ি ভাঙার সময় এটি কুড়িয়ে পেয়েছে। তোমার কি এটি ভালো লেগেছে?'

অ্যালমা পুতুলটিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখল, এটি যেন অদ্ভুত একটা প্রাণী। পুতুলটির খসখসে মাথা আর কাঁধের ওপর সে তার নরম হাত বুলিয়ে আদর করল। বলল, 'হ্যাঁ মা, এটি আমার খুব ভালো লেগেছে। পুতুল সোনাকে সঙ্গে নিয়ে আমি কি শুতে পারি?'

'নিশ্চয়-ই খুকুমণি।'—জোয়ান সন্তুষ্ট হয়ে উত্তর দেয়। মেয়ে পুতুল ভালোবাসে না, এজন্যে তার মা মাঝে উদ্বিগ্ন হত। তার মনে পড়ত নিজের ছোটবেলার কথা। পুতুলদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল তার ছোটবেলার সুখের সংসার

অ্যালমা পুতুলটিকে নিয়ে চলে গেল। অ্যালন জোয়ান হাসাহাসি করতে লাগল। ঝলমলে রঙীন কত সুন্দর পুতুল তার ভালো লাগেনি, আর কি আশ্চর্য! বিবর্ণ এই হতচ্ছাড়া পুতুলটি নিয়ে শুতে গেল। বাস্তবিক শিশুর মন বোঝাই ভার। সে আবার পুতুলটির নাম দিয়েছে রোজালিণ্ড!

কিন্তু দিন সাতেক পরেই বাবা-মার আনন্দ মিলিয়ে গেল। মেয়েটি যেখানেই যেত রোজালিণ্ডকে সঙ্গে নিত সে। দিনের বেলায় অ্যালমা থাকত শান্ত,

নির্বিকার। কিন্তু সন্ধে থেকেই স্নায়ুবিক দুর্বলতায় ভুগত, রাতে ঘুমের মাঝে চেঁচিয়ে উঠত। অ্যালমার এই মানসিক পরিবর্তনের সঙ্গে পুতুলটির একটা যোগসূত্র রয়েছে বলে জোয়ানের মনে হল। অ্যালনাকে সে বলে, 'দেখ, অ্যালমা যেভাবে পুতুলটিকে আঁকড়ে রেখেছে, শুতে যাওয়ার সময় সেটিকে সঙ্গে নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করে—আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগে না।'

'আজে বাজে চিন্তা করছ কেন? প্রতিটি শিশুই কোনও না কোন সময় পুতুল নিয়ে শুতে ভালবাসে।'—অ্যালান বলে।

'খেলায় ভালুক কিংবা সুন্দর একটি পুতুল নিয়ে শোয়া বিচিত্র নয়, কিন্তু তা বলে বিশ্রী ওই পুতুলটা নিয়ে—অ্যালা সত্যিই আমায় বড় ভাবিয়ে তুলেছে।'—জোয়ান বলল।

রাতে তাদের এ ধরনের কথাবার্তার মাঝে আর্তনাদ করে ওঠে অ্যালমা। জোয়ান শোওয়ার ঘরের দিকে দ্রুত ছুটে গেল। ঘুমের ঘোরে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে ওঠে, 'আমি তো দুষ্টুমি করিনি। আর আমায় মেরো না।' জোয়ান তাকে জাগালো। মেয়ের মাথায় আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল, 'ঠিক আছে সোনামণি।' শান্ত হল অ্যালমা।

অ্যালান এসে দাঁড়াল জোয়ানের ঠিক পিছনে। জোয়ান ফিসফিস করে অ্যালনকে বলল, 'এবার খুকুর কাছ থেকে পুতুলটা সরিয়ে নিই, কি বলো? অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে চাদরটা সরিয়ে জোয়ান দেখল অ্যালমা পুতুলটাকে আঁকড়ে ধরে আছে। পুতুলটি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে সে।

অ্যালমা কেঁদে ওঠে। চীৎকার করে বলল, যদি তোমরা ওকে রাখতে দাও, তাহলে আমি সব করতে পারি—আমি এক সপ্তাহ খাবনা। আমি প্রতিজ্ঞা করছি।'

'আহা! পুতুলটা কেড়ে নিওনা জোয়ান।' —অ্যালান বলে। নিবৃত্ত হল সে। অ্যালমাকে আদর করে ধীরে ধীরে তার বাবা মা ঘরের বাইরে চলে গেল।

জোয়ান তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যালমার ব্যাপারে আমরা এখন কি করব?'

'কি আর করব! এ তো কেবল একটি শিশুর দুঃস্বপন।'

'কিন্তু অভিশপ্ত এই পুতুলটি কোথা থেকে পেয়েছি।'

'শুনেছি। কিন্তু আমাদের এমন একজনকে খুঁজে বের করতে হবে পুরনো পুতুল সম্পর্কে যে অনেক কিছু জানে!'

বলা সহজ কিন্তু করা কঠিন। সুখের বিষয় অ্যালান আর জোয়ান একটি পত্রিকায় মিস লেথারিংটনের একটি লেখা পড়েছিল। ভদ্রমহিলা নিজেকে প্ল্যানগোনোলজিষ্ট বলে দাবি করেছেন। তাঁর একমাত্র শখ হল পুতুল জমানো। পুতুলদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন তিনি।

অ্যালান সেই পত্রিকার ঠিকানায় লেথারিংটনকে চিঠি লিখল। উত্তর এল। অস্পষ্ট হিজিবিজি লেখা—সম্ভবত তাড়াতাড়ি লেখার জন্যে। ভাগ্য ভালো, ঠিকানা বুঝতে কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু অ্যালমার দৃষ্টি এড়িয়ে পুতুলটিকে হস্তগত করা বেশ কঠিন। মুহূর্তের জন্যে রোজালিণ্ডকে চেয়ারে দেখে অ্যালমা একটু অন্যমনস্ক হয়েছিল সেই সুযোগে অ্যালান পুতুলটিকে তুলে নিয়ে লেখারিংটনের আস্তানায় হাজির হল।

ভদ্রমহিলার ঘর পুতুলে ভর্তি। পুতুলগুলি সকল জাতির, নানা রঙের, নানা পোষাকের, সকল যুগের। তাঁর বিছানায়, বইয়ের আলমারিতে চেয়ারে মেঝেতে—সর্বত্রই নানা ধরনের পুতুলে ভর্তি। মিস লেথারিংটন নিজেও যেন একটি পুতুল। তাঁর গড়ন সুন্দর, মুখটি উদাস।

'ভেতরে আসুন মিষ্টার অ্যালান, কিন্তু আমার ছোট সোনাদের বিরক্ত করবেন না যেন।'—তিনি বললেন।

তাঁর আদুরেরা অ্যালানের দিকে কাঁচের চোখ মেলে কিংবা শুন্য চোখে অভেদ্য দৃষ্টিতে চাইল।

'আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। আপনি কি আমার বিচিত্র সংগ্রহ শালার জন্যে আর একটি পুতুল এনেছেন?'

'না ঠিক তা নয়। আমি আপনার কাছে কিছু জানতে চাই। এই পুতুলটার সম্পর্কে কিছু বলতে পারেন?' ভদ্রমহিলা অনেক যত্নে, অনেক আদরে রোজালিণ্ডকে হাতে নিলেন—যেন সে কোন জীবিত শিশু। নাড়াচাড়া করে মন্তব্য করেন তিনি, 'বহু পুরনো পুতুল এটি। বেচারা অনেক দুঃখকষ্ট সয়েছে। এ ধরনের একটি কাঠের পুতুল আছে, যেটি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের। এখন এইসব পুতুল আর পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সময়ে সেগুলি খুবই সস্তা ছিল।'

'আপনি এটিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করছেন না তো?' অ্যালান জিজ্ঞেস করে।

'না অশুভ কোন কিছুই দেখছিনা, শুধু দুঃখের ছবি দেখছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন—এটি ভৌতিক পুতুল নয়। ভৌতিক পুতুলগুলি মোম দিয়ে তৈরি—যাতে এর ভেতর পিন গাঁথা যায়।'

'তাহলে এটি অতি সাধারণ একটি পুতুল?'—অ্যালান বলে।

তিনি বললেন, 'কোনও পুতুলই সাধারণ নয়। প্রতিটি পুতুলই অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক। জানিনা এদের নিজস্ব কোনও চরিত্র বা বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, কিংবা যারা তাদের ভালবাসে তাদের চরিত্রই এরা আত্মসাৎ করে। যাক, এটিকে আপনি কোথায় পেলেন?'

'এটিকে পেয়েছি ক্ল্যাভার হলের ধ্বংসাবশেষের মাঝে। সম্ভবত এটি একটি অনাথ আশ্রম ছিল।

'একদিন এটি বর্ণোজ্জ্বল প্রফুল্ল ছিল, আর কেউ না কেউ এটিকে ভালবাসত।'

'আমার মেয়ে অ্যালমা এটিকে ভালবাসে আর তার থেকেই যা কিছু ঝামেলা।'

'আপনার মেয়েটি পুতুলটিকে ভালবাসে। এর থেকে প্রমাণিত হয় মেয়েটি সুবুদ্ধি সম্পন্ন। আজকাল অনেক বাচ্চাই সোনালী পরচুল পরা আর সাঁতারের খাটো পোষাক পরা লজ্জামুখী পুতুল পছন্দ করে।'—মিস্ লেখারটন বললেন।

'এটিকে পাওয়ার পর থেকে অ্যালমা অস্বাভাবিক অদ্ভুত ব্যবহার করে।'

'সম্ভবত সে পুতুলটির দুঃখ অনুভব করে। এমনও হতে পারে একদিন এটি যার ছিল তার দুঃখের অংশীদার হয় আপনার মেয়ে।'

'কিন্তু দুঃখটা কি? এ ব্যাপারে আপনি কি আমায় কোনও রকম সাহায্য করতে পারেন?'

মিস লেথারটন মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'পুতুলের মাঝে দুঃখ থাকলে আমি তার টের পাই। কিন্তু ব্যথার কারণ আমি বুঝতে পারি না। পুতুলগুলি আমার ছেলে-মেয়ে আর আজকাল কোনও মা-বাবা কি তাঁর শিশুদের মনের খবর রাখেন? মন বড় গোপন জায়গা।' প্রিয় পুতুলগুলির দিকে তাকিয়ে পুনরায় বলেন তিনি, 'আমি জানি কোন্‌টি সুখী কোন্‌টি দুঃখী। কিন্তু কেন আনন্দিত বা বিষাদগ্রস্থ বলব কি করে?'

অ্যালানের মনে হল এখানে এসে কোন লাভই হল না। বিরক্ত হল সে। এটি যেন এক পাগলীর আস্তানা। শেষবারের মতো জিজ্ঞেস করে অ্যালান, 'বলুন, আমি তাহলে কি করব?'

'পুতুলটি কেন এত দুঃখী বোঝার চেষ্টা করুন। ক্ল্যাভার-হল আর অনাথ আশ্রম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করুন। যদি আপনার মেয়ে পুতুলটিকে ছাড়তে চায় তাহলে আমায় সেটি দিয়ে যাবেন, সংগ্রহশালায় আর একটি মূল্যবান পুতুল পেয়ে আনন্দিত হব আমি।'

রোজালিণ্ডকে পকেটে পুরে অ্যালান মিস লেথারটনের আস্তানা ত্যাগ করল। সে একটি সাধারণ পাঠাগারে গেল। মিস লেথারটনের বসার ঘরের পুতুল অধ্যুষিত আবদ্ধ স্থানের অস্বাভাবিক আতঙ্কের তুলনায় তার কাছে এই লাইব্রেরী সুসংবদ্ধ এবং পার্থিব বলে মনে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর অনাথ আশ্রমের ওপর সে সুন্দর একটা বই পেল। সূচীতে 'ক্ল্যাভার হল' এর উল্লেখ রয়েছে। তন্ময় হয়ে ক্লাভার হলের ইতিহাস পড়ল সে। তার মনে হল ঠিকাদারির কাজ হাতে নেওয়ার আগে কেন সে এই বইটা পড়েনি।

'ক্ল্যাভার হল' সম্পর্কে বইটিতে লেখা ছিল, 'সে সময়ের অন্যান্য অনাথ আশ্রমের মত এটিতেও অর্থাভাব চলছিল। সেখানের পরিবেশ ছিল উৎসাহশূন্য আর অস্বচ্ছল। শিশুদের মঙ্গল আর স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে যাদের অধীনে তারা থাকে, তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর ওপর। অনাথ আশ্রমগুলির পরিচালকমণ্ডলী অধিকাংশ সময়েই অনুপযুক্ত হত—ডিকেন্সের লেখায় তাদের পরিচয় উদ্‌ভাসিত। যাহোক ক্ল্যাভার-হল মোটামুটি মন্দ চলছিল না, কিন্তু ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে একটা অপ্রিয় ঘটনা ঘটে গেল। এই সময় গ্রেস ওয়েব নামে এক বিধবা ছিলেন এই অনাথ আশ্রমের পরিচালিকা। নিজের থলি ভর্তি করতে তিনি শিশুদের উপোস করাতেন। তিনি শিশুদের ভয় দেখাতেন, বেশি খেলে তিনি তাদের পুতুলগুলি ছিনিয়ে নিতেন। মিসেস ওয়েবের তিন বছরের এই অপশাসনে বহু শিশু হাঁপিয়ে উঠে। ভয়াবহ এই ক্ল্যাভার-হল থেকে ছুটে পালিয়েছিল, মারা গিয়েছিল অনেকে। অমনোযোগী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মনেও সন্দেহ ঘনীভূত হল। অবশেষে ক্ল্যাভার-হলে অনুসন্ধান চালালেন তাঁরা। মিসেস ওয়েবের নির্মমতার বহু দৃষ্টান্ত মিলল। কারাবরণ করতে হল মিসেস ওয়েবকে। পাঁচ বছর কারাবাসের পর তাঁর মৃত্যু হল। জানা যায় যে মৃত্যুর আগে তিনি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলেন—তাঁর মনে হত মৃত শিশুরা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

অ্যালান বাড়ি ফিরল। পুতুলের ভারে তার পকেটটি ঝুলে পড়েছিল।

'অ্যালমা সারাদিন রোজালিণ্ডের পথ চেয়ে বসে আছে ছোট্ট একটি ভূতের মতো।'—জোয়ান বললে।

অ্যালমা এল। জিজ্ঞেস করে সে,—'তুমি কি তাকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

'কাকে?'—প্রশ্ন করে অ্যালান।

'রোজলিণ্ডকে'।'

'তাকে নিয়ে যাবে কে?'

'কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।'

' সে বোধ হয় আর থাকতে চায় না। তাই চলে গেছে।'

সে যদি ফিরে আসে তাহলে আর আমি কখনও কিছু না খেলেও কিছু মন করব না।'—পুতুলের সন্ধানে বেরিয়ে অ্যালনা।

মিস লেথারটনের কাছে সে যা শুনেছে আর লাইব্রেরীতে বই পড়ে অ্যালান যা জেনেছে জোয়ানকে জানাল। পুতুলটিকে পকেট থেকে বের করল সে।

'অশুভ, অভিশপ্ত এই পুতুলটির হাত থেকে মুক্তি পতে হবে'— জোয়ান বলল। অ্যালানের হাত থেকে পুতুলটিকে সে ছিনিয়ে নিল। তারপর পুতুলটির ঘাড়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলতে শুরু করে—

'এটাকে তো পুতুল বলে মনেই হয় না—মনে হয় সামান্য একটা কাঠের টুকরো।' সহসা জোয়ান তো নরম আঙুলগুলিতে ব্যথা অনুভব করে। অসহনীয় যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে পুতুলটিকে সে চুল্লির প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করল।

অপার্থিব একটা স্বর ভেসে ওঠে, 'নির্মম নিষ্ঠুর—আমি তোমাকে ঘৃণা করি।' বোঝা গেল না কোথা থেকে অ্যালমা কেঁদে উঠল। অ্যালান আর জোয়ান বুঝতে পারল না কেঁদে ওঠার আগে অ্যালমাই এই কথাগুলি বলেছিল, না কোন অশুভ আত্মার কণ্ঠে এগুলি ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু এই ধরনের অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর অ্যালমার হতে পারে না।

ঝড়ের বেগে অ্যালমা ঘরে ঢুকল। সে আগুনের সামনে নতজানু হয়ে তার প্রিয় পুতুলের নাম করে কেঁদে ওঠে। আশ্চর্য! গন্‌গন্‌ করছে চুল্লির আগুনে, কিন্তু শৈত্য প্রবাহ বইতে লাগল ঘরের মাঝে!

খোলা জানালা দিয়ে কালো অন্ধকার

সাকি (এইচ এইচ মুনরো)

'আমার একেবারে আপন পিসীমা এক্ষুণি নামবেন মিঃ নাটেল, আপনি একটু কষ্ট করে বসুন আর না হয় আমার সঙ্গে গল্পই করুন'—মেয়েটি খুব সপ্রতিভ ভাবে বলল।

ফ্র্যামটম নাটেল বুঝতে পারছে না কি কথা সে বলবে। সামনে বসা মেয়েটির বয়স প্রায় পনের বছর, দেখে মনে হয় অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। মেয়েটি বা তার পিসীমা সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না। তাছাড়া এই অনভ্যস্ত পরিবেশে আলাপ চালানোর মত মনের অবস্থা তার একদম নেই।

ফ্র্যামটম নাটেল মানসিক রোগী। সে অনেকদিন স্নায়ুবিকারে ভুগছে। পল্লী অঞ্চলের খোলামেলা জায়গায় ক'দিন থাকলে হয়ত শরীরটা ভাল হবে। মন ঠিক হবে। তাই সে বাড়ি ছেড়ে এখানে এসেছে। সে যখন এখানে আসতে

চাইল তার দিদি বলল—'ওই নির্জন জায়গায় গিয়ে তোর মন আরও খারাপ হবে। জায়গাটা আমার চেনা। আমি ওখানকার ক'জন লোককে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি। তুই গিয়ে দেখা কর, ভালই লাগবে। ক'জন লোক তো খুব ভাল।'

সেই চিঠি নিয়েই নাটেল দেখা করতে এসেছে মিসেস সাপলটনের সঙ্গে। উনি এবার আসবেন। নাটেল বসে, সামনে ওই মেয়েটি। নাটেল কিন্তু কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

দীর্ঘ স্তব্ধতার পর মেয়েটা বলল, 'আপনি কি এখানে আর কাউকে চেনেন?'

'না, প্রায় কাউকেই চিনি না। আমার বোন চারবছর আগে এখানে ছিল। সে-ই কটা চিঠি লিখে দিয়েছে। প্রথমেই এনার কাছে এসেছি,' অবসন্ন স্বরে বলল নাটেল।

'তাহলে আপনি আমার পিসীমা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না?'

'নাম ঠিকানা ছাড়া আর কিছু নয়।'

'তিনবছর আগে আমার পিসীমার জীবনে এক নিদারুণ দুঃখের ঘটনা ঘটে গেছে। আপনার বোন তখন চলে গেছে।'

'দুঃখের ঘটনা?' চমকে উঠল নাটেল।

'এই শীতের সন্ধে বেলায় ঘরের ওই বিরাট জানালাটা খোলা কেন বলুন তো?'—লনের দিকে দরজার মতো বিরাট গরাদহীন জানালাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মেয়েটি বলল।

'এখন অবশ্য ঠাণ্ডা খুব একটা নেই, জানালাটা খোলা থাকতে পারে,' নাটেল বলল, 'তবে তোমার পিসীমার দুঃখের সঙ্গে এর কোনও স্পম্পর্ক আছে কি?'

বিষণ্ণ গম্ভীর ভাবে মেয়েটি বলতে শুরু করল—'তিন বছর আগে এইরকম এক দিনে পিসেমশাই আর পিসীমার দুই ছোট ভাই রোজকার মতো শিকার করতে বেরোয়। তারা আর ফেরেনি। একটা জলা জায়গা দিয়ে যাবার সময় তারা তিনজনই আচমকা পাঁকে ঢাকা এক বিরাট গর্তে পড়ে যায়। অবশ্য গর্ত না বলে তাকে ছোটখাট পুকুর বলাই ভাল। জায়গাটা যে অত ভীষণ তা আগে বোঝা যায় নি। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার হল ওই তিনজনের দেহ আর খুঁজে পাওয়া গেল না।'

মেয়েটার কণ্ঠস্বর কেমন যেন কেঁপে উঠল।

সে বলে চলেন—'আমার হতভাগিনী পিসীমার ধারণা ওরা একদিন না একদিন ফিরে আসবেই। সঙ্গে আসবে আদরের স্প্যানিয়েল কুকুরটা যেটা ওদের সঙ্গে একই পরিণতি লাভ করেছে। পিসীমা মনে করেন যে, ওরা যেমন করে ওই গরাদখোলা বিরাট জানালাটা দিয়ে ভেতরে ঢুকত, তেমনি আবার ঠিক একদিন ওখান দিয়েই আসবে। তাই অন্ধকার ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত ওটা রোজই খোলা থাকে। দুর্ভাগিনী পিসীমা প্রায়ই আমাকে বলেন কেমন করে ওরা চলে গিয়েছিল—পিসেমশাইয়ের হাতে ছিল সাদা রঙের ওয়াটারপ্রুফ কোট আর পিসির ভাই গাইছিল একটা বাজে গান যেটা শুনলেই পিসীর মেজাজ চড়ে যেত, আর পিসীকে রাগাবার জন্যই ও ওটা গাইত। জানেন, আরও কেমন যেন মনে হয় এইরকম একটা অদ্ভুত নির্জন সন্ধ্যায় ওরা যেন সত্যিই অজ্ঞাত লোক থেকে ফিরে আসবে ওই খোলা জানালা দিয়ে—।'

মেয়েটি যেন কেঁপে উঠল—ভয়ে না আতঙ্কে! না অন্য কিছু!

নিথর হয়ে বসে আছে নাটেল। চারদিক নির্জন থমথমে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

মিসেস স্যাপলটন প্রবেশ করলেন, দেরী হওয়ার জন্য ক্ষমা চাইলেন বারবার। বললেন, 'আমার ভাইঝি ভেরার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বেশ মজা লাগে না?'

'ওর সঙ্গে কথা বলে বেশ ভালই লাগছিল।'

'ওই জানালাটা খোলা থাকায় আপনার নিশ্চয় কোনও অসুবিধা হচ্ছে না?' কথাটা তিনি বললেন কেমন যেন হঠাৎ। চমকে উঠল নাটেল।

'আমার স্বামী আর ভাইরা শিকার থেকে সোজা ফিরবে। আর ঢুকবে ওই খোলা জানালা দিয়ে। ওরা আজ জলাভূমিতে পাখি মারতে গেছে। বাড়ি ফিরে আমার কার্পেটটা জলে কাদায় মাখামাখি করে দেবে। সত্যি, ওদের নিয়ে পারা যায় না।

তার কণ্ঠস্বর উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন সত্যিই ওরা ফিরে আসবে এক্ষুণি। নাটেল ভয়ে আতঙ্কে স্থির হয়ে বসে। ভেরা ঠিকই বলেছে। কি অদ্ভুত স্বাভাবিকভাবে তার পিসীমা ওদের ফেরার কথা বলছেন।

মৃতদের ফিরে আসার প্রসঙ্গ থেকে নাটেল অন্য দিকে পিসীমার মনকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আর নিজের অসুখের কথাও বলল অনেকবার। কিন্তু কিছুতেই পারছে না পিসীমার মনকে অন্য দিকে নিয়ে যেতে। তাঁর ধারণা ওরা ফিরে আসবেই।

নাটেল শিউরে উঠছে বারবার। পিসীমার চোখ সেই খোলা জানালার দিকে। হায়, কোনও অশুভলক্ষণে সে এসেছিল এখানে!

'ডাক্তাররা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কোনও ধরনের মানসিক উত্তেজনা আমার পক্ষে ক্ষতিকর। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রমও আমার নিষেধ। অবশ্য খাওয়াদাওয়ার বিশেষ কোনও বিধিনিষেধ নেই'—সে শান্তভাবে বলল। সে এখনও চেষ্টা করছে পিসীমার মনকে অন্য দিকে ঘোরাবার।

মিসেস স্যাপলটন কিন্তু ওর কথা শুনছেন না। তার মন অন্য দিকে। হঠাৎ তাঁর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

'ওই যে ওরা এসে গেছে; তিনি চিৎকার করে বললেন, 'ঠিক চায়ের সময়েই এসেছে। দেখ, ওদের চোখ পর্যন্ত কাদায় মাখামাখি।'

নাটেল কেঁপে উঠল,তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। সে সহানুভূতির সঙ্গে চাইল ভেরার দিকে। দু-চোখভরা আতঙ্ক আর ভয় নিয়ে ভেরাও জানালার দিকে তাকিয়ে। অজানা আশংকায় শিউরে উঠে নাটেল তাকাল সেদিকে।

গোধূলির ম্লান ধূসর অন্ধকারে তিনটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসছে খোলা জানালারই দিকে। তাদের হাতে বন্দুক, একজনের কাঁধে সাদা কোট, ছাইরঙের একটা স্প্যানিয়েল কুকুরও যেন দেখা যাচ্ছে।

অস্থির পদক্ষেপে তারা প্রবেশ করল বাড়িতে। কার গলায় যেন শোনা গেল সেই গান যা স্নায়ুকে পীড়িত করে তোলে।

অবিশ্বাস্য আতঙ্কে উন্মাদ হয়ে গেল নাটেল। সজোরে আঁকড়ে ধরল তার লাঠি আর টুপি, দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। সভয়ে সরে গেল এক সাইকেল আরোহী।

সাদা কোট হাতে ভদ্রলোক সেই খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে এলেন।

'আমার ঠিক সময়েই এসে পড়েছি। পথঘাটের অবস্থা ভালই ছিল। আচ্ছা, ছিটকে বেরিয়ে গেল ওই লোকটি? কে?'—তিনি বললেন।

মিসেস স্যাপলটন বললেন, 'ও একটা অদ্ভুত লোক। সারাক্ষণ নিজের রোগের কথাই বলল। তোমরা আসাতে কোনও কথাবার্তা না বলে অভদ্রের মতো ছুটে পালাল যেন ভূত দেখেছে।'

ভাইঝি ভেরা শান্ত স্বরে বলল, 'আমার মনে হয় স্প্যানিয়েলটা দেখেই ও ভয় পেয়েছে। লোকটা বলছিল যে ও কুকুরকে ভীষণ ভয় করে। কোথায় নাকি একবার নদীর ধারে কবরখানায় এক পাল কুকুর ওকে তাড়া করেছিল।

সারারাত একটা নতুন খোঁড়া কবরের মধ্যে বেচারা বসেছিল। আর কুকুরগুলো সারারাত ধরে ওর মাথার ওপর চেঁচিয়েছে। ও মাথা তুললেই কামড়াতে গেছে। একটা মানুষের স্নায়ুর রোগ ধরাতে এই তো যথেষ্ট।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যে গল্প তৈরি করার আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মেয়েটির।

ভয়ঙ্কর রাত

হল পিঙ্ক

'দেখ!'

বার্কার একটা ছোট কার্ডবোর্ডের বাক্স তুলে ধরল আমার দেখার জন্য। বাক্সটার ভেতরে তুলোর পশমে রাখা একটা বড় শুকনো বীজ, একটি মরা কুঁচকানো শুককীটের মতো দেখতে।

'এটা কি?' আমি জানতে চাইলাম।

'আমিও বোঝার চেষ্টা করছি এটা কি? মৃদু হেসে বলল বার্কার। 'যে লোকটার কাছ থেকে ওটা আমি পেয়েছি সে বলেছে যে ওটা বিষাক্ত ভয়ংকর উদ্ভিদ ম্যানড্রেকের বীজ।'

এমন উৎসাহ ও আগ্রহের সঙ্গে বার্কার কথাটা বলল যে আমারও উৎসাহ বেড়ে গেল। যদিও আমি ব্যাপারটার কিছুই জানি না। বার্কার আমার

অনেককালের বন্ধু। ও একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদবিজ্ঞানী। অনেক নতুন ধরনের অর্কিডও আবিষ্কার করেছে। গবেষণার কাজে বার্কার পৃথিবীর অনেক দুর্গম অঞ্চলে গেছে। সম্প্রতি সে ব্রাজিলের অরণ্য থেকে অভিযান শেষ করে ফিরেছে। তার সফল অভিযান ও প্রত্যাবর্তনকে উপলক্ষ্য করে আমরা দুই বন্ধু পান ভোজনে মিলিত হয়েছি। বার্কারের স্টাডিতে খাওয়াদাওয়ার পর আমরা বসে।

'ম্যানড্রেক আবার কি?' আমি জানতে চাইলুম।

উত্তরে বার্কার তার পড়ার তাক থেকে ল্যাটিন ভাষায় লেখা একটা পুরনো বই বার করল। বইটা ম্যানড্রেককে নিয়ে লেখা। পাঁচশ বছর আগে লেখা এই বইতে ম্যানড্রেক সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও কাহিনী দেওয়া আছে। বই-এর ছবিটা বার্কার আমায় দেখাল! ম্যানড্রেকের ছবিটা ও বার্কার আমায় দেখাল! ম্যানড্রেকের ছবিটা এইরকম—মানুষের শরীর হাত ও পা; কিন্তু হাতের ও পায়ের পাতার জায়গায় আছে শেকড়, আর মাথার জায়গায় একরাশ পাতা। ম্যানড্রেকের ডান পায়ে দড়ি দিয়ে একটা কুকুর বাঁধা।

বার্কার বলল, 'গল্পকথার মানবধর্মযুক্ত উদ্ভিদকে শিল্পী কিভাবে এঁকেছেন। আগে লোকে ভাবত ম্যানড্রেক গাছ হলেও মানুষের মতো আকারসম্পন্ন ও মাংসাশী প্রাণীর মতই সর্বভোজী। যে তার শুঁড়ের মতো শিকড়কে বাড়িয়ে দিয়ে যারা গাছপালা সংগ্রহ করে তাদের কিছু বুঝতে পারার আগেই আঁকড়ে ধরে ও পিষ্ট করে মেরে ফেলে। প্রাণীদের রক্ত খেয়েই এরা শক্তি অর্জন করে। একটা ম্যানড্রেক গাছ উপড়ে ফেলার চেষ্টা ছিল আত্মহত্যার সামিল এবং কুকুরদের ওই কাজে লাগানো হত! ছবিতে তাই দেখানো হয়েছে।'

'একেবারে বাজে কথা,' আমি হেসে বললাম। 'তুমি কি সত্যি সত্যিই এরকম ভয়ংকর গাছের অস্তিত্বে বিশ্বাস কর?'

'কেন করব না?' বার্কার বলল। 'মানুষ ও মনুষ্যতর প্রাণীর যে যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কে বলতে পারে উদ্ভিদই সেই মিসিং লিঙ্ক কি না? গাছ চিরকালই সোজা হয়ে দাঁড়ায় মানুষের মতো, ইতর প্রাণীদের মতো পিঠ নীচু করে চলে না। এমন কি আজও অনেক জংলী গাছ আছে যারা শুঁড় বা আঁকশি দিয়ে ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরে।'

'বেশ তো, তোমার ওই ম্যানড্রেক বীজ থেকেই গাছ করে দেখ না কি হয়,' আমি হেসে বললুম।

বার্কার কিন্তু আমার কথাটাকে খুব গুরুত্ব দিল। সে চিন্তিতভাবে বলল, 'এর জন্যে ভীষণ তাপের দরকার। আর্দ্র সিক্ত পরিবেশে ও প্রবল উত্তাপে এই গাছ জন্মাবে।'

দরজায় আঁচড়ানোর শব্দে বার্কার থামল। 'টম এসেছে,' বার্কার হাসি মুখে বলল।

পারস্যদেশের সুন্দর বেড়াল টম বার্কারের অত্যন্ত আদরের। বার্কার বাইরে গেলে টম অনেক সময় আমার কাছেই থাকত।

ঘরে ঢুকে টম আনন্দে ঘুরছে। 'ও আমার মাটির তলার ঘরে এতক্ষণ ইঁদুর খুঁজছিল। এবার দুধ খাবে,' বার্কার আদর করে বলল।

একমাস কেটে গেছে। আমি নিজের কাজকর্ম নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বার্কারের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। একদিন ও ফোন করল।

'তুমি কি এক্ষুণি একবার আসতে পারবে?' বার্কারের স্বর উত্তেজনায় অধীর। 'একটা অদ্ভুত জিনিস তোমায় দেখাব। সেই ম্যানড্রেক বীজটা—'

'কি বলছ', আমি চমকে উঠলাম, 'ওটার গাছ বেরিয়েছে নাকি?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—প্রচণ্ড উত্তাপ লেগেছে—আমার সেলারেই গাছ জন্মেছে—তাড়াতাড়ি এস দেখতে—।'

আমি প্রায় ছুটেই বেরলাম। সেই ভয়ঙ্কর ম্যানড্রেক গাছ জন্মেছে যা প্রাণীর রক্ত খায়? দোরগোড়াতেই বার্কার দাঁড়িয়ে, স্কুলের ছাত্রের মতো সে অধীর উত্তোজিত। তার মুখে উল্লাস উন্মাদনা।

'তোমার আগেই দেখা উচিৎ ছিল! গাছটা আমার হাতের মতো বড় হয়েছে। মূলশুঁড় কর্ষক সবই আছে। এর মানে কি বুঝতে পারছ? আমরা নিমেষে ক্যালেণ্ডার থেকে হাজারবছর মুছে ফেলেছি। এইরকম গাছ খালি অতীত যুগের গল্পকথায় পাওয়া যেত, আদিম মানুষ কথা বলতে শেখার আগেই এরা পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়। এখন আমার বাড়িতে জন্মেছে—বাড়ছে।'

বার্কারের উত্তেজনা আমাকেও স্পর্শ করল, আমিও উদ্দীপিত হলাম। বার্কারের সঙ্গে দ্রুত পায়ে চললুম সেলারের দিকে। মাটির অনেক গভীরে একেবারে নীচে ঘরটা। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় গরম ধোঁয়ার মেঘ এসে যেন ধাক্কা মারল।

'আদ্র উত্তাপ,' বার্কার ব্যাখ্যা করল। 'গরম বাষ্প আর বিদ্যুতের তীব্র আলো। আমি একটা তামার বয়লার এখানে বসিয়েছি, সেটা তিন সপ্তাহ ধরে ফুটছে। হোস পাইপ করে বয়লার এখানে বসিয়েছি, সেটা তিন সপ্তাহ ধরে ফুটছে। হোস পাইপ করে বয়লারে জল ঢালা হয়, আর প্রতি চারঘন্টা অন্তর আগুন জ্বালা হয়। এই অতি উষ্ণ বাষ্প যে উত্তাপে ও আর্দ্রতা সৃষ্টি করেছে তাতেই এরকম গাছ বাঁচতে পারে। ইলেকট্রিসিটি দিয়ে আরো আলো ও অতিরিক্ত উত্তাপ সঞ্চারিত হচ্ছে।'

আমরা একেবারে নীচের ঘরে গেছি। উত্তপ্ত আবহাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু সেই বাষ্পের আবরণ ভেদ করে আলোর দৃষ্টি পৌঁছল অন্য প্রান্তে, যেখানে নরম সিক্ত মাটিতে সেই অদ্ভুত গাছটা আস্তে আস্তে দুলছে।

সত্যিই দুলছে। সেখানে কোনও বাতাস ছিল না যাতে কিছু আন্দোলিত হতে পারে। তবু গাছটা এক পাশ থেকে অন্য পাশে দুলছিল। সত্যি, গাছটা প্রায় হাতখানেক লম্বা। গোড়া বেশ মোটা, দুটো পুষ্ট শাখা বেরিয়েছে যার প্রান্তে পাতলা শিকড়গুচ্ছ ওপর দিকে পত্রগুচ্ছের দিকে প্রলম্বিত হয়েছে। গাছটার রঙ সাদা। কিন্তু গোড়ায় হালকা ছাইছাই রঙের ছত্রাক জমে আছে।

'দেখলে তো?' বার্কার বলল, 'অবশ্য ছবির মত পা নেই গাছটার, কিন্তু হাত শুঁড় সবই আছে। কাছে গিয়ে দেখ শোষক শুঁড়ও দেখতে পাবে।'

আমি তাকিয়ে দেখলুম। ফুলের মত দেখতে শোষক শুঁড়গুলো খুলছে বন্ধ হচ্ছে যেন খাদ্যের প্রত্যাশায়। আমি শিউরে উঠলুম। ওটার মধ্যে কেমন যেন একটা অবিশ্বাস্য ঘৃণ্যতা শয়তানি ও ভয়াবহতা লুকিয়ে আছে।

'একটা জিনিস দেখ। গাছটা প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে।' বার্কার আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে চেঁচিয়ে বলল। গাছটা একবার প্রসারিত হচ্ছে আবার গুটিয়ে যাচ্ছে, আবার প্রসারিত হচ্ছে—এবং প্রতিবারেই সে বড় হচ্ছে।

আমি যেন আর সহ্য করতে পারছি না। বললাম, 'চল বেরিয়ে যাই, তাপ বেড়ে যাচ্ছে।'

বার্কারের একেবারেই ইচ্ছা ছিল না ওখান থেকে চলে আসার। আমি ওর হাত ধরে প্রায় টেনে আনলাম। ওপরে এসে মনে হল বাতাস কত মধুময়!

'একটা অদ্ভুত, সৌন্দর্য, তাই না?' বার্কার উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'আমার মনে হয় এটা একটা বৃহত্তম—'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি মেনে নিচ্ছি—' আমি তাড়িতাড়ি বললাম।

আমি বারবার চেষ্টা করছি ওই বীভৎস প্রাণীটির প্রসঙ্গ এড়াতে, কিন্তু বার্কার একঘন্টা ধরেই সেই কথা বলে চলল।

আমি ফিরে এলাম। দু'দিন ধরে আমি বার্কারের সেই মাটির তলার ঘর আর সেই ভয়ঙ্কর উদ্ভিদটার কথা ভুলতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু খালি ওটার কথাই মনে আসছে। তৃতীয় দিনে সকালে আমার মনে, কেমন যেন একটা ভয় ঢুকল। কাজে মন দিতে পারছি না। খালি চোখের সামনে ভাসছে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উপযোগী কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা উষ্ণ সিক্ত আবহাওয়ায় সেই ভীষণ প্রাণীটা, আর বাষ্প ভেদ করে এর প্রতি বার্কারের সপ্রেম দৃষ্টি।

...বার্কার বয়লারে আগুন দিচ্ছে... বার্কার শয়তানের পুজোর জন্য তীব্র বিদ্যুৎ আলো ঠিক করছে... বার্কার ওই উদ্ভিদটার শুঁড় ছুঁতে যাচ্ছে।

আমি বার্কারের বাড়ি গেলাম। আমাকে যেতে হল। যুক্তির থেকে প্রবল, আমার ব্যক্তিত্বের থেকে বড় একটা শক্তি, যেন আমাকে টেনে নিয়ে গেল বার্কারের বাড়িতে।

দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোনও সাড়া নেই। তবে ও কি বাইরে গেছে? না, তাও তো নয়। খুব জোরে জোরে ঘা মারলাম। দরজা খুলল না। বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে চেঁচাতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত একটা জানালা ভাঙ্গলাম। স্বাভাবিক অবস্থায় আমি তা করতুম না। কিন্তু আমার বন্ধুর সম্বন্ধে কেমন যেন একটা ভয় আমার মনে দানা বাঁধল, মনে হল বার্কার নিরাপদ নয়।

জানালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে আমি বার্কারের নাম ধরে চেঁচাতে লাগলাম।

'তুমি কোথায়?' আমি চিৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এসে যেন আমাকে ব্যঙ্গ করল।

মাটির নীচের ঘরে সেলারে যাবার দরজাটা খোলা। আমি নামব বলে পা বাড়িয়েছি এমন সময়—

'বাঁচাও!'

বার্কারের গলা! আমার দপ দপ করছে, আমি সবেগে নামতে আরম্ভ করলাম নীচের দিকে। সেই গরম বাষ্পপূর্ণ ঘরে পা দিলাম। কী দৃশ্য!

ঘরের শেষ প্রান্তে বার্কার দাঁড়িয়ে। ভয়েতে দেওয়ালে যেন মিশে গেছে। তার ওপর ঝুঁকে আছে সেই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা, ওটা এখন মানুষের মতো বেড়ে উঠেছে।

বাতাসে যেন গুঞ্জন ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। গাছটা এক ধার থেকে অন্য ধারে দুলছে, তার রক্তচোষা আঁকশিগুলো হাতের মত প্রসারিত হয়ে আছে ভীত সন্ত্রস্ত বার্কারের দিকে। কাদার ওপর পড়ে আছে টমের রক্তহীন মৃতদেহ।

'একটা কুড়ুল আনো, একটা কুড়ুল!' আমাকে দেখে বার্কার চেঁচিয়ে উঠল, 'যাও, তাড়াতাড়ি।'

আমি ঘুরে দৌড়লাম। ওপরের ঘরে একটা ধারাল দা আর একটা কোদাল ছিল। ওই দুটো নিয়ে ছুটে নেমে এলুম। ঠিক সময়েই এসেছি। ভয়ংকর গাছটার শুড়গুলো বার্কারকে প্রায় পেঁচিয়ে ধরেছে। রক্তচোষা আঁকশিগুলো থেকে যেন লাল ঝরছে। বার্কার অসহায় ভাবে আর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল, আর—রূপ!

আমি পায়ের সর্বশক্তি দিয়ে ঘা দিলাম দৈত্যটার গায়ে।

ও যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল।

সাইরেনের আওয়াজে মতো ওর চিৎকার ঃ তীক্ষ্ণ তীব্র ভয়ংকর।

একগোছা রক্তচোষা আঁকশি প্রায় বার্কারের কাঁধকে জড়িয়ে ধরেছিল। কিন্তু মূল গাছটা পেছনে আমার দিকে সরে আসতে তারা ঝুলে গেল।

আমি অস্ত্র দিয়ে বার বার আঘাত করতে লাগলাম। বাতাস বিদীর্ণ করে দিল গাছটার চিৎকার। দা-টা ছুঁড়ে দিলাম বার্কারের দিকে। সেও সমানে আঘাত করতে লাগল।

আমরা সেই ভয়ঙ্কর গাছটাকে খণ্ড খণ্ড করে কেটে ফেললাম।

এতক্ষণে বার্কার নিরাপদ হয়েছে। তার সারা মুখ ঘামে ভর্তি। সে থর থর করে কাঁপছে। 'তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ,' সে হাঁফাচ্ছে। 'আমি চার ঘন্টা এখানে এসেছি। খুব সকালেই এসেছিলুম আগুন ঠিক আছে কিনা দেখতে। রাতারাতি গাছটা কত বেড়ে গেছে দেখে খুব খুশি হলাম, অবাকও হলাম। ওই কোণে গিয়ে ইলেকট্রিকের আলোটা দেখছি এমন সময় টম এলো। আমি টমকে কোনওদিন এখানে আসতে দিইনি। আজ হঠাৎ ও এসেছে। টম গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে। আমার মনে হয় গাছটা ওকে সম্মোহিত করেছে, কেননা শুড়গুলো ওর কাছে নেমে আসতেও ও নড়াচড়া করেনি। তারপর ওকে ধরে ফেলে।

ঘটনানাটা মনে পড়ায় বার্কার শিউরে উঠল।

'আমি টমকে ধরার আগেই গাছটা ওকে ধরে। রক্তচোষা আঁকশি দিয়ে ওর রক্তপান করতে থাকে। গাছটা রক্তই চেয়েছিল। রক্ত খেয়ে ওর জোর বাড়ে। আমি অবাক হয়ে দেখি গাছটা ক্রমশঃ বেড়ে উঠছে। বাতাসে শোনা যাচ্ছে ওর গুঞ্জন ধ্বনি। বুঝতে পারলাম আমিও ফাঁদে পড়েছি। আমি পালাতে পারলাম না! টমের রক্ত খেয়ে ও আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। আমি আটকে রইলাম। তুমি না আসা পর্যন্ত ওভাবেই ছিলাম। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ।'

বার্কার আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠল। আমরা ম্যানড্রেকের টুকরোগুলো অ্যাসিড দিয়ে পুড়িয়ে একেবারে নিঃশেষ করে দিলাম। জিনিসপত্র সরিয়ে বার্কার সেলারটা তালা দিয়ে দিল। প্রিয় টমের মৃত্যুতে বেচারা খুব দুঃখ পেয়েছে।

শেষবার যখন বার্কারের বাড়িতে গেলাম, দেখলাম যে ম্যানড্রেককে নিয়ে লেখা বইটা ওর বুককেসে আর নেই।

কালো বাঁদরের থাবা

ডবলিউ ডবলিউ জেকবস্

শীতের রাত। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তার ওপর বৃষ্টি। দরজা জানালা বন্ধ করে উষ্ণ উত্তপ্ত ঘরে বসে আছে বৃদ্ধ মিঃ হোয়াইট, তার স্ত্রী এবং তার ছেলে হার্বাট। সময় কাটাবার জন্যে বাবা ছেলে দাবা খেলছে, মা সেলাই করছে। কিন্তু কারো যেন কিছুতেই মন বসছে না। হোয়াইট তার এক বন্ধুর অপেক্ষা করছে। সার্জেণ্ট মরিস একুশ বছর দেশছাড়া হয়ে প্রধানতঃ পূর্বাঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়ে সম্প্রতি দেশে ফিরেছে। আজ মিঃ হোয়াইটের বাড়ি তার আসবার কথা।

গেট খোলার শব্দ শোনা গেল। ভারী পদক্ষেপ এগিয়ে আসছে ঘরের দিকে। হোয়াইট এগিয়ে গিয়ে আন্তরিকভাবে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করে আনল। মরিসের শরীর লম্বা সুগঠিত প্রাণোচ্ছল, চোখদুটো ছোট কিন্তু উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ। মরিস ভারতবর্ষে ছিল দীর্ঘকাল। সেখানকার দেশ, মানুষজনদের নানা গল্প হচ্ছে—বিশেষ করে মন্দির ফকির সাধু সন্ন্যাসীর কথায় সকলেই আগ্রহী। কথা প্রসঙ্গে

হোয়াইট বন্ধুকে বলল, 'মরিস, তুমি সেদিন একটা বাঁদরের থাবা না কিসের কথা যেন বলছিলে?'

মরিস যেন এড়িয়ে যেতে চাইল ব্যাপারটা।

বাঁদরের থাবার কথায় সবাই কৌতূহলী হয়ে উঠল।

মরিস বলল যে, থাবাটা মন্ত্রপূত, অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন।

সকলের আগ্রহ দেখে মরিস পকেট থেকে বার করল থাবাটা। সাধারণ ছোট থাবা, শুকনো মমির মতো। হার্বাটের মা থাবাটা দেখে হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেল। কিন্তু হার্বাট আগ্রহভরে ওটা হাতে তুলে নিল।

মরিস বলল, 'এক সাধু ফকির এই থাবাটাকে মন্ত্রপূত করে গিয়েছেন। তিনি দেখাতে চান যে ভাগ্যেই মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাকে প্রতিহত করতে গেলে চরম দুঃখ পেতে হয়। এটাকে এমনভাবে যাদু করা হয়েছে যে তিনজন লোক এর কাছ থেকে যা চাইবে পাবে, তিনটে ইচ্ছাই পূরণ।'

মরিসের কথার ভাব-ভঙ্গীতে কেমন যেন রহস্যের ছাপ ভয়ের চিহ্ন। হোয়াইটরা জানতে চাইল কেউ এটা থেকে কিছু চেয়ে পেয়েছে কি না। মরিস বলল যে, অনেকেই চেয়েছে, পেয়েছেও তাদের কামনার জিনিস; কিন্তু তার পরিণাম হয়েছে ভয়াবহ। মরিস অস্বস্তির স্বরে বলল যে, সেও তিনটে জিনিস চেয়ে পেয়েছিল।

'যদি তুমি তোমার জিনিস চাও এবং তা পেয়ে থাক, তাহলে এটা আর তোমার কাছে রেখেছ কেন?'—জানতে চাইল হোয়াইট।

'খেয়ালের বশেই রেখেছি। এটাকে একবার বিক্রির কথাও ভেবেছিলুম। কিন্তু এটা এত ভয়ংকর যে লোকের ক্ষতি করতে মন চায়নি। তাছাড়া লোকে বিশ্বাসও করে না, ভাবে গাঁজাখুরী গল্প। আগে পরীক্ষা করে তবে নিতে চায়।' মরিস বলল।

হঠাৎ মরিস বাঁদরের থাবাটাকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলল, হার্বাট সঙ্গে সঙ্গে আগুন থেকে তুলে নিল সেটাকে। হোয়াইট মরিসের কাছ থেকে বাঁদরের থাবাটা চাইল। ভয়ে চমকে উঠল মরিস।

মরিস তীব্র স্বরে বলল, 'ফেলে দাও ওটাকে, এক্ষুণি ফেলে দাও। ওর কাছ থেকে চাওয়ার পরিণাম যে কি ভীষণ তুমি ভাবতে পারবে না।'

কিন্তু হোয়াইট ছাড়বে না কিছুতেই। সে নাছোড়বান্দা। মরিসও থাবাটা দেবে না। হোয়াইট জানতে চাইল কি করে ওর কাছ থেকে চাইতে হয়। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে মরিস বলল যে, থাবাটাকে ডান হাতে ধরে চেঁচিয়ে বলতে হয় বাসনার কথা। কিন্তু সে বার বার সাবধান করে দিল।

আষাঢ়ে গল্পের মতো শোনাচ্ছে। শ্রীমতী হোয়াইট খাবার জোগাড় করতে করতে ঠাট্টা করে বলল, 'আমার জন্যে চারজোড়া হাত চাও।'

প্রবল হাসির মধ্যে হোয়াইট পকেট থেকে থাবাটা বার করল।

অতর্কিতে মরিস তার হাত চেপে ধরল।

খাওয়া দাওয়া চুকল। চলে গেল মরিস। যাওয়ার সময় আবার সাবধান করে দিল হোয়াইটকে থাবাটা সম্বন্ধে। সবাই আলোচনা করছে থাবার কাছে কি চাওয়া যায়।

হার্বাট বলল, 'দুশো পাউণ্ড পেলে তুমি বাড়ির ধারটা মেটাতে পার। তাই চাও না।'

থাবাটাকে হাতের মুঠোয় ধরে হোয়াইট খুব গম্ভীর মুখে স্পষ্ট করে বলল, 'আমি দুশো পাউণ্ড চাই।'

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠল হোয়াইট। তার হাতে সাপের মত ঝিলমিল করে উঠেছে থাবাটা, কেমন যেন ভয় করছে। হার্বাটের মতো ভয় পেয়েছে।

কিন্তু কই, টাকা তো এল না! কোথায় যাদুবিদ্যার জোর!

হোয়াইট বলল, 'টাকা না পাই দুঃখ নেই, কোনও ক্ষতি তো হয়নি। কিন্তু আমার হাতে ওটা সত্যিই কি বিশ্রীভাবে নড়ে উঠল।'

হার্বাট পরিহাস করে বলল, 'বাবা, তোমার বিছানায় দেখবে টাকা পড়ে আছে। যাক, শুতে চললাম।'

হোয়াইট কি যেন এক ভয় আতঙ্ক নিয়ে অন্ধকারে বসে রইল ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে চেয়ে। আগুনের মধ্যে কি সব ভয়ংকর মুখের ছবি ভেসে বেড়াচ্ছে। এক নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে সে ঘুমোতে গেল।

পরদিন সকাল। সূর্যের কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঘরেও আলোর উজ্জ্বলতা। রাতের ভয়টা একেবারেই মিলিয়ে গেছে। তাকে অবহেলায় রাখা বিশ্রী থাবাটার আর কারো বিশ্বাস নেই।

শ্রীমতী হোয়াইট বলল, 'সব সোলজারই এক ধরনের, খালি আজেবাজে কথা বলে। কেন যে ওই সব বাজে কথা শুনতে গেলাম। এযুগে কি দৈবশক্তিতে ইচ্ছাপূরণ হয়? আর যদি হয়ই বা, তুমি কি করে দুশো পাউণ্ড পাবে বুঝতে পারছি না।'

চটুল হার্বাট মন্তব্য করল, 'আকাশ ফুঁড়ে বাবার মাথায় পড়বে।'

'কিন্তু মরিস বলছিল যে টাকাটা খুব স্বাভাবিক ভাবেই আসবে, মনে হবে যেন সাধারণ যোগাযোগেই এটা ঘটা সম্ভব'—হোয়াইট আস্তে আস্তে বলল।

'আমি না ফিরলে টাকাতে কিন্তু হাত দেবে না,' পরিহাস তরল কণ্ঠে কথাগুলো বলে হার্বাট বেরিয়ে যায় তার কর্মস্থলে।

বেলা এগিয়ে চলে। নাঃ, টাকার কোনও চিহ্ন নেই। সব ব্যাপারটাই বাজে। শ্রীমতী হোয়াইট বলল, 'হার্বাট ফিরে এসে কি রকম ঠাট্টাই না করবে।'

'কিন্তু বিশ্বাস কর, কাল জিনিসটা আমার হাতে এমন নড়ে উঠল যে ভাবতেই কেমন লাগছে।'

'ওটা তোমার মনের ভুল।'

'হবেও বা।'

হঠাৎ দেখা গেল তাদের বাড়ির বাইরে একটা লোক কেমন যেন অদ্ভুতভাবে দাঁড়িয়ে। সে ইতস্ততঃ করছে বাড়িতে ঢুকবে কি না। অবশেষে জোর করেই সে ঢুকে পড়ল। কি মজা, দুশো পাউণ্ড বুঝি আসছে এবার।

শ্রীমতী হোয়াইট লোকটাকে ঘরে আনল। সে কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে, কি যেন বলতে চাইছে অথচ বলতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে সে বলল যে, সে হার্বাটের কারখানা থেকে আসছে।

এরা চমকে উঠল—হার্বাটের কিছু হয়েছে নাকি!

লোকটা বলল যে, হার্বাট মেসিনে আটকে যায় এবং মারা যায়। কোম্পানি এদের শোকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধা স্থির সান্ত নিষ্প্রাণ মৃতবৎ দাঁড়িয়ে, তাদের মুখ সাদা বিবর্ণ, অসহ্য বেদনায় ক্লিষ্ট।

লোকটা বলে চলল, 'কোম্পানি দুর্ঘটনার দায়দায়িত্ব অস্বীকার করছে। তবু

হার্বার্টের কর্মনিষ্ঠার কথা স্মরণ করে তার বাবা-মাকে সামান্য ক্ষতিপূরণ দিতে চায়।'

হোয়াইট শুষ্ক বিবর্ণ স্বরে প্রশ্ন করল, 'কত?'

'দুশো পাউণ্ড।'

শ্রীমতী হোয়াইট একটা অস্ফুট আর্তনাদ করে পড়ে গেল, হোয়াইট শুষ্ক হেসে হাত তুলল অন্ধের মতো, তারপর অচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

দু-মাইল দূরের কবরখানায় তাদের একমাত্র সন্তানকে সমাহিত করে দুই বিষণ্ণ যন্ত্রণাকাতর নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ নরনারী ফিরে এল অন্ধকার আর স্তব্ধতায়। ব্যাপারটা তারা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের কেমন যেন আশা যে আবার হার্বার্ট ফিরে আসবে, সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে, তাদের দুঃখের অবসান ঘটবে।

কিন্তু কিছুই ঘটল না, নির্জন নিস্তব্ধতা ধূসর বিষণ্ণতা নিবিড় অন্ধকার তাদের সত্তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সইতে পারছে না তারা এই অসহ্য জ্বালা। ঘন কালো রাত নেমেছে। বৃদ্ধা মা জানালার ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, ছেলের জন্যে অঝোরে ঝরছে চোখের জল। হোয়াইট বিষণ্ণ ব্যথিত হাতে তাকে নিয়ে আসে শয্যায়। সেও তো সইতে পারছে না কোনও কিছু।

হঠাৎ বৃদ্ধা চিৎকার করে ওঠে, 'বাঁদরের থাবাটা কোথায়? আমরা এখনও আরও দুটো জিনিস চাইতে পারি!'

'হায় ভগবান, তোমার এখনও শিক্ষা হল না!'

'না, না, আমি আমার ছেলেকে চাই, তুমি বাঁদরের থাবার কাছে আমার ছেলেকে চাও, আমি ওকে দেখতে চাই।'

তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা গেল না।

বিমূঢ় উদ্‌ভ্রান্ত আতঙ্কিত হোয়াইট নিয়ে এল বাঁদরের থাবাটা। তার স্ত্রী চিৎকার করে বলতে লাগল, 'দাও আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দাও!'

হোয়াইট হাত তুলে বলল, 'আমার ছেলে আবার ফিরে আসুক।'

হাত থেকে ছিটকে পড়ল থাবাটা। হোয়াইট কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে মুখ ঢেকে বসে রইল। শ্রীমতী হোয়াইট জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। বাইরের দিকে অনিমেষ নয়নে চেয়ে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। না, কোনও সাড়াশব্দ নেই। ব্যাপারটা মিথ্যেই। বাঁচা গেল, মরা ছেলে ফিরলে কি ভয়ংকর কাণ্ড ঘটবে! আগেরটা মিলেছিল নেহাৎ কাকতলীয়ের মতো।

হঠাৎ বাইরের দরজায় আস্তে ধাক্কা!

আবার!

চমকে উঠল হোয়াইট!

তৃতীয়বারের শব্দ বেশ জোরে শোনা গেল। হোয়াইট শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল। বৃদ্ধা চমকে উঠল—কে!

'ইঁদুর শব্দ করছে।'

'না, না। হার্বাট এসেছে।'

সে দরজার দিকে ছুটল। হোয়াইট আটকাল।

'হার্বাট এসেছে, আমার হার্বাট। ওকে দু-মাইল পথ আসতে হয়েছে, তাই এত দেরী হল। তুমি আমায় ধরলে কেন? ছেড়ে দাও। আমি নীচের দরজা খুলব।'

হোয়াইট কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'ভগবানের দোহাই, ওকে ভেতরে আসতে দিও না।

আবার দরজায় জোরে শব্দ! আবার!

শ্রীমতী হোয়াইট নিজেকে ছাড়াবার আপ্রাণ প্রয়াসে চেঁচিয়ে উঠল—'তুমি নিজের ছেলেকে ভয় পাচ্ছ! আমাকে ছেড়ে দাও। আমি যাচ্ছি হার্বাট, আমি যাচ্ছি।'

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল বৃদ্ধা। তলায় দরজায় ছিটকিনি দেওয়া। হাত যাচ্ছে না। সজোরে দ্রুত একটা চেয়ার টেনে নিল সে। হার্বাট! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে!

উদভ্রান্ত অস্থিরতায় হোয়াইট খুঁজছে থাবাটাকে। হাতড়াতে হাতড়াতে পেল ওটা। আবার দরজায় ধাক্কার প্রবল শব্দ। ছিটকিনিটাও প্রায় খুলে গেছে। আর সময় নেই। ভয়ংকরকে রোধ করতেই হবে।

বাঁদরের থাবাটা হাতে ধরে হোয়াইট উন্মত্তের মতো উচ্চারণ করল তার তৃতীয় ও অন্তিম বাসনা।

থেমে গেল ধাক্কার শব্দ।

ততক্ষণে খুলে গেছে দরজা। এক ঝলক ঠাণ্ডা হিমেল হাওয়া ছুটে এল, কাঁপিয়ে দিল ভেতরের হাড়কে। বেদনায় হতাশায় আর্ত চিৎকার করে উঠল শ্রীমতী হোয়াইট।

সামনের রাস্তা নির্জন নিস্তব্ধ। খালি ম্লান স্তিমিত আলোটা থরথর করে কাঁপছে।

গ্লাবডাবড্রিবের রোমাঞ্চ

জোনাথন সুইফট

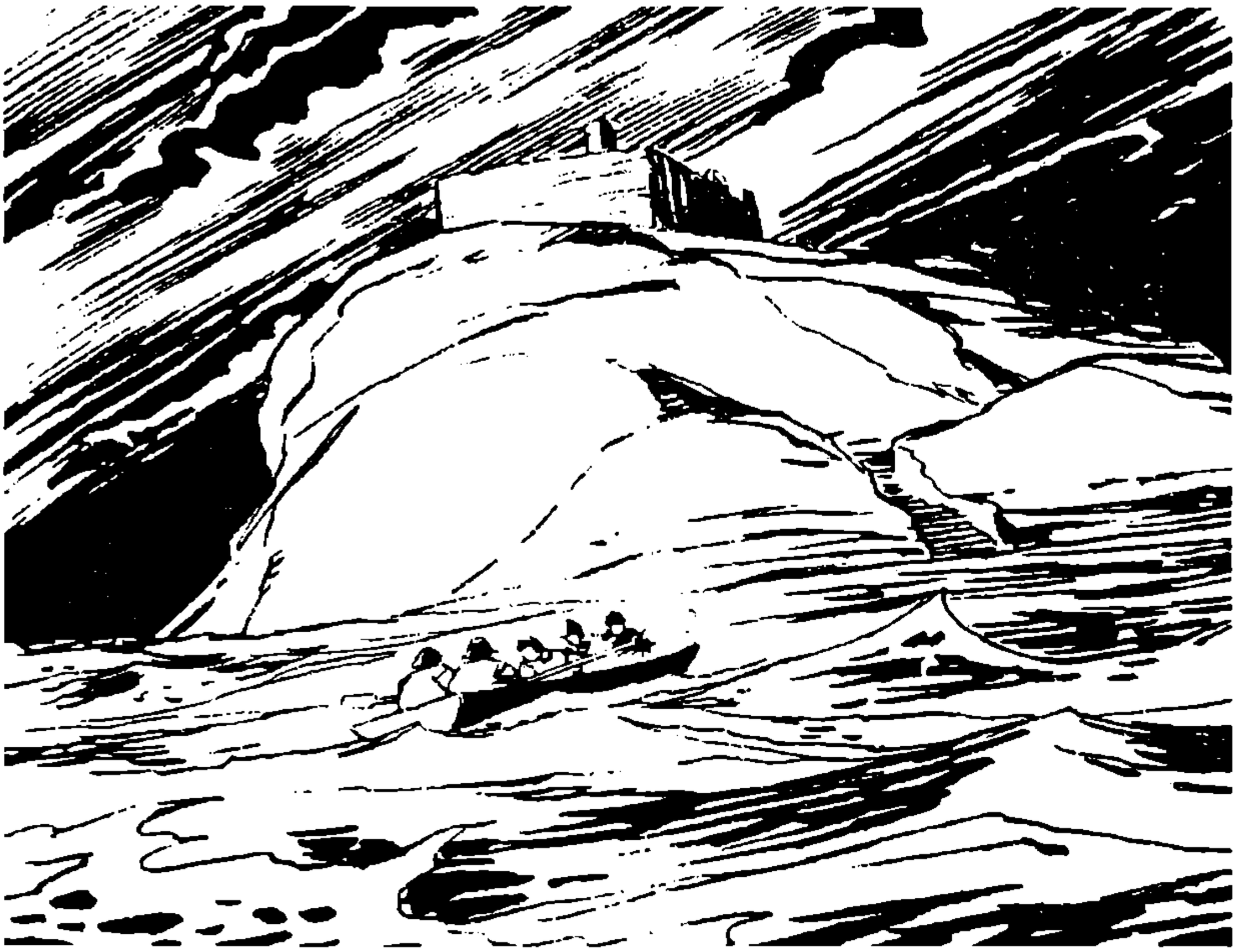

এ রাজ্যটি সেই মহাদেশের অংশ যেটি চলে গেছে পুব দিকে আমেরিকার অচেনা অজানা পথ ধরে ক্যালিফোর্নিয়ার পশ্চিমে, প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরে এবং এটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দর শহরে আর বাণিজ্য কেন্দ্র লাগোয়া থেকে দেড়শ মাইলের বেশি দূরে নয়। লাগাদোর অন্তর্গত বিখ্যাত সেই দ্বীপ লাগনাগ। লাগনাগের রাজা আর জাপ সম্রাটের মধ্যে সুনিবিড় সখ্যতা থাকায় উভয় দেশের নাবিকেরা স্বচ্ছন্দে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাতায়াত করে। আমি তাই স্থির করেছিলাম য়্যুরোপ ফেরার সময় এই পথ ধরেই যাব। আমার মালপত্র বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে দুটি খচ্চর ভাড়া করেছিলাম আর পথ দেখানোর জন্যে সঙ্গে নিয়েছিলাম একজন গাইড।

অতঃপর যাত্রা শুরু হল। ম্যালডোনাভা বন্দরে পৌঁছে দেখি সেখানে কোন জাহাজ নেই। বড় শহর এটি। পরিচিত কয়েকজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল

অপ্রত্যাশিত ভাবেই, ফলে বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা মিলল। বিশিষ্ট এক ভদ্রলোক আমায় বললেন, 'এক মাসের আগে জাহাজ মিলবে না। এক কাজ করুন, এই সময়টায় ছোট্ট দ্বীপ গ্লাবডাবড্রিবে, ঘুরে আসুন।' তিনি এবং তাঁর এক বন্ধু আমার সঙ্গে যেতে রাজী হলেন।

গ্লাবডাবড্রিবের অর্থ করলে দাঁড়ায় 'ঐন্দ্রজালিকের দ্বীপ।' দ্বীপটি ছোট কিন্তু উর্বর আর ফলোৎপাদী। সেখানে প্রত্যেকেই জাদু জানে আর রাজত্ব করেন জাদুকরদের রাজা। বিভিন্ন দলের মধ্যে তাদের বিবাহ সম্পাদিত হয়। বয়জ্যেষ্ঠরাই রাজ্য পরিচালনা করে থাকেন। রাজপ্রসাদটি বিশ ফুট উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত এবং তিন হাজার একর জমির ওপর অবস্থিত। ভেতরে একটা বাগান রয়েছে। সেখানে ছোট ছোট খোঁয়াড়ের কোনটিতে থাকে গবাদি পশু, কোনটিতে মজুত থাকে রকমারি শষ্য আর কিছুটা জায়গা উদ্যানের জন্য সংরক্ষিত।

রাজপরিবারের সেবায় নিযুক্ত যারা, তারা কেউই রক্তমাংসের মানুষ নয়—সকলেই ভূত-প্রেত। রাজা চব্বিশ ঘন্টা তাঁর সেবার জন্যে বিদেহী আত্মাদের ডেকে আনেন ঠিকই, কিন্তু একই আত্মাকে বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলে তিন মাসের আগে তিনি ডাকতে পারেন না।

দ্বীপটিতে পৌঁছেছিলাম বেলা এগারটায়। আমার সঙ্গী সেই ভদ্রলোক প্রবেশাধিকার এবং আতিথ্য লাভের উদ্দেশ্যে রাজার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। সজ্জিত ফটকের ভেতর দিয়ে আমরা প্রবেশ করলাম। দুধারে দাঁড়িয়ে আছে সান্ত্রীরা। তাদের অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সজ্জা এবং পোষাক পরিচ্ছদ দেখে কেমন যেন গা ছম্ ছম্ করছিল—মনে হচ্ছিল অতীতের গহ্বর থেকে উঠে এসে যেন তারা দাঁড়িয়েছে সার বেঁধে। চোখ-মুখে তাদের কেমন যেন একটা রহস্য। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে গেল, একের পর এক মহল পার হয়ে আমরা এগোতে লাগলাম। একই ধরনের সান্ত্রীরা দাঁড়িয়ে আছে প্রতিটি মহলের দুধারে। অবশেষে আমরা এলাম রাজার কাছে। দু-একটি খুঁটিনাটি প্রশ্ন করলেন তিনি। সিংহাসনে ওঠার সিঁড়ির কাছে রয়েছে তিনটি টুল। বসতে বললেন তিনি।

আমার কাছে তিনি আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানতে চাইলেন। আঙুলি সংকেত করলেন তিনি। ভৃত্যেরা সব মিলিয়ে গেল। মনে হল আমি যেন স্বপ্ন

দেখছি। ভয় পেলাম। রাজা বললেন, 'কোন ভয় নেই।' আমার সঙ্গীদের এসব দেখার সুযোগ মিলেছে বহুবার। সাহস ফিরে পেলাম। বার বার তাই পিছন ফিরে তাকাচ্ছিলাম। অবশেষে শুরু করলাম আমার ভ্রমণ কাহিনী।

আমার সম্মানে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন রাজা। একদল ভূত মাংস পরিবেশন করছিল, খাওয়ার তদারক করছিল। ইতিমধ্যেই অনেকটা সাহস সঞ্চয় করেছি তাই ওদের দেখে সকালের মত ভয় পেলাম না। সন্ধে পর্যন্ত রাজপ্রাসাদে থাকলাম এবং সবিনয়ে রাত্রি যাপনের সনিবন্ধ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলাম। দ্বীপটির রাজধানী ছোট। শহরটির একটি নিরুপদ্রব গৃহস্থ বাড়িতে রাত কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলায় গেলাম রাজার কাছে। এই ভাবে অতিবাহিত হল দশ দিন। দিনের অধিকাংশ সময় আমরা রাজার সান্নিধ্য উপভোগ করতাম আর রাত কাটাতাম সেই গৃহস্থ বাড়িতে। বিদেশীদের সঙ্গে দৃঢ় হল বন্ধুত্ব।

রাজা একদিন বললেন, 'আমি যদি ডাকি তাহলে সঙ্গে সঙ্গেই যে কোনও মৃত ব্যক্তির আত্মা এসে হাজির হবে—তা সে যত দিনের পুরনো মানুষের আত্মাই হোক না কেন?'

আমি তাদের যে কোনও প্রশ্নই করতে পারি, তবে হ্যাঁ ঘটনাটি তার সময়ে ঘটা চাই। আর তারা যা বলবে তাই বিশ্বাস করে নিতে হবে, কেন না তাদের কাছে মিথ্যের কোন স্থান নেই।'

যে ঘরে আমরা ছিলাম সেখান থেকে পার্কটিকে স্পষ্ট দেখা যায়। জাঁকজমক পূর্ণ কিছু দেখার ইচ্ছে হল। রাজাকে বলি, 'আরবেলা যুদ্ধের পর সৈন্যদলের পুরোভাগে মহামতি আলেকজাণ্ডারকে দেখতে চাই।' রাজার নির্দেশে আবির্ভূত হলেন আলেকজাণ্ডার। গ্রীক ভাষায় দক্ষতা আমার সামান্যই। যেটুকু বুঝলাম তা হলো দিগ্বিজয়ী সেই বীর বলছেন যে বিষক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়নি, অতিরিক্ত সুরা পানই তাঁর মৃত্যুর কারণ।

দেখলাম হানিবলকে। আল্পাস পেরিয়ে আসছেন তিনি। হায়রে! তাঁর কথায়, তাঁবুতে তাঁর এক ফোঁটা ভিনিগারও ছিল না। সিজার আর পম্পেকে দেখলাম। তাঁরা তাঁদের সৈন্য পরিচালনা করছিলেন। সিজারের শেষ বিজয় এবং রোমের আইনসভা প্রত্যক্ষ করলাম। আমার চোখের সামনে ধীরে ধীরে ভেসে উঠল রাজকীয় সেই আইনসভা।

একটি কক্ষে বীর এবং দেবোপম ব্যক্তিদের সম্মেলন, অপর কক্ষটি দেখে মনে হল সেখানে জমে উঠেছে চোর জুয়াচ্চোর আর পকেটমারদের আড্ডা। আমার অনুরোধে রাজা সিজার এবং ব্রুটাসকে আমাদের সামনে আসতে বললেন। ব্রুটাসকে দেখে হৃদয় আমার শ্রদ্ধায় ভরে উঠল। তাঁর অনড়-অটল মনোভাব, দেশপ্রেম আর লোকহিতৈষণা তাঁর সারা দেহে ফুটে উঠেছে। মনে হল তাঁর প্রতি সিজারের কোনও ক্ষোভ নেই। পারস্পরিক ভাব বিনিময় এবং সান্নিধ্যের উষ্ণতায় বেশ ভালোই আছেন তাঁরা। সিজার তো আমায় বলেই ফেললেন, যে তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব অনেক উপাধি গ্রহণের সমতুল্য নয়, তার গৌরবগুলি ছিনিয়ে নেবার। ব্রুটাসের সঙ্গেও কথা বলার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমায় তিনি বললেন যে, তার সাথেই থাকতেন এবং পৃথিবীতে এদের সমকক্ষ আর কেউ জন্মায়নি। প্রাচীনকালের এই সমস্ত বিখ্যাত লোকদের কার্যকলাপের বিবরণ দিয়ে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না।

বলতে চাই শুধু যে অত্যাচারী, ক্ষমতালিপ্সু এবং স্বাধীনতা অপহরণকারীদের যাঁরা ধ্বংস করেছেন তাঁদের দেখে ধন্য হয়েছি আমি। পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য এ বর্ণনা তুলে ধরে আমি যে কি আনন্দ পেলাম তা বোঝাতে পারব না।

সবুজ ভূতের কাহিনী

রোজমারী টিম্‌পারলে

সত্যিকথা বলতে কি ডাক্তারের ক্লিনিকে বসে যে সব গোপন খবর পাওয়া যায় তা আর কোথাও পাওয়া যায় না। হ্যাঁ আর জ্যোতিষীর চেম্বারও তো মানুষের গোপন কথা প্রকাশের একটা জায়গা।

তবে ডাক্তার আর জ্যোতিষীর কাছে অনেকেই, অনেক তাবড় তাবড় লোকও তো গোপন কথা বলে। আমরা পুরনো দিনের এক খ্যাতনামা ডাক্তারের ‘‘কেস হিসট্রি’’ থেকে একটি গল্প তুলে ধরব। সেদিনের গল্পটি স্যার ওয়াল্টার স্কটের কাছ থেকেই শোনা। স্কট সাহেব তাঁর পুরনো ডাক্তার বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছিলেন। আর গোপনীয়তা রাখতে তারা কোনও রুগীর নাম বলেন নি সেদিন।

রুগী বলল, ‘এটা সেই সবুজ শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কিছু নয় ডাক্তার বাবু।’

ডাক্তার, 'সবুজ শয়তানটা আবার কী বস্তু?'

রুগী, 'আমি ঠিক জানি এটা কী? কিন্তু এঁদের জানি না। তবে এঁরা একদল লোক সদা সর্বদা সবুজ জামা কাপড়ে সজ্জিত হয়ে আসে। এরা সদা সর্বদা নাচানাচি করে। ড্রয়িংরুম থেকে ডাইনিংরুম সব জায়গায় এদের অবাধ গতি। নানাভাবে নানা ভঙ্গীতে এরা নাচে। আমি যখনই ঘরে যাই নাচতে নাচতে এগিয়ে আসে। আসবাবপত্র জামা কাপড় সব কিছু আসে-পাশে নেচে চলে। আমি ঘরে ঢুকলেই এদের দেখি।'

ডাক্তার, 'আপনি বড্ড নেশা করছেন। অত খাবেন না।'

তখনকার দিনে যারা মদ খেয়ে নানা রকম স্বপ্ন দেখত তাদের বলা হত 'নীল শয়তান'। এখানে ডাক্তার ঠিক আন্দাজই করেছে। তবে রং একটু আলাদা। নীলের জায়গায় সবুজ। ডাক্তার ঠিকই ভাবছে—কারণ রুগীটি যথেষ্ট বিত্তবান। থাকে এক নির্জন এলাকায়, মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে। তার দুটো বাড়ি। একটা খুব সাজান গোছান শহুরে বাড়ি। আর একটা নির্জন এক গ্রামে বিরাট পুরনো আমলের এক বাগান বাড়ি। তবে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে কয়দিন শান্তভাবে, সাত্বিকভাবে বাস করুন। সেখানে মদ খাবেন না। সকাল সকাল ঘুমোবেন আর সকাল সকাল উঠবেন। সকালে প্রাতঃভ্রমণ করবেন। দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

মদটা ছাড়ুন দেখবেন সবুজ শয়তান আপনাকে ছেড়েছে। রুগীটি ডাক্তারের কথা শুনে খুশি হয় নি। সে এমন ভীত হয়ে পড়েছিল যে, একথায় তার মনে শান্তি আসে নি। তবে সে ডাক্তারের কথা মত গ্রামের বাড়িতে চলে গেল। আর কয়দিন সাবধানে ডাক্তারের কথা মত থাকার ফলে তার এসব উপসর্গ কেটেও গেল। মাসখানেক পর সে ডাক্তারকে চিঠি লিখল। সে গ্রামে এসে ভালই আছে। চিঠির ভাষায় ধৈর্য আর কৃতজ্ঞতার ছাপ। সে পরিস্কার লিখেছে— সে ভাল আছে। সবুজ শয়তান-টয়তান আর তাকে জ্বালাতন করে না। সে গ্রামে এসে, তোফা আছে। রুগীটি এই নতুন জীবনে এমন সন্তুষ্ট হয় যে, সে ঠিক করে ফেলল শহরের বাড়ি বিক্রি করে গ্রামেই স্থায়ী ভাবে থাকবে। গ্রামের শান্ত, স্নিগ্ধ

পরিবেশ তাকে নতুন জীবন দিয়েছে। প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর গ্রামের সরল ও স্বাভাবিক জীবন্। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে তার মন প্রাণ ভরে গেছে।

গ্রামকে, এই গ্রামের সরল অনাড়ম্বর মানুষগুলোকে সে ভালবেসে ফেলেছে। শহরের ভোগ বিলাস আর সম্ভোগ যেন আর তার ভাল লাগছে না। সে প্রাকৃতিক ক্রোড়ে বাকি জীবনটা শান্তিতে কাটাতে চায়।

তাই সে খোঁজ খবর করে ভাল দামেই শহরের বাড়িটা বিক্রি করে দিল। তবে বাড়ি বিক্রি করলেও সে শহরের বাড়ির আসবাবপত্র বিক্রি করল না। এগুলিকে সে অনেক খরচা করে বেঁধে-ছেঁদে গ্রামের বাড়িতে চালান করে দিল।

অনেক কসরত করে অনেক খেটে-খুটে লোক-লস্কর লাগিয়ে সে গ্রামের বাড়িতে এই সব দামী শহুরে আসবাবপত্রগুলিকে সাজাল।

নতুন পরিবেশে আসবাবপত্রগুলিকে ঘরে ঘরে সজ্জিত দেখে তার আনন্দ যেন আর ধরে না। এরপর কাজের লোকজনও সব চলে গেল। কেবল সে তার নতুন পরিবেশে আসবাব পত্রগুলোকে কেমন লাগছে তা নানা কোণ থেকে নিরীক্ষণ করে আহ্লাদিত বোধ করতে লাগল।

কিন্তু হায় আবার একি! সে কি দেখছে। আবার সেই সবুজ ভূত। আবার এরা সকলে এসেছে। এ যে সেই শহরের বাড়ির ঘটনার পুনরাবৃত্তি। একি হল! অবশেষে এরা (সবুজ ভূতরা) আবার এসে হাজির হয়েছে নাকি? প্রথম প্রথম এরা একটু আবছা ভাবে আসতে থাকে। ধোঁয়াটে অবয়ব নিয়ে এরা এগোতে থাকে। এর পর আর আবছা নয়। পরিষ্কার ভৌতিক অবয়ব নিয়ে নাচতে নাচতে সবুজের এক মেলা লেগে গেল।

সবুজ ভূত সবুজের পোষাকে সেজে-গুজে আসবাবপত্রের মাঝে নাচতে থাকে। আবার কোথায় যেন হারিয়ে যায়। সবুজভূতগুলো মনের আনন্দে সেই রুগীটিকে আবার তাদের কাছে পেয়ে হাত তুলে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে থাকে।

আমরা আবার সবাই এখানে জড়ো হয়েছি। তারা একসুরে নাকি সুরে গাইতে থাকে গান। ফলে রুগীটির শান্ত নিরিবিলি সুখের জীবন আবার নষ্ট হয়ে গেল।

বিধ্বস্ত হয়ে গেল। রুগীটি ভয়ে আতঙ্কে কম্পমান। তার ডাক্তার জানে না যে, তার রুগী আবার কি অবস্থায় পড়েছে। ডাক্তার নিশ্চিন্তে আছে। কারণ তার রুগী আর আসে নি। আর ওই যে চিঠি দিয়েছে। তারপর আর কোনও চিঠি দেয়নি। ফলে ডাক্তার জানতেও পারে নি যে আবার তার রুগীটি কি বিপদেই না পড়েছে। ভূতগুলোও লোকটিকে ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। আর অনুসরণ করছে তারা ওই আসবাবপত্রের ভিতর থেকে বের হয়ে তা আর কয়জনই বা জানে। সে ত এসব কিছু বুঝে উঠতেই পারছে না। আসবাবপত্রগুলোতেই যে এই ভূতগুলোর জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ। এগুলোকে কেন্দ্র করেই যে তাঁদের আবর্তন, বৃদ্ধি-শ্রীবৃদ্ধি তা ডাক্তারও জানে না। রুগীটিও বোঝে না। আর এই রকম ভিক্টোরিও পুরনো প্রাসাদ আর আসবাবপত্রের মধ্যে কত যে ভৌতিক ক্রিয়াকান্ড লুকিয়ে আছে তার খবর কেই বা রাখে।

যুগযুগান্তরের দীর্ঘশ্বাস ধুলি ধুসরিত আসবাবপত্রের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আর সময় সুযোগ বুঝে আক্রমণ করছে। এর থেকে যেন কারও নিস্তার নাই। দিনের পর রাত আসে, আবার রাতের পর আসে দিন। সূর্য ওঠে। সূর্য ডোবে। কিন্তু এদের নাচের যেন শেষ নেই। অমাবস্যা থেকে পূর্ণিমা। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই যেন এদের সমান আবির্ভাব। প্রতিদিন প্রতি রাত যেন এদের আগমনের অপেক্ষায়, বসে আছে। যুবকটিকে আবার এই নতুন পরিবেশে পেয়ে যেন এরা একেবারে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে। এঁরা যেন এদের নাচের ছন্দ, নাচের ভঙ্গী আরও উন্নত করেছে। আগে কেবল মাথা দুলাত। এখনও এরা দেহের নানা অঙ্গভঙ্গী করে নাচতে থাকে।

কখনও কখনও এরা ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে কথাও বলে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে এর-ওর গায়ে। এদের দেহের কোন্ অংশ যে কখন উধাও হয়ে যায় তারও কোন ঠিকানা নেই। হঠাৎ দেখা গেল কোন একটা ভূতের বা পেত্নীর মাথাটা আস্তে আস্তে যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু দেহটা ঠিক আগের ভঙ্গী করেই নেচে যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকুনি বা দুলুনি যেমন ছিল তেমনি! এখন ঘাড়ে মাথা নেই, কিন্তু ঘাড়টা যেন সেই একই দুলুনিতে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আর নাচের ভঙ্গীর সাথে তাল রেখে দুলছে। নাচের ভঙ্গীতে কখনও বা

ফুটে ওঠে বলড্যান্সের ছাপ, কখনও বা ব্যালেট। যুবকটি প্রতিরাত্রির প্রতিদিনের এই ঘটনায় আস্তে আস্তে এমনই অভ্যস্ত হয়ে গেল, যেন সে এ সব কিছুর অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। কে যেন এঁদের দিকে তাঁকে টানছে। আর এই সবুজ ভূতের নাচের আবেগ আর উত্তেজনা যেন তার মনেও এক আবেগ সৃষ্টি করছে।

এই সব ভূত পেত্নীদের আমোদ আহ্লাদ, ঢলাঢলি, সব কিছু যেন তাঁর যুবক মনেও। তার নিঃসঙ্গ জীবনে—তার নারী সঙ্গহীন জীবনে যেন এক নতুন স্বাদের ছোঁয়া দিচ্ছে। আস্তে আস্তে যেন সেও তাদের দলের একজন হয়ে উঠছে। হয়ত সে এই বিদেহী জগতেরকোনও এক অংশের সাথে পুরুষানুক্রমে জড়িত। তাই এ থেকে তাঁর মুক্তি নাই। মুক্তি সে আর চায়ও না।

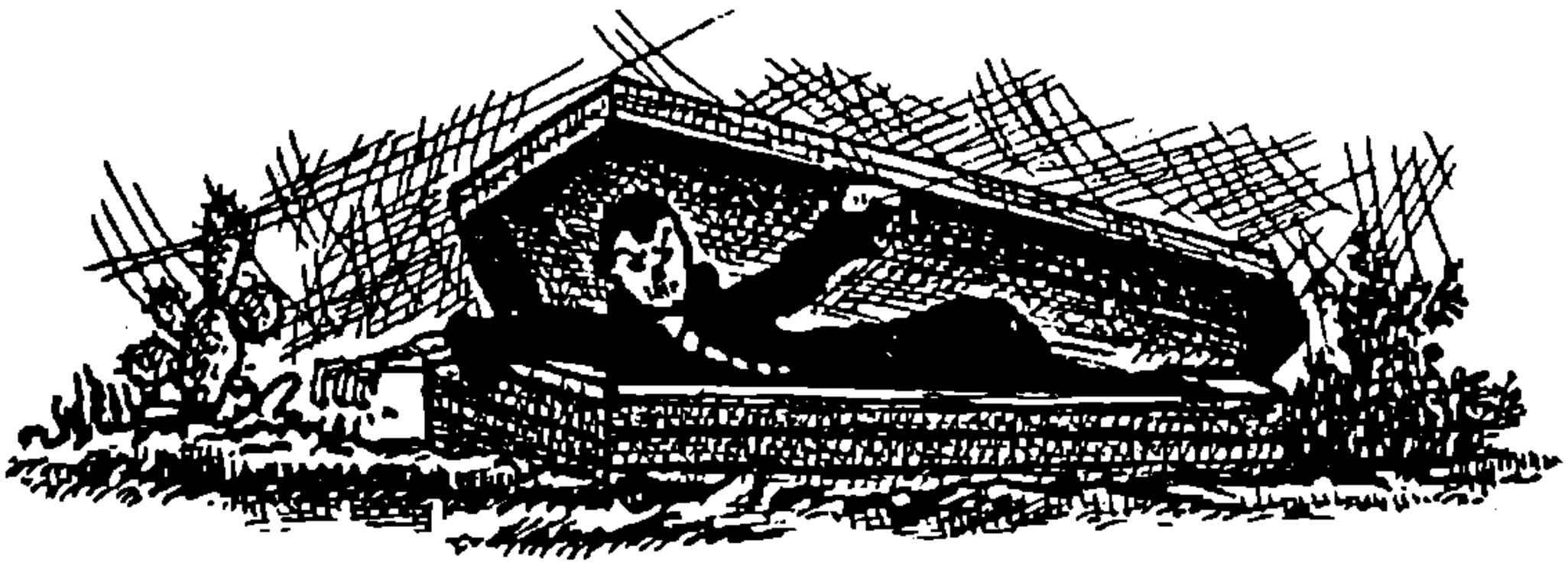

বিভৎস সেই লোকটি

হেলেন পিড্‌ডক

অনেক সময় অনেক ভূতের আবির্ভাব ঘটে মাত্র একটা কারণে, যে তারা চুপ করে থাকতে পারে না। যেসব মানুষ তাদের জীবদ্দশায় কোনও রোমহর্ষক কাজ করেছে। অথবা যাদের কোনও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে তারা বার বার সেই দুর্ঘটনার স্থানে ফিরে ফিরে আসে। কিন্তু অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে ভূত কোন একটা গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যেই এগিয়ে এসেছে।

সে ১৮৮০ সালের কথা। লর্ড ডাফরিন নামে জনৈক উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক (যিনি একদা ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেলও হয়েছিলেন) আয়ারল্যান্ডে কিছুদিনের ছুটি কাটানোর জন্যে গিয়েছিলেন। ব্যস্ত কর্মচঞ্চল জীবনে কয়েকদিনের ছুটি কাটানো তো একটা সুখপ্রদ দুর্লভ অভিজ্ঞতা। তাই ডাফরিন সাহেব আয়ারল্যাণ্ডের গ্রাম্য জীবনের শান্ত সমাহিত এক সুষমার স্পর্শে কয়েকদিনে নিজেকে সতেজ করে নিতে ব্যস্ত। সকাল থেকে সন্ধে এই গ্রাম্য

পরিবেশ গাছ-গাছালি ঘেরা পথে ঘোরা ফেরা করেন। আর রাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে হোটেলে নিজের ঘরে ঘুমিয়ে পড়েন। একদা তিনি গভীর নিদ্রা থেকে হঠাৎ চমকে জেগে ওঠেন। সাধারণতঃ তাঁর ঘুম ভালই হয়। ঘুমের ব্যাঘাত তার প্রায় হয় না বললেই চলে।

তাই হঠাৎ অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তিনি নিজেই একটু অবাক হলেন। আরও আশ্চর্য বোধ করলেন যখন তার আর ঘুম আসছে না বলে তিনি বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন। কারণ ব্যস্ত সমস্ত কর্মচঞ্চল জীবনে নানা কুটনৈতিক ক্রিয়াকর্মের শেষেও ঘরে ফিরে গভীর নিদ্রায় তিনি আবির্ভূত হয়ে থাকেন না। নিদ্রাহীনতা তার কোনও দিনই জীবনে ঘটে নি। ঘুম ভেঙ্গে আর ঘুম না আসায় তিনি ঘুম ভাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে নিযুক্ত হলেন। ঘুম ভাঙ্গার আওয়াজ বা শব্দ বা অন্য কোনও কারণই খুঁজে পেলেন না।

এবার আরও বেশিক্ষণ ধরে ঘরে বিছানায় পড়ে থেকে লাভ নেই। ফলে ডাফরিন সাহেব বিছানা থেকে উঠে এবার জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে থাকলেন।

সে দিন ছিল পূর্ণিমার রাত। চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙ্গেছে। চারদিক চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত। আকাশে তারাগুলি জ্বলজ্বল করে তখনও জ্বলছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে নিচের দিকে তাকাল। নিচে একটা বিরাট তৃণ আচ্ছাদিত খেলার মাঠ। আর যখন সেদিকে তাকান তখন দেখছেন যে, একটা অপরিচিত মানুষ মাঠের উপর দিয়ে ঘাসের গালিচা বিছান পথে হেঁটে এগিয়ে আসছে। লর্ড ডাফরিন বুঝল যে তখনও প্রাতঃভ্রমণের সময় হয় নি। ফলে যে লোকটি ঘাসের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে তাকে আরও ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, লোকটি একটি কিম্ভূত কিমাকার গোছের। আরও ভাল করে দেখে বুঝল সে, যে কেবল কুৎসিত দর্শনই নয়, তার পিঠে একটা বিরাট কুঁজ আছে। আর এই কুঁজ বিশিষ্ট কিম্ভূত মানুষটার পিঠে একটা যেন কিসের মস্ত বোঝাও চাপান আছে।

লোকটি রাতে লনের ওপাশ থেকে হোটেলের দিকে আসতে দেখে লর্ড স্বাভাবিক ভাবে একটু অধিক কৌতূহলী হয়ে পড়লেন। তাড়াতাড়ি জামা জুতো

পরে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গিয়ে একেবারে হোটেলের বাইরে লনের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। দেখেন, সেই লোকটি একটা কফিনের মতো বস্তু ঘরের উপর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে আসছে। তিনি চিৎকার করে বললেন, কফিন বাক্সে তোমার কি আছে?

তার এই চিৎকার শুনে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সাহেবের দিকে সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

ডাফরিন সাহেব গভীর রাতে নিস্তব্ধ মাঠে এই লোকটির চোখের দিকে তাকিয়ে খুবই ঘাবড়ে গেলেন। লোকটির চোখে মুখে একটা দারুন বিভৎসতার ছাপ—না ডাফরিনকে ক্ষণিকের জন্য ভয়ে সচকিত করে তুলল। এমন কুৎসিত আর কদর্য ভয়াবহ মানুষের সম্মুখীন কখনও হন নি।

লর্ড ডাফরিন পর মুহূর্তেই সম্বিত ফিরে পেলেন। সাহস করে আবার তাকে সেই একই প্রশ্ন করতে উদ্যত হলেন। কিন্তু হায় কোথায় সেই লোকটি! সে মুহূর্তের মধ্যে যেন কোথায় হারিয়ে গেল। লোকটি ও তার কফিন কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। লর্ড ডাফরিন খুবই বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত বোধ করতে লাগলেন। কাকেই বা বলেন এসব কথা। কাউকে বললেও তো আর বিশ্বাস করানো যাবে না।

আর তার মত একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ কি করেই বা লোককে এমন একটা অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য কথা বলেন। ফলে মনে মনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়লেও তিনি এ গল্প কাউকেই আর বলতে সাহস পেলেন না। কারণ এসব কথা বলে খেলো হওয়ার মতো ব্যক্তি তিনি নন। তিনি বহু উচ্চ ও গুরুত্বপূর্ণ রাজপদে দেশে ও বিদেশে কাজ করেছেন। তাঁর মত ব্যক্তি কিভাবেই বা এমন সব অদ্ভুত ঘটনার কথা অন্য লোকেদের বলেন। তবে মনে মনে অনেক দিন ধরেই এই লোকটির মুখ তার চোখে ভেসে উঠত। তিনি তার স্ত্রী ছাড়া আর কাউকেই একথা বলেন নি। তাঁর স্ত্রীও একথার তেমন গুরুত্ব দেন নি।

তার ধারণা চোখের ভুলে লর্ড সাহেব এসব দেখেছেন। এছাড়া তাঁদের মত সৎ ও সম্ভ্রান্ত খাঁটি ক্রিশ্চানদের পক্ষে ভূত-প্রেত দেখাও মহাপাপের, মহা অপমানের।

অনেকদিন চলে যাওয়ার পর লর্ড ডাফরিনের স্মৃতি থেকে ব্যাপারটা প্রায় মুছেই গেছে।

কিছুদিন পর, বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে, এবার তাঁকে প্যারিসে এক পাঁচতারা হোটেলে একটা কূটনৈতিক সম্মেলনে যেতে হয়েছে। তিনি হোটেলে ঢুকে রেজিস্ট্রি বইয়ে নাম লিখিয়ে যেই তাঁর সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে লিফটের দিকে এগোতে যাচ্ছেন, দেখলেন লিফটের ঘরে ঢোকার দরজা খোলা আর লিফটম্যান লোকটিও দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। এবার একটু এগিয়ে লিফটের সামনে আসতেই লর্ড ডাফরিন তার জীবনের দ্বিতীয় ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখলেন—জীবনের এক বিরাট ধাক্কা দ্বিতীয় বারের মতো তিনি পেলেন। দেখলেন সেই ভীষণ দর্শন কুৎসিত লোকটি লিফটের দরজা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখেই তো লর্ড চমকে গেলেন। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে সরে পড়লেন সেখান থেকে। তাঁর ব্যক্তিগত সচিব তাঁকে ডাকলেন। লিফটে উঠতে বললেন। কারণ গুরুত্বপূর্ণ এই কূটনৈতিক সম্মেলনে তাঁর যোগদানে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত লর্ড ডাফরিন সেই যে লোকটির দিকে পেছন ফিরে চলে গেলেন আর সেদিকে তাকালেনই না।

এবার অগত্যা অন্য লোকদের নিয়ে লিফটম্যান লিফটের দরজা বন্ধ করে উপরে যাওয়ার বোতাম টিপলেন। লিফট সজোরে উপরে উঠে গেল। এধারে ভয়ে বিহ্বল হয়ে লর্ড ডাফরিন হোটেলের রিসেপশন অফিসে গিয়ে লিফটের এই কুৎসিত লোকটির সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে লাগলেন।

কিন্তু কেউ তাকে কিছু বলতে পারল না। কেউই কিছু জানে না। কেউই এমন লোককে হোটেলের চত্বরে দেখে নি। লিফটে দেখা তো দূরের কথা।

হোটেলে যারা কাজ করছে তারা কেউ এ সম্বন্ধে কিছুই বুঝতে পারল না।

রিসেপশনে এই সব আলোচনা যখন চলছে ঠিক তখনই একটা ভীষণ শব্দ শোনা গেল।

একটা কিছু ভেঙ্গে পড়ার দুম্‌দাম্‌ আওয়াজ।

সারা হোটেল কেঁপে কি যেন পড়ল। হায়! সেই লিফটটা যখন ঠিক পাঁচ তলায় পৌঁছেচে, সবাই লিফট থেকে বের হতে যাচ্ছে, তখনই লিফটের দড়িটা

কেটে গেল। আর সাথে সাথে ভীষণ শব্দ করে সেই লোকজন সমেত বিরাট যন্ত্রটি পাঁচতলা থেকে একেবারে এক তলায় স্বশব্দে আছড়ে পড়ল। সব ভেঙ্গে চৌচির। মুহূর্তের মধ্যে কি কান্ডই না ঘটে গেল। চারদিকে রক্তারক্তি সমস্ত মানুষই তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

লর্ড ডাফরিন সব দেখে—সব শুনে তো হতভম্ব হয়ে গেলেন। তিনি কিছু বুঝতেই পারলেন না। কি ঘটে গেল—কেনই বা ঘটে গেল। আর কি জন্যেই বা সেই বীভৎস লোকটি তাঁকে ভয় দেখিয়ে লিফটে উঠতে দিল না। কেনই বা সেই এই মর্মান্তিক মৃত্যুর হাত থেকে তাকে রক্ষা করল। এই অনিবার্য মৃত্যুর কবল থেকেই সেই ভীষণ দর্শন মৃত্যুদূত কেনই বা তাকে রেহাই দিল।

হেলেন পিড্‌ডক ঃ যে সমস্ত সাহিত্যসেবী সাহিত্যের সোনালী আঁচড়ে রহস্য সাহিত্য ও অলৌকিক সাহিত্যের অঙ্গনকে সমৃদ্ধ করেছেন হেলেন পিড্‌ডক তাঁদের মধ্যে একজন। ইংরেজি ভাষার বিচিত্রমুখী গতিময়তার বেগ ও আবেগে হেলেন পিড্‌ডক এক অভিনব সংযোজন তাঁর লেখায় খাঁটি রহস্য তথা ভৌতিক গল্পের আস্বাদন পাওয়া যায়।

দি উওম্যানস্ ঘোস্ট স্টোরি

অ্যালগারনন্ ব্ল্যাকউড

অন্ধকার ঘরের কোণে বসে সে বলল, 'আপনারা যদি শুনতে চান তাহলে আমার অভিজ্ঞতার কথা বলব।' একটু থেমে পুনরায় সে বলল 'গল্প বলিয়েরা আবশ্যক অনাবশ্যক কোনও কিছুই বাদ দেয়না আর শ্রোতাদের ওপর কাটছাঁট করে নেওয়ার ভার চাপায়। আমি আপনাদের যেটুকু না বললেই নয় শুধু সেটুকুই একটি শর্তে বলব—গল্প শুনে আমায় কোনও প্রশ্ন করবেন না, কেননা যুক্তিসম্মত কোনও ব্যাখ্যা আমি দিতে পারব না আর আমার সে ইচ্ছেও নেই।

যারা কেবল বলতেই চায় অথচ বলার মত তেমন কিছুই থাকে না তাদের মুখ থেকে ডজনখানেক একঘেঁয়ে বিরক্তিকর গল্প শুনে আমরা হাঁপিয়ে উঠেছিলাম। তাই সানন্দে তার শর্ত মেনে নিলাম। আমাদের মৌনতা সম্মতির লক্ষণ জেনে সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করে—

সে সময়ে আত্মা সম্বন্ধীয় বস্তুবিদ্যায় বিশেষ আগ্রহী ছিলাম আর লন্ডন শহরের আসবাব-পত্র বর্জিত অপরিচ্ছন্ন একটি হানাবাড়িতে রাত্রি যাপনের পরিকল্পনা করেছিলাম। দিনের আলোয় আমি বাড়িটির প্রাথমিক একটা পরীক্ষা সেরে, নিকটেই বসবাসকারী ক্যারে—যে বাড়িটির তদারকি করত তার কাছ থেকে চাবি নিলাম। বাড়িটির সম্পর্কে পল্লবিত কাহিনী আমাকে এতই তৃপ্ত করেছিল যে আমি মনে করেছিলাম অনুসন্ধানের উপযুক্ত এমন বাড়ি আর একটিও বোধহয় মিলবে না। সেখানে ভদ্রমহিলা কিভাবে খুন হয়েছিলেন সেই সব বিস্তৃত তথ্য উপস্থাপিত করে আপনাদের আমি বিব্রত করতে চাই না।

সেদিন রাত এগারটায় সেই হানাবাড়ির সিঁড়িতে অপেক্ষমান লোকটিকে আমি বাচাল কেয়ার-টেকার ক্যারে বলেই মনে করলাম। রাতটা যে এখানে একাই কাটাব আমি তাকে সে কথা জানালাম এবং যে ঘরটিতে সেই ভদ্রমহিলা খুন হয়েছিলেন সেখানে নিয়ে যেতে বললাম। বিড়বিড় করে সে বলল, 'চলুন।'

অন্ধকার হলঘরের ভেতর দিকে আমরা সেই বিশেষ ঘরে এলাম। আধ ব্রাউন বকসিশ দিয়ে তাকে বিদায় করার আগে তার বিবরণ শোনার জন্য প্রস্তুত হলাম। গ্যাস জ্বালিয়ে আমি পালিশ-ওঠা বাদামী রঙের চেয়ারটিতে বসলাম—যেটি ক্যারে স্বল্প ভাড়ায় সরবরাহ করেছিল। কিন্তু লোকটির সঙ্গে চোখাচোখি হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চমকে উঠলাম—এতো সেই তদারককারী বৃদ্ধ ক্যারে নয়! বললাম, 'তুমি তো ক্যারে নও, দুপুরে যার সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম। তুমি কে?'

আমি স্বাধীনচেতা যুবতী; ভূত-প্রেত-আত্মা নিয়ে গবেষণা করি। আমার ভেতর নতুন নতুন অনেক প্রবণতা রয়েছে কিন্তু ফাঁকা ঘরে একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে রাত্রিযাপন আমার রুচিবিরোধী এবং অনভিপ্রেত। আপনারা পুরুষ তাই হয়তো জানেন না যে কোন নির্দিষ্ট সীমার পরে মেয়ের সঙ্গে বিশ্বস্ততা পুরোটাই ভন্ডামি। আমার সাহসে ভাঁটা পড়ল। আমি ভয় পেলাম। নিজের ওপরে আস্থা কিছুটা হারিয়ে ফেললাম। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, 'তুমি কে?' লোকটি অল্পবয়স্ক, সুদর্শন এবং সুসজ্জিত। কিন্তু মুখ তার বিষাদে ভরা। সে বলল,

'আমি সে মানুষটি ভয় পেয়ে যার মৃত্যু হয়েছিল।' তার কণ্ঠস্বর এবং কথাগুলি ছুরির মতো যেন আমায় বিদ্ধ করল। মনে হল আমি যেন টলছি, এখুনি পড়ে যাব। অভিজ্ঞতার বিবরণ লেখার জন্যে আমার পকেটে একটা ডায়েরি আর পেন্সিল ছিল। পেন্সিলটা সম্ভবত পকেটের কোণে আটকে গেছে তাই খোঁচা লাগছে। কোনও বিছানা বা সোফা মিলবে না, রাতটা বসেই কাটাতে হবে তাই বড় বেশি গরম পোষাক পরেছিলাম। ভয়ে আর গরমে ঘামছি।

আমি সাহসে ভর করে অতি কষ্টে বলে উঠলাম, 'ভয় দেখিয়ে যে লোকটার মৃত্যু ঘটানো হয়েছে? লোকটি বোকার মতো বলে ওঠে, 'আমিই সেই লোক।'

মনে হল আমার হৃদয়ের স্পন্দন থেমে আসছে, রক্ত বইছে উষ্ণ স্রোতের মতো। হাসবেন না, আমার ঠিক এরকম অনুভূতিই হয়েছিল। ভয় পেলে তুচ্ছ জিনিষও সমস্ত আন্তরিকতা টুকু নিয়ে মনকে ছুঁয়ে যায়। আমি বললাম, 'ভেবেছিলাম তুমিই সেই কেয়ার-টেকার দিনের আলোয় যার সঙ্গে আমি দেখা করেছিলাম। আচ্ছা ক্যারে কি তোমায় পাঠিয়েছে?'

সে বলল, 'না, আমিই সেই লোক ভয় দেখিয়ে যাকে মেরে ফেলা হয়েছিল, আর আজও আমি ভীত।'

আমি বললাম, 'আমারও সেই একই অবস্থা। আমিও ভয় পেয়েছি।'

'কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার তফাৎ হলো আপনি রক্ত মাংসের মানুষ আর আমি তা নই।'

আমি বুঝতে পারলাম যে এখন আমার নিজের শক্তিতেই বুঝতে হবে। আসবাবপত্রহীন শূন্য ঘরে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম, দাঁতে দাঁত চেপে হাত মোচড়াতে লাগলাম।

আমি বললাম, 'তুমি বলছ, রক্ত মাংসের শরীর তোমার নয়! কি বলছ তুমি'।

রাতের নির্জনতা আমার কণ্ঠস্বরকে যেন গ্রাস করল। এই প্রথম আমি বুঝতে পারলাম নগরের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে রাতের অন্ধকার, সিঁড়িতে ধুলো জমেছে, তেতলায় কোনও ভাড়াটে নেই, আর একতলাটাও শূন্য। অনধিকৃত অভিশপ্ত

এই হানাবাড়িতে আমি একা এবং আমি পূর্ণযুবতী—এখানে আমায় রক্ষা করার কেউ নেই। আমি কাঁপছি। ঝড়ের আস্ফালন আসছে কানে। মেঘের চাদর তারাগুলোকে ঢেকে দিয়েছে। যা প্রয়োজনীয় এবং আরামপ্রদ ভয়ংকর এই পরিবেশের মাঝে আমার সেইসব জিনিসের কথাই মনে হচ্ছিল যেমন—পুলিশ। কিন্তু নির্জন এই ঘরে রাত কাটানোর পরিকল্পনা আমিই তো করেছিলাম—এই মুহূর্তের এই বিপদের জন্যে আমিই দায়ী। বাস্তবিক কি বোকা আমি! আমার হাত-পা, সারা শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! দিন আমার ফুরিয়ে আসছে। হানাবাড়িতে রাত কাটাতে এসেছি, এদিকে স্নায়ুর জোর নেই।

'তুমি ক্যারে নও। তুমি কে? তোমার প্রকৃত পরিচয় দাও।'— উত্তেজিত হয়ে বলে উঠি। কী সর্বনাশ! লোকটি আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি তাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেছি। ম্লান হাসিতে তার নিষ্প্রভ মুখটি করুণ হয়ে উঠল। তার চোখদুটির মত এমন ব্যাথিত চোখ আমি আর কোনওদিন দেখিনি। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে, 'আমি তো আপনাকে বলেছি আমি কে! বিশ্বাস করুন খুব ভয় পেয়েছি।' কিছুটা সাহস ফিরে পেলাম। আমার স্থির বিশ্বাস যে লোকটি হয় পাগল, আর না হয় কোনও দূরাত্মা। তার মুখ না দেখে তাকে ওপরে নিয়ে এসে এই যে বিপদের মুখে পড়লাম এর জন্যে নিজের নির্বুদ্ধিতাকেই দায়ী করলাম। এখন তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে গেলে কৌশলের আশ্রয় নিতে হবে।

চেয়ার ছেড়ে উঠলাম। দেখলাম সে আমার মতই লম্বা। জানিনা শক্তি সামর্থেও সে আমার সমকক্ষ কিনা! আমি অ্যাথলেট— প্রতি শীতে হকি খেলি, গ্রীষ্মে আলপ্‌সে উঠি। হাত নিশ্‌পিশ্‌ করছিল একটা লাঠির জন্যে। লোকটি বোকার মত তাকিয়েছিল। কিন্তু যেই তার মুখে হাসি ফুটে উঠল আমি তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারালম না। আমিও ঝটিতে দরজার কাছে চলে এলাম, লাফ দিয়ে পড়লাম সিঁড়ির মুখে। আমার মন এতই বিক্ষিপ্ত হয়েছিল যে বোকার মত আমি সামনের পথটা খুঁজে না পেয়ে উল্টোদিকে ছুটলাম এবং হোঁচট খেলাম। আমি যেদিকে এসেছি সেদিকে তিন তলার সিঁড়ি। কিন্তু তখন

বড় দেরি হয়ে গেছে। লোকটি নিশ্চয় আমায় অনুসরণ করছে। বেরোতে গিয়ে তাড়াতাড়ির চোটে আমার সুচিত্রিত স্কার্ট ছিঁড়ে গেল, পাঁজরায় আঘাত লাগল। দৌড়ে আবার আমি সেই হলঘরে চলে এলাম। আমার ভাগ্য ভালো যে দরজাটা সামান্য খোলা ছিল এবং নিতান্ত সৌভাগ্য যে দরজায় চাবিটা লাগানো ছিল। মুহূর্তের সিদ্ধান্তে আমি ভেতরে ঢুকে চাবিটা ঘুরিয়ে দিলাম। বদ্ধ ঘরে আমি একা—এতক্ষণ নিরাপদ আশ্রয় মিলল।

আমি মুক্ত কিন্তু দ্রুত হৃদ্‌স্পন্দন হচ্ছিল। আর রাস্তার স্বল্পালোকে জানলার কাছে একটি লোকের অবয়ব পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। আপনারা সকলেই জানেন আমি সাহসী কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে আমি এতই ভয় পেলাম যে বোঝাতে পারব না। নিশুতি রাত, ফাঁকা বাড়ি। অপরিচিত একটি লোক ঘরে রয়েছে আর আমি দরজা বন্ধ করলাম। ছি, ছি, কি লজ্জা। জানলায় হেলান দিয়ে লোকটি দেখতে লাগল, অচল-অসাড় অবস্থায় কিভাবে আমি মেঝেতে পড়ে আছি! এ বাড়িতে তাহলে দু'জন লোক রয়েছে। আমার ভুল ভাঙল। আমার যে ভয় এতক্ষণ শরীরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সহসা তা আমার মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করল। আমি বুঝলাম লোকটিকে?

'কিন্তু তুমি কিভাবে এখানে এলে?'—আমি জিগ্যেস করলাম। সে বললে, এক হিসেবে ভিন্নলোকের বাসিন্দা আমি। যে ঘরেই আপনি আমাকে দেখতে চান, দেখতে পাবেন। আপনাদের হিসেবে আমি সর্বব্যাপী। স্থানের ধারণাটি সংকীর্ণ, জীবন-নির্ভর, কিন্তু আমি এখন বিদেহী—স্থানের সংকীর্ণ পরিধিতে আবদ্ধ নই। আমি যে এখানে রয়েছি তার কারণও আমি যা বললাম তাই। সাম্প্রতিক অবস্থা থেকে আমি মুক্তি চাইছি আর এই মুক্তির জন্য আমি প্রীতি ও সহানুভূতি কামনা করি।'—সে উত্তর দেয়। দেশলাইটা বের করে আমি গ্যাস জ্বালতে গেলাম।

সে বলল, 'খুশী হবো, যদি আলো না জ্বালান। কারণ আপনাদের আলো আমাকে ভয়ঙ্কর আঘাত করে। তার চেয়ে এই আলো-আঁধারিই বরং ভালো। দোহাই আপনারা ভয় পাবেন না। আঘাত করা দূরে থাক আপনাকে স্পর্শ

পর্যন্ত করব না। এখন শুনুন আমি যা বলতে চাই আপনি নিশ্চয়ই জানেন অনেকেই এখানে আসেন আমাকে দেখবার জন্যে। তারা সকলেই আমার দেখা পেয়েছেন, সেইসঙ্গে পেয়েছেন ভয়। একজনও যদি আমাকে দেখে শঙ্কিত না হয়ে আমার প্রতি সদয় হতেন! ভয় না পেয়ে যদি আমায় তাঁরা ভালোবাসতেন তাহলে আমি মুক্তি পেতাম—আমার এই নারকীয় যাতনা ঘুচত।' করুণায় সিক্ত হয়েছিল তার কণ্ঠ এবং আমি স্পষ্টই বুঝলাম চোখ আমার জলে ভরে উঠেছে। পুনরায় সে বলে, 'আমি জানিনা ক্যারে কে এবং আমি যখন বেঁচেছিলাম তখনই বা আমার কী নাম ছিল! শুধু এইটুকুই আমি জানি, আজ থেকে বছর দশেক আগে এই বাড়িতেই আমাকে ভয় দেখিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি ভয়ের রাজত্বেই বাস করছি। একের পর এক নির্মম এবং কৌতূহলী মানুষ এখানে এসেছে ভূত দেখতে। সমস্ত আবহাওয়াটাকে বিষিয়ে দিয়েছে তারা। আর আমার অবস্থাকেও করেছে শোচনীয়। একজনও যদি একটু সহানুভূতি দেখাত, যুক্তিসঙ্গতভাবে একটু কথা কইত। মাদাম, আপনিও কী আমাকে একটু ভালোবাসেন না?' কেঁদে উঠল সে।

এতক্ষণ আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিথর-নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তার কথায় ভয় পাওয়া দূরে থাক ভালোবাসায় ভরে উঠল মন। প্রায় স্বাভাবিক হয়ে মেঝের ঠিক কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়ালাম। সে বললে, 'আপনিই প্রথম আমার প্রতি সদয় হয়েছেন। মনে হচ্ছে আমি যেন অনেকটা ভারমুক্ত হয়েছি—আমার বেশ ভালো লাগছে। জীবিত আবস্থায় আমি ছিলাম মনুষ্যদ্বেষীয়। আপনি যদি কাউকে পছন্দ করেন সেও আপনাকে পছন্দ করবে। আর ঘৃণা করলে তার কাছ থেকেও আপনি ফিরে পাবেন ঘৃণা। আমি ভয়ঙ্কর এক প্রবঞ্চনার শিকার হয়েছিলাম। আমার ঘর প্রেতের আবাসস্থল হয়ে উঠেছিল। তারা হাসত, বিকট মুখভঙ্গী করত, ভয় দেখাত। একদিন রাতে শয্যার পাশে অশরীরীদের বিরাট মিছিল দেখে ভয়ে আমি প্রাণ হারাই। মানুষকে ঘৃণা করার পাপই আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। দিনের আলোয় আপনি যখন এই বাড়ি দেখতে এসেছিলেন আমি তখন আপনাকে ভালভাবে লক্ষ্য করেছিলাম। আমার মনে হয়েছিল আপনার সাহস আছে, স্বকীয়তা রয়েছে, আর আপনার উন্নত-কোমল

বুকে জমে আছে প্রেম। প্রলুব্ধ হয়ে চেয়েছিলাম আপনার দিকে। মনে হয়েছিল আপনার কাছ থেকে এতটুকু ভালোবাসা পেলেই আমি নরক-যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাব।'

অকপটেই স্বীকার করছি, তার কথায় হৃদয়ে দোলা লেগেছিল কিন্তু সেইসঙ্গে সন্দেহ আর অবিশ্বাসও জেগেছিল। মনে হয়েছিল, আমি যে কোনও একটা স্বপ্ন দেখছি। তাছাড়া আমি শুনেছিলাম এই বাড়িতে এক মহিলা খুন হয়েছিলেন। লোকটি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলতে শুরু করে, 'তোমরা মেয়েরা সত্যিই আশ্চর্য। যে ভালোবাসা দিতে তোমরা প্রায়ই কুণ্ঠিত তার জন্যে আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করি। আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারালাম না। আমি কাঁদছি। আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে লোকটির মুখ। আমার পায়ে অনেকক্ষণ ধরে চুম্বন করল সে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে অনুরোধ করে, 'আমার বুকে এসো—জড়িয়ে ধর আমায়, আমায় চুমু দাও—আমাকে ভালোবাসো। তোমার প্রেমে ও করুণায়, চুম্বনে ও আলিঙ্গনে আমি মুক্ত হব। ভুলে যাও তুমি নারী আর আমি পুরুষ। আমায় শুধু ভালোবাসো।

আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে তাকে আমি জড়িয়ে ধরলাম। একের পর এক চুম্বনে তার তৃষিত ওষ্ঠ ভিজিয়ে দিয়ে বললাম, 'তোমায় আমি ভালোবাসি। আর আমার কোনও ভয় নেই।' আমার গাল বেয়ে ঝরে পড়ল উষ্ণ অশ্রুধারা। পথের অস্পষ্ট আলোয় রহস্যময় হয়ে উঠেছিল ঘরটি। লোকটির সারা শরীর থেকে কোমল একটা দ্যুতি নির্গত হল। আমার প্রেমে অভিশপ্ত অবস্থা থেকে সে অব্যাহতি লাভ করল এবং মিলিয়ে গেল। বাতাসের স্নিগ্ধতা আর আগুনের উষ্ণতা মিশিয়ে অদ্ভুত এক অনুভূতি আমাকে ঘিরে রইল।

আমি দ্বার উন্মুক্ত করলাম এবং আঁধার-ঘেরা সেই ফাঁকা বাড়ির অলিতে গলিতে এমনকি ধুলি-ধূসর রান্না ঘরে পর্যন্ত নির্ভয়ে অবাধে ঘুরে বেড়ালাম। নিঃসীম এক শূন্যতা ঘিরে রাখে সারা বাড়িটি। আমার আর কোনও ভয় নেই। যৌবনের উন্মেষে বসন্তের সকালকে যেমন মধুর মনে হত আজও তেমনি সুন্দর লাগছে সবকিছু—কানে আসছে বাতাসের গান। অবশিষ্ট রাতটুকু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে কাটালাম।

পরের দিন আমার কাকা স্যার হেনরিকে আমার নৈশ অভিযানের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বললাম। কাকা বললেন, 'শোন। এ পর্যন্ত অনেকেই হানাবাড়িতে রাত কাটিয়েছে। তারা সকলে একই রকম বিবরণ দিয়েছে। আমার মনে হয়েছিল একজনের গল্প শুনে অন্যজনও সেই কাল্পনিক কাহিনীই বলে যায়। তাই তোমাকে পাঠিয়েছিলাম পরখ করতে আর ওই বাড়িতে ভদ্রমহিলার খুনের ব্যাপারটা সম্পূর্ণই আমার কল্পনাপ্রসূত, মিথ্যা প্রচার। আসল ঘটনা হল আমার এক আত্মীয় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ওই বাড়িতে আত্মহত্যা করেছিল। এর আগে যারা ওই বাড়িতে রাতে থেকেছে তারা সকলেই তাকে প্রত্যক্ষ করেছে। এবং তারা ফিরে এসে আমায় যে বিবরণ দিয়েছে আজ বুঝলাম তা মিথ্যে নয়।'

অ্যালগ্যারনন ব্ল্যাকউড (জন্ম ১৮৬৯ খ্রিঃ) উল্লিখিত ভৌতিক কাহিনীটি আজ হতে প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্বের ইংরেজি ভৌতিক কাহিনীর বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে যে কয়জন ইংরেজি গল্পকার ভৌতিক গল্পে লেখনী সঞ্চালন করেন অ্যালগারনন ব্ল্যাকউড তাঁদের পুরোধা পুরুষ।

লর্ড কিপলিং, এইচ, জি, ওয়েলস্ প্রমুখের সমকালে সমমর্যাদায় তাঁর গল্প পাঠক চিত্তে শঙ্কা শিহরণের লহরি জাগায়। তাঁর সমস্ত গল্পই ঘটনা পরম্পরায় প্রত্যাশিত, প্রত্যাশার অবসানে এক অপ্রত্যাশিত অভিজ্ঞতার অদ্ভুত কাহিনী বিন্যাসে স্পৃক্ত। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নানা বৃত্তি ও জীবিকার বৃত্তে আবর্তিত হয়ে জীবনরস আহরণ করেছেন।

দি টল উওম্যান

পেড্রো অন্তোনিয়ো দ্যা অ্যালারকন

"আমরা কতটুকুই বা জানি"—পার্বত্য সংগঠনের বিশিষ্ট সিভিল এঞ্জিনিযার গ্যাব্রিয়েল বলল। কোন এক বসন্তে গুয়াডারমার পর্বত চূড়ায় পাইন গাছের নিচে বসে গল্প করছিল সে। সব কিছুই মনে আছে আমার, দুঃখের বিষয় জায়গাটির নাম গিয়েছি ভুলে।

গ্যাব্রিয়েল বলল, 'গল্প করা আর বিশ্রাম নেওয়ার পক্ষে এ স্থানটি নিঃসন্দে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সুখপ্রদ। শ্রোতা ছিল পাঁচজন। তিন জন গ্যাব্রিয়েলের মতই ইঞ্জিনিয়র, চতুর্থ জন শিল্পী আর পঞ্চম জন সাহিত্যসেবী। আমরা সান-লরেঞ্জা থেকে ভাড়া করা খচ্চরের পিঠে চেপে এই পাইন বীথিতে এসেছিলাম প্রজাপতি ধরে, গুবরে পোকার গুঞ্জন শুনে আর সঙ্গে আনা খাবার খেয়ে দিনটি কাটাব বলে।

আঠার-শ-পঁচাত্তরের ঘটনা। বেশ মনে পড়ে দিনটি ছিল উচ্ছ্বাসে আনন্দে

তপ্তমধুর। গ্যাব্রিয়েল বললে, "আপনারা তো জানেন আমার ভেতর কল্পনার বাষ্পটুকুও নেই। সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী নই আমি। আমি প্রত্যক্ষবাদী, আধুনিক যুগের মানুষ। আমি যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, আমি যা শুনেছি আপনাদের কাছে আমি তার বিবরণ দেব। অবশ্য যে অদ্ভুত ঘটনার কথা আমি বলব, আমি তার সত্যিকারের নায়ক নই। আমার বলা শেষ হলে পার্থিব বা প্রাকৃতিক যে নামেই আপনারা আমার কাহিনীটিকে অভিহিত করুন না কেন, দেখবেন বুদ্ধি দিয়ে এর কোন ব্যাখ্যা চলে না।

মদ্যপান করল গ্যাব্রিয়েল। তারপর শুরু করল তার অলৌকিক কাহিনী—

"জানি না আপনারা টেলেসফোরের নাম শুনছেন কিনা! সে ছিল এঞ্জিনিয়ার। আঠার-শ-ষাট খ্রিস্টাব্দে সে মারা যায়।"

"না, শুনিনি।"

"আপনি শুনতে না পারেন, আমি কিন্তু শুনেছি। অ্যান্দালুসিয়ার যুবক সে। মিশকালো গোঁফ ছিল তো তার? মোরেডার মার্কুয়িসের (ডিউক আর আর্লের মধ্যবর্তী পদবীধারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি) মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েছিল কিন্তু পাণ্ডুরোগে তার মৃত্যু হয়।'

ঠিক ধরেছেন। আমি তার কথাই বলছি। টেলেসফোর সুশ্রী, সুগঠিত তার দেহ, প্রাণবন্ত, উদ্যমশীল। মৃত্যুর মাত্র ছয় মাস আগেও টেলেসফোরে পূর্ণ উদ্দীপনায় কাজ করেছে, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। এঞ্জিনিয়ার হিসাবেও সে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। রূপে-গুণে-সৌজন্যে এই যুবক সকলের মনহরণ করত। বিবাহ যোগ্যা মেয়েরা তাকে পছন্দ করত—বিয়ে করতেও চাইত। কিন্তু সে ছিল জোয়াকুইনার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত। গাছেরও খাব, তলারও কুড়াব এ হীন মনোভাব ছিল না তার।

কিন্তু হতভাগ্য জোয়াকুইনা আঠার-শ-ঊনষাটের গ্রীষ্মে সান্তাআগুয়েদার স্নানাগারে হঠাৎ মারা যায়। আমি তখন পাউয়ে, জোয়াকুইনার মৃত্যু সংবাদ পেলাম। টেলেসফোরের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্ব ছিল তাই তার বাগদত্তা জোয়াকুইনার মৃত্যুতে অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলাম। একবারই মাত্র মেয়েটিকে দেখেছিলাম আমি—তার কাকীমার বাড়িতে। আচার-আচরণে ছিল তার স্বাতন্ত্র, আভিজাত্য। কিন্তু তার নীলাভ পাণ্ডুর গায়ের রঙ ভগ্ন স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে

আমার মনে হয়েছিল। জোয়াকুইনার মৃত্যুর পনের কুড়ি দিন পরে মাদ্রিদ ফিরে আমি টেলেসফোরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। লোবো স্ট্রিটে সুরুচি সম্পন্ন ব্যাচেলার্স কোয়াটার্সে থাকত সে।

তাকে দেখে মনে হয়েছিল গভীর শোকগ্রস্থ হলেও শান্ত আর সংযত। সক্কাল বেলাতেই কাজের মাঝে ডুবে আছে সে। রেলপথের একটা নক্সা মেলে ধরে সে তার সহকারীদের কাজ বোঝাচ্ছিল। শোকের পোষাক পরে ছিল সে। বিষাদের দীর্ঘ নিঃশ্বাস না ফেলেই সে আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। সহকারীদের কাজ বুঝিয়ে অদূরে তার নিজস্ব অফিসে আমার দিকে না তাকিয়েই করুণ কণ্ঠে সে বললে—

"এ সময় তোমায় পেয়ে আমি যে কতটা আনন্দ পেয়েছি, তা তোমাকে বোঝাতে পারব না। কতবার আমি তোমার সঙ্গ কামনা করেছি। অবশেষে তুমি এলে। আমার জীবনে অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটে গেছে। একমাত্র তোমাকেই সব কথা খুলে বলা যায়, কেননা, আমি জানি একমাত্র তুমিই আমার কথা বিশ্বাস করবে। অন্য কারোকে সে কাহিনী বললে সে বিশ্বাস করবে না—ভাববে শোকে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে তাই আষাঢ়ে গল্পকে সত্যি বলে চালাবার চেষ্টা করছি। আমার সমস্ত বিবরণ শোনার পর এ ব্যাপারে তোমার সুচিন্তিত মনোভাব জানতে চাই।"

অফিসে পৌঁছে সে বলল, "বস। ভেবনা যেন আমার দুঃখের বিবরণ দিয়ে তোমায় আমি ভারাক্রান্ত করার জন্যেই এখানে টেনে এনেছি। দুঃখ আমারই নিত্যকালের সঙ্গী হয়ে থাক। আজ আমি যা বলব তার একবর্ণও মিথ্যে নয়—আমার জীবনে দুর্দশার নারকীয় আর অশুভ চিহ্নরূপেই তা সুচিত হয়েছিল এবং আমাকে ভয়ানক যন্ত্রনা বিদ্ধ করেছিল।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে আমি বসলাম। তারপর বললাম তাকে, "বল।" টেলেসফোরের মুখ আতংকে পাণ্ডুর হয়ে উঠল। সে তার কপালের ঘাম মুছে বলতে শুরু করে—"শোন তবে। জানিনা শৈশবের কোন ভয়ংকর কল্পনার ফলশ্রুতি, নাকি বিধির্নিবন্ধ কিংবা ঐ ধরনের কোন গল্প শোনার প্রতিক্রিয়া, নাকি ছোট ছেলেদের ভূতের গল্প শুনে ভয়পাওয়ার মত কোন একটা ব্যাপার। কিন্তু মধ্যরাতে নির্জন রাজপথে সেদিন লম্বা সেই মেয়ে মানুষটিকে দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছিলাম আমি—এত ভয় ছেলেবেলাতেও আমি কোনদিন পাইনি।"

"তুমি তো জান ভয় কাকে বলে, কোনদিনই জানতাম না আমি। মনে আছে? সেই যে সেবার, এঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ছাড়ার ঠিক পরে, শ্রমিকেরা বিদ্রোহ করেছিল এবং আমি একাই তাদের সঙ্গে লাঠি, পিস্তল নিয়ে লড়াই করেছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা বশ্যতা স্বীকার করে। কেবল মাদ্রিদ কেন, যত্র-তত্র সর্বত্রই আমি যখন তখন অস্ত্র ছাড়াই অবাধে ঘুরে বেড়াতাম। সকলেই কোন না কোন সময়ে আমার দুঃসাহসিকতার পরিচয় পেয়েছে। আমাকে দেখে তাই চোর-জোচ্চর পকেটমার সকলেই ভয়ে সরে গেছে। কিন্তু তুমি হাস আর ঠাট্টাই কর ভাই, লম্বা ঐ মহিলাকে দেখে ভয়ে আমার অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল,—আমার সমস্ত চামড়া একেবারে খসখসে হয়ে গিয়েছিল। হন্‌হন্‌ করে হেঁটে বাড়ি পৌঁছনোর পর সেদিন ভয়ের হাত থেকে নিস্কৃতি পেয়েছিলাম।

আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমার ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা আর কেউ জানতে পারেনি। ভূত-প্রেত-অপদেবতা-ডাইনি—কোন কিছুতেই তো আমার বিশ্বাস নেই, তাকে দেখে তাই ভয় পাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। দারিদ্রের তাড়নায় সে বেচারী হয়তো পথে বেরিয়েছিল কিছু পাবার আশায়, কোথায় তাকে সাহায্য করব আর তা নয় তাকে দেখে ভয় পেলাম। ছিঃ, কি লজ্জা! শরমে সংকুচিত হলাম আমি। চব্বিশ বছরের বলিষ্ট যুবক আমি। নিশীথ রাতে কত দুঃসাহসিক অভিযান চালিয়েছি—ভয়ের কোন অনুভূতিই জাগেনি আর আমি কিনা সঙ্গীহীন মহিলাটিকে দেখে কেঁপে উঠলাম।"

"বছর তিনেক পরে। তারিখটা এখনও আমার মনে আছে—নভেম্বরের পনের ষোল তারিখ। তখনও ভোর হয়নি। তিনটের সময় শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমি জুয়ার আড্ডা থেকে বাড়ি ফিরছিলাম। অবাক হচ্ছ? অবাক হবারই তো কথা। বরাবরই আমি তো জুয়াখোরদের ঘৃণা করেছি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রতারণায় আমি সেখানে গিয়েছিলাম। যাদের নাটক বা সিনেমা দেখবার নেশা আছে তারা যেমন মাঝরাতে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়ে, আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল। জুয়ার আড্ডার প্রচুর সোনার ঝিলিক দেখে লুব্ধ হয়েছিলাম আমি—বিস্মিত চোখ মেলে ব্যাঙ্ক নোটের পাহাড় দেখতাম আর হেরে গিয়ে নিঃস্ব মন নিয়ে গভীর রাতে চোরের মত বাড়ি আসতাম। জুয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত

হতে বসেছিলাম। উত্তরাধিকারসূত্রে টাকা না পেলে, আর এখানের এ ভালো চাকরিটা না পেলে, আমার অবস্থা খুবই সংকটজনক হয়ে উঠত।"

"হ্যাঁ। যা বলেছিলাম। সেদিন শেষরাতে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর শ্রান্ত দেহটা নিয়ে লজ্জায় সংকোচে বাড়ি ফিরছিলাম। বার বার মনে পড়ছিল আমার বৃদ্ধ অসুস্থ বাবার কথা। টাকা চেয়ে চিঠি লিখতে হবে তাঁকে। আমি জানতাম এ ধরনের চিঠি পেয়ে যতটা দুঃখ পাবেন তিনি তাঁর চেয়ে বেশি অবাক হবেন। কেননা তাঁর ধারণা ছিল যে, আমি যা পাই তাতে স্বচ্ছলতার মাঝেই আমারও দিন কেটে যাওয়ার কথা। যা হোক, ফেরার পথে পেলিগ্রাস স্ট্রিটের সংযোগ স্থলে সদ্য সমাপ্ত একটা নতুন বাড়ির সামনে আমি কি যেন দেখলাম। কাছে এসে দেখলাম দীর্ঘদেহিনী এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে, তাকে বিরাট একটা কাঠের পুতুলের মতো লাগছিল। বয়স ষাটের মত হবে। তার উজ্জ্বল চোখের শাণিত দৃষ্টি আমার প্রতি নিবদ্ধ। একটিও দাঁত নেই তার। আমার দিকে চেয়ে হাসল সে। ভয়ংকর নারকীয় সে হাসি।"

"মহিলার সেই অপ্রীতিকর দৃষ্টি আমার মাঝে অদ্ভুত এক অনুভূতির সঞ্চার করেছিল। অকপটেই স্বীকার করছি ভয়ংকার সেই দৃশ্যে মুহূর্তেই ভয় আমায় পেয়ে বসল। রাস্তার বিষণ্ন আলোয় তাকে দেখেছিলাম। কিন্তু তার মত পাণ্ডুর বীভৎস মুখ, অদ্ভুত সাজ পোষাক, সব কিছুই আমার মনে সঙ্গে সঙ্গেই ক্ষেপিত হয়ে গিয়েছিল।

সেই মহিলার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল তার অস্বাভাবিক উচ্চতা, হাড়বেরুনো কাঁধটা অসম্ভব চওড়া, পেঁচার মতো শুষ্ক চোখ, স্থির নিবদ্ধ দৃষ্টি, বাইরের দিকে ঠেলে দেওয়া বিশাল নাক, গভীর কালো মুখ গহ্বর। তার মাথায় ঘোমটার মতো করে বাঁধা সূতির রুমাল। ক্ষুদ্রাকৃতি একটি পাখা অশালীন ভঙ্গীতে সে হাতে নিয়েছিল যেটা দিয়ে সে কোমরের মধ্যদেশ আবৃত করেছিল।"

"দৈত্যের মতো বিরাট হাতে ঐ ছোট্ট পাখাটা দেখলে, একদিকে ভয়ংকর মনে হবে, অন্যদিকে হাসি পাবে। মনে হবে ঘৃণ্য ভয়ংকর ডাইনীর হাতের রাজদণ্ড। এমনও হতে পার সে স্ত্রীর বেশে কোন পুরুষ।'

কিন্তু তার রুঢ়, ঘৃণামাখা দৃষ্টি আর রুক্ষ হাসি কী ভয়াবহ! সে কি জাদুকরী, ডাইনী—জানিনা সে কি! সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান! আমার জীবনে আসন্ন

কোন বিপদের পূর্বাভাসরূপেই রাতের নির্জনতায় সে আসত। আমার সঙ্গে তার দেখা হত। বলতে পার অশরীরী আত্মার সম্মুখীন হওয়ার একটা চিন্তা আমার শৈশবকাল থেকেই ছিল।

"সেই দানবীকে দেখে আমি দৌড়য়নি। আমি আমার আবেগকে দমন করছিলাম, যাতে আমার ভয় পাওয়াটা সে বুঝতে পারে। ভীত হয়েছি বুঝতে পারলে সে হয়ত সব সময়েই আমার অনুসন্ধান করবে।"

"আমার বাড়িটা ছিল দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ রাস্তার বিপরীত প্রান্তে। সেখানে আমি একাই ছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল রহস্যময়ী সেই অপচ্ছায়া—সে যখন খুশী আমায় হত্যা করতে পারে। কিভাবে আমি বাড়ি ফিরব? উদ্বিগ্নভাবে আমি দূরে আলো ঝলমলে মন্টেরা স্ট্রিটের দিকে তাকিয়েছিলাম, যেখানে সব সময়েই পুলিসের সাহায্যে মেলে। আমি ভয়কে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম আর একটু একটু করে এগুতে লাগলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম বাড়ি পৌঁছনোর আগে আমি পড়েও যাব না, কিংবা জ্ঞান হারিয়েও ফেলব না।

"এইভাবেই অগ্রসর হচ্ছিলাম। আমার কুড়ি পা হাঁটলেই অভিশপ্ত সেই নতুন বাড়ির দরজা পেরিয়ে যেতে পারব, যেখানে সে দাঁড়িয়েছিল। এমন হতে পারে সে শীতের হাত থেরে রক্ষা পেতে প্রতিরাত্রে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে। আচ্ছা পরখ করেই দেখা যাক। স্বচ্ছন্দে অতিক্রম করলাম সেই পথটুকু। তারপর কৌতূহলের বশে পেছন পিরে তাকিয়েছিলাম। গ্যাব্রিয়েল, সারা শরীর আমার কেঁপে উঠল। সেই ডাইনীটা একেবারে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—তার পাখার ছোঁয়া লাগল আমার গায়ে। ভূত দেখেছে এইরকম অনুভূতি জাগলে বছর চারেকের ছেলে যেমন চিৎকার করে ওঠে, পালাবার চেষ্টা করে, আমার অবস্থাও সেইরকম হয়েছিল।

"ক্যাবালেরো দ্য বল গ্রেসিয়া স্ট্রিটে একজন পুলিশকে দেখে আমি তার শরণাপন্ন হলাম। তাকে বললাম জারডিনেস স্ট্রিটে স্ত্রীলোকের বেশে এক পুরুষকে আমি যেতে দেখেছি, যাকে দেখলে মনে হয় চোর কিংবা হত্যাকারী। তাকে সঙ্গে নিয়ে অনেক খুঁজলাম সেই ডাইনীকে। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।

"সে ভেগেছে",— পুলিসটি বলল।

'হ্যাঁ তাই হবে''—আমার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আমি পুলিসটির সঙ্গে একমত হলাম। ভাবলাম কাল থেকে অন্য পথ ধরব।

জোসকে যাতে বিরক্ত করতে না হয়, সেজন্য আমি সব সময়েই দরজার চাবি নিজের কাছেই রাখতাম। কিন্তু সে রাতে তিনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। আমার পনের-ষোল নভেম্বরের দুর্ঘটনার শেষ তখনও হয়নি।

"কি হয়েছে? আপনি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।" —অবাক হয়ে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি।

"মেজর ফ্যালকন এখানে এগারোটা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত তোমার প্রতীক্ষায় ছিলেন। চলে যাবার সময় তিনি বলে গেলেন তুমি ঘুমোতে বাড়িতে এলে তোমার পোষাক না পাল্টানোই ভালো। কেননা সকাল হলেই আবারতিনি আসবেন।"—বিক্ষুব্ধ জোস বললে।

"জোসের কথায় আমি বুঝলাম আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে। আমার বাবা জ্যায়েনে তাঁর বাড়িতে থাকতেন আর দীর্ঘকাল স্থায়ী দুরারোগ্য সব ব্যাধিতে ভুগতেন। আমি তাই আমার ভাইকে বলে রেখেছিলাম বাবা যদি সাংঘাতিক পীড়িত হয়ে পড়েন তাহলে মেজর ফ্যালকনকে খবর দিতে এবং তার কাছ থেকে সহজেই আমি খবরটা পেয়ে যাব। আমি বুঝেছিলাম আমার বাবা মারা গেছেন। আরাম কেদারায় অর্ধশায়িত হয়ে আমি ফ্যালকনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ভগবান জানেন ঐ দু'ঘন্টার প্রতীক্ষায় সেদিন আমি কি নরক যন্ত্রণা অনুভব করেছিলাম। যে তিনটি চিন্তা সমসূত্রে গ্রথিত হয়ে আমায় পাগল করে তুলেছিল, সে তিনটি হল—জুয়াখেলায় হেরে যাওয়া, ঐ মহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎকার, আর আমার বাবার মৃত্যু।"

ছ'টার সময় মেজর ফ্যালকন এলেন আমার ঘরে। গভীর থমথমে তাঁর মুখ। আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলাম। তিনি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—

"কাঁদ। কাঁদ। যত খুশি কাঁদ।"

"আমার বন্ধু টেলিসেফোরা এইটুকু বলে একটু থেমেছিল," গ্যাব্রিয়েল বললে। তারপর আরও একগ্লাস মদ পান করল গ্যাব্রিয়েল এবং বলতে শুরু করে—

"আমার গল্পটা যদি এখানেই শেষ হত তাহলে এটাকে কোনরকমেই অসাধারণ অলৌকিক বলা যেত না। অনায়াসেই বলত সকলে, যারা খুবই কল্পনাপ্রবণ তারা মাঝে মাঝে ভয় পায়। ঘরছাড়া ঐ ভিখারিটাকে দেখে এত ভয় পাবার কি আছে! আহার আর আশ্রয়ের জন্যেই হন্যে হয়ে পথে পথে ঘোরে সে! লম্বা মেয়ে মানুষটিকে দেখে মিথ্যেই আমি ভয় পেয়েছিলাম। আমার কেমন যেন একটা বোধ জন্মে গিয়েছিল আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। কিন্তু আজ আমি তার দেখা পেতে চাই।"

"কেন তার দেখা পেতে চাও?"

"তাকে দেখা মাত্রই মেরে ফেলতে চাই বলে।"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

"কি বলব ভাই তোমাকে। সপ্তাহ তিনেক আগে আমার প্রিয়তমা জোয়াকুইনার মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার কয়েক ঘন্টা আগে আমি পুনরায় সেই ডাইনীকে দেখেছিলাম! সকাল পাঁচটা। ভালো করে তখনও আলো ফোটেনি। পুবের আকাশটা সবেমাত্র একটু চকচকে হয়েছে। একটু আগে রাস্তার আলো নিভেছে। পুলিসেরা সারা রাতের পাহারা সেরে ক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরছে। লোবো স্ট্রিটের দিকে যাচ্ছিলাম আমি। ভয়ংকরী সেই মহিলা আমার সামনে দিয়ে রাস্তা পার হল। আমার দিকে তাকায়নি সে। ভেবেছিলাম সে আমায় লক্ষ্য করেনি।

"তিন বছর আগে তাকে যেমন দেখেছিলাম, ঠিক সেই সাজে, হাতে সেই পাখা নিয়ে লম্বা মেয়ে মানুষটিকে যেতে দেখলাম। আমার ভীতি আগের চেয়ে বেড়ে গেল লোবো স্ট্রিটের অপর প্রান্তে পৌঁছে আমি হাঁপাতে লাগলাম, এইমাত্র যেন আমি কোন একটি বেগবতী নদীতে সাঁতার দিয়েছি। সান্ত্বনা দিয়েছিলাম নিজেকে— ডাইনীটা আমায় দেখেনী।"

"সেই বাড়িটার কাছে যেই পৌঁছালাম, সে দাঁড়িয়ে আছে। সেই শাণিত দৃষ্টি, সেই ভয়ংকর মুখ!"

আমি তাকে দেওয়ালের দিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলাম। গলা টিপে ধরলাম। তার মুখ, বুক এবং তার ধূসর রঙের চুলের গোছা অনুভব করলাম। শেষে আর আমার কোন সন্দেহ রইল না। যে, সে একজন রক্তমাংসের মানুষ—একজন নারী।

"ইতিমধ্যে সে চিৎকার করে উঠল। মনে হল এটা তার নিছক ভণ্ডামি। একটুও ভয় পায়নি সে—ভয়ের ভান করেছিল মাত্র।"

হায়েনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল সে—

"কেন আমার সঙ্গে কোন্দল করেছিস?"

"তার এই উক্তিতে আমার ভয় বেড়ে গেল, প্রবল ক্রোধ প্রশমিত হল। তাকে বললাম—"

"মনে করে দেখ অন্য কোথায় আমায় তুমি দেখেছিলে।"

"তিন বছর আগে সন্ত ইউজেনের রাত্রিতে জারডিনেস স্ট্রিটে তোর দেখা পেয়েছিলাম রে"—বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বললে সে।

"আমার মজ্জা পর্যন্ত হিম হয়ে গেল।"

"কিন্তু কে তুমি? কেন তুমি আমায় অনুসরণ করছ? আমাকে তোমার কি প্রয়োজন?"

"আমি হতভাগ্য দুর্বল নারী। আমায় তুই ঘৃণা করিস, তার কারণ ছাড়া মিথ্যেই তুই আমায় ভয় করিস। তাই যদি না হয় তাহলে ভেবে দেখ, তোর সঙ্গে যেদিন আমার প্রথম দেখা হয়েছিল, কী ভয়টাই না তুই পেয়েছিলি!"

"জন্ম থেকেই বোধ হয় তোমায় আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি, কেননা তুমি আমার জীবনের দুর্গ্রহ, দুরাত্মা।"

"আমায় তুমি কত দিন ধরে চেন?"

"তোর জন্মের আগে থাকতেই। আর তিন বছর আগে তোকে যখন আমার পাশ দিয়ে যেতে দেখেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল, হ্যাঁ এই সে।"

"কিন্তু আমিই বা তোমার কে, তুমিই বা আমার কে?"

"শয়তান!"—আমার নাগাল থেকে নিজেকে মুক্ত করে, আমার দিকে থুথু ফেলে সে বলে ওঠে। তারপর অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় চলে গেল সে। সে তার স্কার্ট হাঁটুর ওপর তুলে ধরেছিল। তার পায়ের পাতা যখন মাটি স্পর্শ করল তখন একটুও শব্দ হয় নি।

"তাকে আর ধরতে যাওয়া বোকামি। তা ছাড়া পথে লোক চলাচল শুরু হয়ে গেছে। জানিনা শয়তানটা উড়ে গিয়েছিল কিনা। রৌদ্রতপ্ত হুয়ের-টাস

স্ট্রিট থেকে সে আমার দিকে তাকাল, পাখাটা দুলিয়ে আমায় শাসাল। তারপর একটা পথের বাঁকে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।"

"একটু অপেক্ষা কর গ্যাব্রিয়েল। এর মধ্যে তোমার রায় দিও না। আর দু মিনিট ধৈর্য ধর।"

"আমি যখন আমার আশ্রমে ফিরে গেলাম ফ্যালকনের সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি আমায় জীবনের আশা-আকাঙ্খা-স্বপ্ন, আমার বাগদত্তা, জোয়াকুইনার মৃত্যুসংবাদ দিলেন। সান্তা আগুয়েটার স্নানাগারে আগের দিন তার মৃত্যু হয়েছে। তখনই মনে হয়েছিল জাত শত্রু ঐ শয়তানকে বধ করি।"

"কিন্তু তাকে বধ করব কি করে? সে কি সত্যই একজন নারী? সে কি আদৌ মানুষ? কেন আমায় সে দেখা মাত্রই চিনেছিল? আমার জীবনে দুর্বিপাক ছাড়া কেন আমার তার সঙ্গে দেখা হত না! সে কি সত্যিই শয়তান? সেই কি মূর্তিমতী মৃত্যু? সেই কি জীবন? কে সে?"

"বন্ধুগণ, আপনারা হয়ত বলবেন এমন ঘটনা হামেশাই ঘটতে পারে। টেলেসফোরা কল্পনাপ্রবণ—শোকে দুঃখে সে অর্ধোন্মাদ। তাই তার জীবনের দুর্ঘটনার সঙ্গে সে ঐ লম্বা মেয়ে মানুষটাকে জড়িয়ে ভয় পেয়েছিল। আর ঐ নারী বদমাইস, চোর, ভিখারী একটা না একটা কিছু একটা হবে।"

"আপনার অনুমান যথার্থ।"—গ্যাব্রিয়েলের বন্ধুরা বলল।

'না। আর একটু শুনুন। টেলেসফোরোর অনুমান অভ্রান্ত। তার সঙ্গে আমার কথাবার্তা হবার কয়েকদিন পরে শুনলাম আমার হতভাগ্য বন্ধু টেলেসফোরোর সাংঘাতিক জনডিস হয়েছে। তার সারা শরীর সবুজ হয়ে গেছে। রাত দিন সে তার ইজিচেয়ারে শুয়ে থাকে। সে শুধু কাঁদে। কোন কাজ করে না সে। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন কারোর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছেও তার নেই। চিকিৎসকেরা বলছেন, তার সুস্থতার আর আশা নেই।

"আমি বুঝলাম সেই জন্যেই সে আমার চিঠির জবাব দেয়নি। পাঁচমাস পরে মাদ্রিদে ফিরে এসে সে রাতেই টেলেসফোরের মৃত্যুর সংবাদ পেলাম। পরদিন সকালে তার অন্তোষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেছিলাম। সান-লুই কবরখানার পৌঁছানোর জন্যে শবাধারবাহী গাড়িটির নিকটবর্তী একটা গাড়িতে চড়লাম।

হঠাৎ আমি ক্ষুদ্রাকৃতি এক পাখা হাতে একটা লম্বা বুড়িকে শবাধারবাহী লোকগুলির দিকে চেয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসতে দেখলাম।"

আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে এই হারামজাদিই টেলেসফোরোর সেই নির্দয় শত্রু। টেলেসফোরোর বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি—সেই বীভৎস নাক, শয়তানের চোখ, বিরাট মুখ গহ্বর, হাতে সেই পাখা।"

"আমার দিকে তাকিয়ে মুহূর্তেই সে বুঝে নিল আমি তাকে দেখেছি, আর জাডিনেস স্ট্রিটে লোবো স্ট্রিটের সব ঘটনার কথা আমি টেলেসফোরোর কাছে শুনেছি। আমার হতভাগ্য বন্ধুটির প্রতি সে যেমন ঘৃণা পোষণ করত, আমার প্রতি ঘৃণাতেও তার মুখটি তেমনি বীভৎস হয়ে উঠল।"

"আমি স্বীকার করছি যে সেই সময় ঐ সব সমকালীন এবং আকস্মিক ঘটনাগুলো সম্বন্ধে আমার বিস্ময় অপেক্ষা ভীতি ছিল বেশি। কিন্তু সাময়িক ভাবে আমার নিজের জীবন, নিজের আত্মা এবং নিজের সুখই ছিল আমার প্রধান লক্ষ্য। আমার ওপরেও যদি সেই অভিশাপ পড়ে থাকে তাহলে সব কিছুই প্রকাশ পেয়ে, আমাকে বিপদে ফেলতে কতক্ষণ!"

"লম্বা সেই বুড়িটা আমার দিকে চেয়ে হাসল—যেন সে বুঝতে পেরেছে আমার মনের কথা। আমার মাথা টলছিল। ভাগ্যিস, আমি এক বন্ধুকে ধরে ফেলেছিলাম, নইলে নির্ঘাৎ পড়ে যেতাম। সে অবজ্ঞাসূচক আর ঘৃণাব্যাঞ্জক অঙ্গভঙ্গী করে দাঁড়াল এবং সামাধিভূমির দিকে চলে গেল। কবরগুলির পাশ দিয়ে প্রেমিকার ভান করে সে হাঁটছিল। আমার স্থির বিশ্বাস আমার প্রতি ঘৃণার আধিক্যে ও আমার সঙ্গে কথা বলেনি।"

"পনের বছর কেটে গেছে। আর আমি কোন দিন তাকে দেখিনি! এখন তোমাদের মতামত দিতে পার। তোমরা কি মনে কর ঘটনাটি একেবারেই স্বাভাবিক?"

হ্যারি

রোজমারি টিম্‌পারলে

এইসব সাধারণ জিনিসও আমায় ভয় দেখায়— রৌদ্রকিরণ, সবুজ ঘাসে তীক্ষ্ণ ছায়া, সাদা গোলাপ, লাল চুল শিশু আর সেই নাম 'হ্যারি'। ক্রিস্টিন যেদিন এই নামটি উচ্চারণ করেছিল সেদিন আমার ভেতরে ভয়ের পূর্বাভাস দেখা দিয়েছিল।

ক্রিস্টিনের বয়স পাঁচ বছর, আর তিন মাস পরে সে স্কুলে যেতে শুরু করবে। দিনটি ছিল তপ্ত এবং সুন্দর। সেদিনও সে একা একা বাগানে খেলছিল, যেমন সে প্রায়ই খেলত। উপুড় হয়ে শুয়ে সে ডেইজি ফুল দিয়ে শ্রমসাধ্য শিকলি তৈরি করছিল। তার ফিকে লাল একরাশ চুল রোদে ঝকঝক করছিল এবং তার গায়ের রঙ খুব ফরসা লাগছিল। একাগ্রতার জন্যে নীল চোখের মণি প্রসারিত হয়েছিল।

সহসা সে গোলাপের ঝোপের দিকে তাকাল। গোলাপের ঝোপের দিকে এগুতে লাগল, তার সুতির খাটো স্কার্টের নিচে গোলগাল সুন্দর পা দুটি ছিল অরক্ষিত। খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠেছে সে।

'আমার মা-বাবার সঙ্গে সে বলে ওঠে, তারপর একটু থেমে আবার বলল, 'তারা আমার মা-বাবা।' এখন সে ঝোপের ছায়ায়। মনে হচ্ছে আলোর পৃথিবী ছেড়ে আঁধারে হাঁটছে সে। জানিনা কেন বেশ একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ডাকলাম তাকে।

'ক্রিস্ট কি করছিস?'—জিগ্যেস করলাম।

'কিছু নয়।'

'এবার ভেতরে চল।'

জানিনা কার উদ্দেশ্যে সে বলল, 'এখন আমি ভেতরে যাব। বিদায়।'

সে আমার কাছে এল। আমি জিগ্যেস করি, 'হ্যাঁরে, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিলি?'

'হ্যারির সঙ্গে'—সে উত্তর দেয়।

'হ্যারি কে?'

অনেক চেষ্টা করেও তার কাছ থেকে কোনও কিছু বের করতে পারলাম না। আমি তাকে কেক আর দুধ দিলাম এবং তার কাছে বসে, তাকে পড়ে শোনাচ্ছিলাম। ক্রিস্টিন পড়া শুনতে শুনতে বাগানের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল। একবার সে হাসল আর দুলে উঠল। অবশেষে শয্যার মাঝে নিজেকে গুটিয়ে নিল। তার মনে হল নিরাপদেই রয়েছে সে।

আমার স্বামী জিম বাড়ি ফিরলে রহস্যময় হ্যারির কথা বললাম তাকে। জিম হাসল। বললে, 'ক্রিস্ট আবার দুষ্টমি শুরু করেছে?'

আমি বললাম, 'তুমি কি বলতে চাইছ?'

সে বলল, 'বাবা-মার এক ছেলে বা মেয়ে বড় বেশি নিঃসঙ্গতা অনুভব করে। তারা তাই কাল্পনিক সঙ্গীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। এই ধরনের বাচ্চারা কখনও কখনও তাদের পুতুলের সঙ্গে কথা বলে। পুতুলের প্রতি ক্রিসের কোনও আকর্ষণ

নেই। সমবয়সী বন্ধুও তার নেই। সে তাই একজন সঙ্গী কল্পনা করে নিয়েছে।'

'সব বুঝলাম! কিন্তু সে ওই বিশেষ নামটি করে কেন?'

কাঁধটি সামান্য ঝাঁকিয়ে জিম বলল, 'তুমি তো জান কিভাবে বাচ্চারা কোন জিনিস গ্রহণ করে। জানিনা আমি, কি নিয়ে চিন্তা করছ তুমি। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে কোনও চিন্তাই করি না।'

'না তেমন কোনও চিন্তা আমিও করিনা। আসল কথা কি জান, তার সম্পর্কে আমি খুবই মনোযোগী। আমি তার সত্যি মা হলে তাকে যতটা ভালোবাসতাম তার চেয়ে হয়ত বেশি ভালোবাসি, বেশি যত্ন নিই।'

'আমি জানি সে ভালোই আছে। ক্রিস সুন্দরী, তার স্বাস্থ্য ভালো, সে বুদ্ধিমতী। আমার ভাগ্য ভালো যে তার মত একটি মেয়ে পেযেছি।'

'এবং তোমারও।'

'আমরা কত বিনীত ও ভদ্র।'

একসঙ্গে হেসে উঠলা। জিম আমায় চুমু দিল। তার সান্ত্বনায় আমি চিন্তামুক্ত হলাম।

সকাল হল। আবার সূর্য উঠল। উজ্জ্বল রশ্মিতে বাগানটি আর সদ্য ফোটা গোলাপগুলি স্নাত হল। ক্রিস্টিন ঘাসের ওপর চুপ করে বসে আছে। পরে হাসি মুখে একটু একটু করে ঝোপের দিকে এগিয়ে গেল। তারপর বলে ওঠে, 'এই যে। আমি জানি আসবে তুমি, কেননা তোমায় আমি ভালোবাসি। তোমার বয়স কত? আমার বয়স পাঁচের একটু বেশি। আমি আর সেই ছোট্ট শিশুটি নই। কয়েকদিন পরেই আমি স্কুলে যাব। স্কুলে যাবার নতুন একটা পোষাক তৈরি হয়েছে আমার। সেটির রঙ সবুজ। তুমি স্কুলে যাওনা? তাহলে কি কর?' কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করেছিল সে। মাথা হেঁট করে শুনছিল সে।

রান্নাঘরে দাঁড়িয়ে হিম হয়ে যাচ্ছিল আমার সারা শরীর। কিন্তু জিমের কথা মনে হল। বলেছিল সে—'অবিবেচক হচ্ছ কেন? হাজার হাজার ছেলেমেয়ের কাল্পনিক সঙ্গী থাকে। একটু আগেই তাকে তার প্রাতঃরাশের পরবর্তী দুগ্ধ পানের জন্য ডাকলাম। সে বলে, 'হ্যারিও কি আসতে পারে?'

'না।' অদম্য একটা কান্নায় আমি ভেঙে পড়ি।

ক্রিস বলল, 'তোমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে পারলাম না সেজন্য আমি দুঃখিত, হ্যারি। এখন আমি দুধ খাব।' আমার কাছে এসে রেগে গিয়ে সে বলে, 'কেন, হ্যারিকে একটু দুধ দিলে কি হত?'

আমি জিগ্যেস করি, 'ক্রিস সোনা, হ্যারি কে?'

সে উত্তর দেয়, 'হ্যারি আমার ভাই।'

'কিন্তু তোর তো কোনও ভাই নেই। তুই তো আমাদের একমাত্র মেয়ে। হ্যারি কেমন করে তোর ভাই হবে!'

'হ্যারি আমার ভাই। সে তো এই কথাই বলে।'

ক্রিস্টিন গ্লাসের ওপর ঝুঁকে পড়ে দুধ খেল। তারপর সে তার ঠোঁটটা প্লেটে রাখা বিস্কুটের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক্ হ্যারি তাহলে তার খিদে কেড়ে নেয়নি। এইসব ঘটনার কোনও কিছুই আমি জানাতাম না তাকে। সকালে ঘটনা বললে আগের মতই সে উপহাস করবে। কিন্তু ক্রিস্টিনের হ্যারি-ফ্যানট্যাসি দিনের পর দিন বেড়েই চলল আর আমার স্নায়ুর ওপর অত্যন্ত চাপ পড়তে লাগল।

এক রবিবার জিম আমায় বললে, 'কাল্পনিক সঙ্গীর মজা কি বলত? সব সময়েই তারা শিশুটিকে কথা বলায়। লক্ষ্য করেছ, ক্রিস্ট এখন আগের চাইতেও কত সহজভাবে কথা বলে।'

'আর তার উচ্চারণ!'

'উচ্চারণে কি হল?'

'অনেকটা ইংলন্ডের গ্রাম্য উচ্চারণের মত।'

'প্রিয়তম, তুমি আমায় হাসালে দেখছি। তার কথায় গ্রাম্য টান নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নেই। লন্ডনের প্রতিটি শিশুর এ ধরনের উচ্চারণ প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আর স্কুলে গেলে নানা ধরনের শিশুর সঙ্গে মিশে টানটা আরও বেড়ে যায়।'

'কিন্তু আমাদের কথায় তো একটুও গ্রাম্য টান নেই। সে কোথা থেকে শিখল?'

'রুটিওয়ালা, গোয়ালা, ঝাড়ুদার, কয়লাওয়ালা—আর নাম করার দরকার আছে কি? তুমি বরং এক কাজ কর। ক্রিসকে একবার ডক্টর ওয়েবস্টারের কাছে নিয়ে যাও।'

'তুমি কি মনে কর ক্রিস অসুস্থ হয়েছে?'

'না—না, তা কেন? তুমি তার ব্যাপারে চিন্তিত। এদিকে এর সমাধান আমাদের গন্ডীর বাইরে। বাধ্য হয়েই তাই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হয়।'

পরের দিন ক্রিস্টিনকে ডক্টর ওয়েবস্টারের কাছে নিয়ে গেলাম। ওয়েটিংরুমে তাকে বসিয়ে রেখে আমি ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করলাম। হ্যারির কথা বললাম তাঁকে। সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বললেন, কিছুটা অসাধারণ হলেও এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। শিশুদের এমন অনেক কাল্পনিক সাথী থাকে। কাল্পনিক এইসব সঙ্গীরা এক এক সময় এত বেশি সত্য হয়ে ওঠে আর তাদের নিয়ে বাচ্চারা এতই মশগুল হয়ে পড়ে যে তাদের বাবা-মায়েরা বেশ ভয় পান। ক্রিস্টিন একা থাকে, তাই না?'

'আর কোনও শিশুকেই সে জানেনা। এ পাড়ায় আমরা নতুন এসেছি। কিন্তু স্কুলে যেতে শুরু করলে তাকে তো আর একা থাকতে হবে না।'

'হ্যাঁ। সেখানে তার বন্ধু জুটবে। তাদের সঙ্গে মিশে ক্রিস্টিনের আর কাল্পনিক সঙ্গীর কথা মনে হবে না। প্রত্যেক শিশুই সমবয়সী সাথী খোঁজে না পেলে তারা সঙ্গী আবিষ্কার করে নেয়। বৃদ্ধেরা একা থাকে, দেখেন না তারা আপনার মনে কথা কয়। তার মনে এ নয় যে তারা পাগল। আসলে তারা কারও সাথে কথা বলতে চায়। শিশু কিন্তু আরও বেশি বুদ্ধি ধরে। তাই সে একজন কাল্পনিক সঙ্গী বেছে নেয়। কোনও চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'জিমও ঠিক এই কথাই বলেছিল।'

ডক্টর ওয়েবস্টার বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই। কিন্তু আপনি যখন ক্রিস্টিনকে এনেছেন তখন আর সঙ্গে একটু কথা বলেই দেখি। আর আপনার অনুপস্থিতিতেই আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাই।' আমি ওয়েটিং-রুমে গেলাম। ক্রিস বললে, 'হ্যারি অপেক্ষা করছে?' আমি জিগ্যেস করি, 'কোথায় সে তোর জন্য অপেক্ষা

করছে?' সে বলে, 'ওইখানে গোলাপের বনে।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য ডাক্তারবাবুর সুন্দর একটা গোলাপ বাগান রয়েছে। আমি বললাম, 'না, গোলাপের বনে কেউ নেই।' ক্রিস আমার দিকে অশিশুলভ অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকাল। আমি বললাম, 'চল, ডক্টর ওয়েবস্টার তোর সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। তাঁকে তো তোর মনে আছে, তাই না? সেই যে তোর পানিবসন্ত হয়েছিল— তুই যেদিন সুস্থ হয়েছিলি ডাক্তারবাবু তোকে লজেন্স দিয়েছিলেন।' ক্রিস বললে, 'হ্যাঁ ডক্টর ওয়েবস্টারকে আমার মনে আছে।'

ক্রিসকে নিয়ে আমি ডক্টর ওয়েবস্টারের ঘরে এলাম এবং তাঁকে ঘরে রেখে আবার আমি ওয়েটিং-রুমে ফিরে এলাম। উদ্বিগ্ন হয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম। চিকিৎসকের রঙ্গ-রসিকতা আর ক্রিসের হাসির শব্দ আসছিল কানে। ওয়েবস্টারের সঙ্গে সে যেভাবে কথা বলছিল আমার সঙ্গে সে কোনওদিন সেভাবে কথা বলেনি। অবশেষে তিনি ক্রিসকে নিয়ে আমার কাছে এসে বললেন, 'কল্পনাপ্রিয় ক্রিস্টিন পাগলীকে নিয়ে অযথা চিন্তা করছেন কেন? সে সম্পূর্ণ সুস্থ। বলুক না সে হ্যারির কথা, ক্ষতি কি। হ্যারির কথা তুললে আপনি বিরক্ত হন তাই বেচারী তার ভাইয়ের কথা আপনাকে বলতে চায় না। এক কাজ করুন তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিন।' অতঃপর ডক্টর ওয়েবস্টার ক্রিসকে জিগ্যেস করেন, 'তোমার ভাই হ্যারি কাঠের পুতুল তৈরি করতে পারে?' 'হ্যাঁ খুব ভালো কাঠের পুতুল তৈরি করে সে।'—ক্রিস উত্তর দেয়।

'সে লিখতে-পড়তেও পারে, তাই না?'

'সে লিখতে পারে, পড়তে পারে, সাঁতার দিতে পারে; গাছে ওঠে, ছবিতে রঙ করে! আমায় সে খুব ভালোবাসে।' হ্যারির প্রতি ভালোবাসায় দীপ্ত হয়ে ওঠে ক্রিসের মুখ।

ডক্টর ওয়েবস্টার আমার কাঁধ ঝাঁকিয়ে দিয়ে বললেন, 'সত্যিই হ্যারির তুলনা মেলা ভার।' ক্রিসকে বললেন, 'হ্যারির চুল তোমার মতোই লাল, তাই না?' গর্বিত ক্রিস উত্তর দেয়, 'তার চুল আমার চেয়ে লাল। প্রায় বাবার মতই লম্বা সে, কেবল একটু রোগা। মা, হ্যারি ঠিক তোমার মতো লম্বা। তার বয়স চোদ্দ। সে বলে, সে নাকি তার সমবয়সীদের বেশি লম্বা।'

ওয়েবস্টার বলেন, 'ঠিক আছে মিসেস জেমস্। এখন আপনি যেতে পারেন। আবার বলি, চিন্তা করবেন না। পাগলীটা যত খুশী বকবক করুক। আর ক্রিস্টিন, হ্যারিকে আমার ভালোবাসা দিও।'

অতিবাহিত হল আর একটি সপ্তাহ। কেবল হ্যারি আর হ্যারি—হ্যারি ছাড়া ক্রিস আর কিছুই জানেনা যেন। স্কুলে যাবার আগের দিন তাকে বললাম, 'কাল স্কুলে গিয়ে দেখবি তোর কত বন্ধু জুটবে।' ক্রিস বলল, 'কিন্তু হ্যারি তো আমার সঙ্গে যেতে পারবে না।' আমি বলি, 'চোদ্দ বছরের ছেলে তোর সঙ্গে পড়বে কি করে?' ক্রিস উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হ্যারিকে ছাড়া কিছুতেই আমি স্কুলে যাব না।' কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে।

দিনের আলো তখনও মিলিয়ে যায়নি। পর্দা টেনে দিতে জানলার কাছে গিয়েছিলাম। দেখলাম সোনালী রোদ আর কালো ছায়ার খেলা চলছে বাগানে। আমি কি স্বপ্ন দেখছি। স্পষ্টই দেখলাম সাদা গোলাপ ঝোপের কাছে রোগা লম্বা একটি ছেলেকে, উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠি আমি, 'হ্যারি, হ্যারি' বাচ্চা ছেলের কোঁকড়া চুলের লালচে আভার মত আমি যেন গোলাপ বনে মাঝে সামান্য লালের আভাস পেলাম। তারপর ধীরে ধীরে স্বপ্ন মিলিয়ে গেল।

পরের দিন শুরু হয় আমার গোপন অনুসন্ধান পর্ব বাসে চেপে শহরে পৌঁছে পরিচিত সেই উঁচু বাড়িটাতে গেলাম—পাঁচ বছর আগে আমি আর জিম যেখানে গিয়েছিলাম। বাড়িটির সর্বোচ্চ তলে 'গ্রেথন' অ্যাডপশন সোসাইটি।' চারটি সোপান শ্রেণী বেয়ে রঙ চটা সেই দরজাটির সামনে এসে দাঁড়ালাম এবং করাঘাত করলাম। সরল, হাসি-খুশী মাথা ভর্তি বাদামী চুল লম্বা সেই ভদ্র মহিলা মিস ক্লিভার দরজা খুললেন আর আমায় সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, 'মিসেস জেমস্, অনেকদিন পরে আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হচ্ছে। ক্রিস্টিন কেমন আছে?' আমি বললাম, 'ভালোই আছে সে।' আর সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথা শুরু করলাম।

বললাম, 'আমি জানি যে সাধারণতঃ আপনারা পালনকারীদের শিশুটি কোথা থেকে 'পাওয়া গেছে জানাতে চান না এবং তাঁরাও তা জানতে চান না। কিন্তু বিশেষ একটি কারণে আমাকে জানতেই হবে ক্রিস্টিন কে।'

'দুঃখিত মিসেস জেমস্। আমাদের নিয়ম…'

'আমাকে সমস্ত কাহিনীটা বলতে দিন তাহলে বুঝবেন তার সম্পর্কে জানতে চাওয়াটা আমার নিছক কৌতূহল নয়।'

মিস ক্লিভারকে হ্যারির কথা বললাম। তিনি বললেন, 'মিসেস জেমস আপনার জন্যে একবার মাত্র আমি নিয়মভঙ্গ করছি। আপনাকে আমি ক্রিস্টিনের বিষয়ে বলছি—লন্ডনের দরিদ্র পরিবারে তার জন্ম। চারজনকে নিয়ে ছিল তাদের পরিবার-বাবা-মা, একটি ছেলে আর মেয়ে ক্রিস্টিন।'

'ছেলে?'

হ্যাঁ তাঁর বয়স যখন চোদ্দ তখনই ঘটনাটি ঘটেছিল।'

'কি ঘটেছিল?'

'বলছি। তার বাবা-মা ক্রিস্টিনকে চায়নি। স্যানিটরি ইন্স্পেক্টর কর্তৃক ভগ্ন, পরিত্যক্ত বলে ঘোষিত অপরিচ্ছন্ন একটি বাড়ির ওপরের তলায় থাকত। অনাহারে অর্ধাহারে কোনওরকমে তাদের দিন কাটত। তাদের কাছে শিশুটি ছিল অবাঞ্ছিত যেন কোনও দুঃস্বপ্ন। ক্রিস্টিনের মা স্নায়ুবিকারে ভুগতেন। তিনি ছিলেন নোংরা, অসুখী, মোটা জবুথুবু মহিলা। ক্রিস্টিনের জন্মের পর তার প্রতি মায়ের কোনও রকম আকর্ষণ ছিল না। কিন্তু তার ভাই তাকে খুব ভালোবাসত। ক্রিস্টিনের ভাই খুবই দুঃখ পেয়েছিল তাকে স্কুলে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে। সে তাই ক্রিস্টিনকে দেখাশুনা করত।

একদিন সকালে একতলার এক মহিলা ওপরতলা থেকে ধপ্ করে কি একটা পড়ার শব্দ শুনলেন। তিনি ছুটে দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন ক্রিস্টিনকে বুকে জড়িয়ে তার ভাই মাটিতে পড়ে রয়েছে। ছেলেটির গলার হাড় ভেঙে গেছে। সে মৃত। ক্রিস্টিনের মুখ নীল হয়েছে এবং সে জ্ঞান হারিয়েছে। কিন্তু প্রাণ আছে, ধীরে ধীরে শ্বাস নিচ্ছে সে। মহিলা সকলকে ডাকলেন। ডাক্তার এল। পুলিসে খবর পাঠানো হল। সকলে অস্বাস্থ্যকর অপরিচ্ছন্ন সেই ওপরের ঘরে গেল। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল তাই ভাঙতে হল। জানালা খোলাই ছিল, ঘরে তখনও গ্যাস জমে রয়েছে। তারা দেখল স্বামী-স্ত্রী—'আমি আর

চালাতে পারছিলাম না। তাই মৃত্যুকেই বরণ করে নিতে হল। এ ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না।'

পুলিশের মতে, মা-ছেলেমেয়ে যখন ঘুমচ্ছিল সে সময়ে লোকটি দরজা জানলা বন্ধ করে রাখায় গ্যাস ছেয়ে গিয়েছিল ঘরে। সে তার স্ত্রীর পাশে শুয়েছিল যতক্ষণ পর্যন্ত না অচেতনাতার অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল এবং মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ লাভ করেছিল। ছেলেটির চেতনা লোপ পায়নি। সে জেগে গিয়েছিল। সে দরজা খুলতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। চেঁচাবার সামর্থ্যও তার ছিল না। তাই জানলাটা কোনওরকমে খুলে সে তার প্রিয় বোনটিকে কোলে নিয়ে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

আমি বললাম, 'তার ভাই তাহলে তাকে বাঁচাল?' হ্যাঁ। সে খুব সাহসী ছেলে ছিল'—মিস ক্লিভার উত্তর দিলেন। তিনি পুনরায় বললেন, 'সম্ভবতঃ ক্রিস্টিনকে বাঁচানোর চেয়ে তার নিজের কাছে রাখাতেই তার বেশী আগ্রহ ছিল।'

'আচ্ছা মিস ক্লিভার, ছেলেটির নাম কি?'

একটা ফাইল খুলে অনেক ঘেঁটে অবশেষে তিনি বললেন, 'তার পারিবারিক নাম জোনস এবং চোদ্দ বছরের ছেলেটিকে তারা হ্যারলড বলে ডাকত।

'তার কি লাল চুল ছিল?'

'জানিনা, মিসেস জেমস্।'

কিন্তু আমি যে ছেলেটির খোঁজ করছি তার নাম হ্যারি। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সব কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।'

'আমার কি মনে হয় জানেন? ক্রিস্টিনের সমস্ত মন জুড়ে বিরাজ করছে তার শৈশবের একমাত্র সাথী, তার ভাই। আমরা ভাবি বাচ্চাদের খুব একটা স্মৃতি শক্তি থাকে না। কিন্তু অতীতের অনেক ঘটনা তাদের মনে রেখাপাত করে যায়। হ্যারিকে তাই ক্রিস্টিন আবিষ্কার করেনি, সে তার মনে থেকে গেছে। সেই তো তার প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছিল।'

'তারা যে বাড়িতে থাকত অনুগ্রহ করে আমায় সে বাড়ির ঠিকানাটি দিন না।'

যে বাড়িতে ক্রিস্টিনরা ছিল দেখলে মনে হয় সেটি এখনও জনশূন্য, অকেজো এবং পরিত্যক্ত। কিন্তু ছোট্ট একফালি বাগান আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এখানে-সেখানে ঘাস গজিয়েছে। সাদা গোলাপের ঝোপ বজায় রেখে তার অস্তিত্ব। চমকে উঠি। কে যেন বলল, 'এখানে আপনি কি করছেন।' চেয়ে দেখি একতলার জানলা দিয়ে উঁকি দিচ্ছেন এক বৃদ্ধা।

'আমি ভেবেছিলাম বাড়িটিতে কেউ থাকে না।'

'না থাকাই উচিত ছিল। এরকম ভাঙা বাড়িতে কি কোনও মানুষ থাকে। কিন্তু বাড়িওয়ালাও আমায় তাড়ায়নি, আমিও রয়ে গেলাম। আর যাবই বা কোথায়! আমার তো কোনও যাবার জায়গা নেই। তাছাড়া সেই দুর্ঘটনার পর থেকে এ বাড়ির ত্রিসীমানায় কারও দেখা মেলে না। লোকে বলে এটি ভূতে বাড়ি। তারা ঠিকই বলে। কিন্তু হৈ-চৈ করে কি লাভ? জীবন আর মৃত্যু পাশাপাশি, খুবই কাছাকাছি অবস্থান করে! বুড়ো হলে এটা বোঝা যায়। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া—তফাৎ কি?

রক্তিম চোখে হলুদ দৃষ্টি মেলে বৃদ্ধা আমার দিকে তাকালেন। ভয়ে আমার বুকের রক্ত চলকে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি স্বচক্ষে তাকে পড়ে যেতে দেখেছিলাম। আর ওই সাদা গোলাপের ঝোপে পড়েছিল সে। এখনও সে আসে। বোনটিকে সে যতক্ষণ না পাবে, যাবে না সে।'

'আপনি কার কথা বলছেন?'

'হ্যারি জোনস্। ভারি সুন্দর ছেলে সে। মাথা ভর্তি লাল চুল, রোগা। ক্রিস্টিনকে খুব ভালোবাসত সে। গোলাপ-ঝোপে মারা গিয়েছিল। সত্যি কি মানুষ মরে? গির্জার উচিত এর উত্তর দেওয়া, কিন্তু গির্জা উত্তর দেয় না! একজনকেও তুমি বিশ্বাস করতে পার না। চলে যাও। যাবে কি? এ জায়গা তোমার নয় সুন্দরী। যারা মৃত নয় এমন মৃত, কিংবা জীবিতদের মধ্যে এমন কেউ নেই যাদের সত্যি জীবিত বলা যেতে পারে তাদের জন্যেই এই বাড়ি।'

অবিন্যস্ত অশাসিত সাদা চুলের নিচে তাঁর উন্মত্ত দৃষ্টি নিয়ে তিনি আমার দিকে কট্‌মট্ করে তাকালেন। ভয়ে আমার বুক ধড়ফড় করছিল। উন্মাদকে কে

না ভয় করে! তাঁকে দেখে অনুকম্পা বোধ করলেও আসলে প্রত্যেকেই তাঁকে ভয় পায়। গনগনে রোদে অগ্নিদগ্ধ পথ দিয়ে হন্‌হন্‌ করে চলছিলাম, যদিও পা দুটো অসম্ভব রকমের ভারি লাগছিল আর হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়েছিল। আকাশের ওপর দপদপ করে জ্বলছিল মধ্যাহ্ন সূর্য। কড়া রোদ্দুর সোজা পড়ছিল আমার মাথায়। কিন্তু সেদিকে মন দেওয়ার অবস্থা আমার ছিল না। পদে পদে ঠোক্কর খেয়ে কোনওরকমে এগোচ্ছিলাম। স্থান-কালের অনুভূতিটুকুও লোপ পেয়েছিল আমার। এমন সময়ে আমার কানে এল তিনটের ঘন্টা। এ সময়ে আমি ক্রিস্টিনের প্রতীক্ষায় তার স্কুলের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকি।

এখন আমি কোথায়? স্কুল কতো দূরে? কোন্‌ বাসে চড়ব? পথচারীদের কাছে উন্মত্তের মতো পথের সন্ধান নিচ্ছিলাম। তারা সকলেই আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকাচ্ছিল আমি যেমন সেই বুড়িটার দিকে চেয়েছিলাম। অবশেষে আমি ঠিক বাস ধরে ছিলাম আর পেট্রলের গন্ধমাখা, ধূলি-ধূসর, ভয়ে কেঁপে ওঠা শরীরটা নিয়ে স্কুলে পৌঁছেছিলাম। রৌদ্রতপ্ত শূন্য খেলার মাঠ দিয়ে দৌঁড়তে দৌঁড়তে আমি শ্রেণীকক্ষের সামনে গেলাম। সাদা পোষাক পরা শিক্ষিকা তাঁর বইপত্র গুছোচ্ছিলেন। ক্রিস্টিনকে নিতে এসেছি। আমি তার মা। অত্যন্ত দুঃখিত আসতে আমার দেরি হয়ে গেছে। সে কোথায়?'—আমি কোনওরকমে জিগ্যেস করি।

'ক্রিস্টিন জেমস? হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে। মাথা ভর্তি লাল চুল সেই মিষ্টি মেয়েটি তো? কেন তার ভাই তো তাকে নিয়ে গেছে। ভাই-বোনে কি অদ্ভুত মিল, তাই না! আর তারা পরস্পর পরস্পরকে কী অগাধ ভালোবাসে! ওই বয়সের কোনও ছেলেকে তার বোনকে এত ভালোবাসতে খুব কমই দেখা যায়! কিছু মনে করবেন না যেন, একটা কথা জিগ্যেস করি, ছেলে মেয়ের মত আপনার স্বামীরও কি লোহিত কেশ?'

ক্ষীণ কণ্ঠে আমি প্রশ্ন করি, 'তার ভাই কী বলল?'

'কোনও কিছুই বলেনি সে। সে শুধু মৃদু হাসছিল। দুশ্চিন্তা করবেন না, এতক্ষণ নিশ্চয়ই তারা বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

'ধন্যবাদ। আমাকে এখন বাড়িতে যেতে হবে।'

রোদে পোড়া রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে আমি বাড়ি ফিরেছিলাম। 'ক্রিস! ক্রিস্টিন, কোথায় তুই। ক্রিস! ক্রিস'—নিরালা ঠাণ্ডা আমার শোবার ঘরে আমার সেদিনের সেই কাতর আর্তনাদ আজও আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। ক্রিস্টিন! ক্রিস! কৈ তুই? উত্তর দে। হ্যারি দোহাই তোমার। ক্রিস্টিনকে তুমি নিয়ে যেও না। ফিরে এস! হ্যারি! হ্যারি!' উন্মত্তের মতো সারা বাগান আমি ছুটে বেড়িয়েছিলাম। সূর্যরশ্মি গরম ছুরির শাণিত ফলক নিয়ে যেন আমায় বিদ্ধ করছিল। প্রস্ফুটিত সাদা গোলাপ আমার চোখ ঝলসে দিচ্ছিল। বাতাস যেন হারিয়ে ফেলেছিল তার প্রবাহমানতা! স্থান-কালের অনুভূতিহীন অত্যাশ্চর্য একটা জায়গায় যেন আমি দাঁড়িয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল ক্রিস্টিন যেন আমার খুব কাছেই রয়েছে অথচ তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম না। সাদা গোলাপগুলো আমার চোখের সামনে আন্দোলিত হতে হতে লাল গোলাপে রূপান্তরিত হলো। আমার সারা পৃথিবী লালে লাল হয়ে গেল। রক্তে ভেজা লাল। লাল রঙ দেখতে দেখতে আমি চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলাম তারপর আর কিছুই জানিনা।

বেশ কয়েক সপ্তাহ সর্দি-গরমিতে ভুগলাম। অবশেষে মস্তিষ্ক-প্রদাহে শয্যাশায়ী হয়েছিলাম। জিম এবং পুলিস তন্ন তন্ন করে ক্রিস্টিনকে খুঁজে ছিল, কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছিল। কয়েকমাস পর্যন্ত এই ব্যর্থ অনুসন্ধান চলেছিল। খবরের কাগজ বেশ রসিয়ে রসিয়ে লালচুল মেয়েটির অন্তর্ধান কাহিনী প্রচার করেছিল। যে ভাই স্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে ক্রিস্টিনকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল তার কথাও বাদ দেয়নি। ছেলেধরা, শিশু হত্যাকারী পল্লবিত অনেক কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছিল। এক সময় সব কিছু থিতিয়ে গেল। পুলিস-ফাইলে ক্রিস্টিনের ইতিবৃত্ত অনিরূপ্তি, অমীমাংসিত ঘটনা হিসাবে স্থান পেল। সেই নোংরা বাড়ির বীভৎস বৃদ্ধা আর আমি শুধু জানি ক্রিস্টিনের কী হয়েছিল।

বছর কেটে গেল। কিন্তু এখনও আমি ভয় পাই। রৌদ্রকিরণ, ঘাসের ওপর পড়া তীক্ষ্ণ ছায়া, সাদা গোলাপ, লাল চুল শিশু—এইসব সাধারণ জিনিস দেখে আমি ভয় পাই। আর হ্যারি নামটা শুনলেই আমি ভয়ে কেঁপে উঠি।

পরলোকের হাতছানি

আলফ্রেড হিচকক

আজকে আমি যে গল্প বলব, তা হয়ত সকলের বিশ্বাস হবে না। যদি আমি প্রত্যক্ষ না করতাম, তা হলে আমিই বিশ্বাস করতাম না।

সেই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে ইটালীর লাসস্পেজিয়া বন্দর নগরীতে।

এই বন্দর নগরীর মধ্যে একটা কাঠের পূর্ণাঙ্গ নারীর মূর্তি ছিল। তার নাম ছিল "এ্যাটলান্টা।"

মূর্তিটা কাঠের হলেও তাকে জীবন্ত মনে হয়। আঠারো বছর বয়সী যুবতী যেন জীবন্ত হয়ে কাঁচের ঘেরা বাক্সে দাঁড়িয়ে আছে।

সোনালী চুলে লাল রঙের গাউন পরে এ্যাটলান্টা দাঁড়িয়ে আছে। তাকে নিয়ে শহরের লোকদের কৌতূহলের শেষ নেই। তার নামে কত কথাই না শোনা যায়।

শোনা যায় এ্যাটলান্টার কাঠের মূর্তিটা বহুদিন আগে সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে লাসস্পেজিয়া বন্দরে আসে। শহরের মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ মূর্তিটাকে মিউজিয়ামে সযত্নে রাখে কেবলমাত্র মূর্তিটার অদ্ভুত কারুকার্য্যের জন্য।

মিউজিয়ামের কিউরেটার, অর্থাৎ যিনি এসব জিনিষ রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তিনি হলেন পঁয়ত্রিশ বছরের মিঃ পল স্মিথ।

মিঃ পল স্মিথ খুবই সাধাসিধে ও সরল প্রকৃতির লোক। তিনি অবিবাহিত। মিউজিয়ামের পাশে কোয়াটারে থাকেন।

এই মিঃ পল স্মিথ সমস্ত দিনের মধ্যে যখনই সময় পান, সঙ্গে সঙ্গে এ্যাটলান্টার সামনে এসে দাঁড়ান। এক মনে এ্যাটলান্টার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

এ্যাটলান্টার ভেতরে তিনি যে কি আবিষ্কার করতে চান, সেটা একমাত্র তিনিই বলতে পারেন।

অনেক সময় রাত্রে মোমবাতি নিয়ে তিনি মূর্তিটার কাছে আসেন। একমনে মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

মিঃ পল স্মিথের কাণ্ডকারখানা দেখে প্রথম প্রথম তার বন্ধু বান্ধব হাসিঠাট্টা করতেন। বিদ্রূপ করতেও ছাড়তেন না।

কিন্তু তাতেও পল স্মিথের মোহ ভঙ্গ হয় না।

এক সময় কথাটা মিউজিয়ামের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কানে যায়। তাঁরা মিঃ পল স্মিথকে ডেকে মৃদু ভৎসনা করেন। এই পাগলামীর বিষয় সতর্ক হতে উপদেশ দেন।

কিন্তু তাতেও মিঃ পল স্মিথের অভ্যাস দূর হয় না। অনেক চেষ্টা করেও তিনি নিজেকে সংযত করতে পারেন না। মূর্তিটার আকর্ষণে তিনি পাগল হয়ে ওঠেন।

মিঃ পল স্মিথের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বলতে গেলে হঠাৎই।

লেখার প্লট খোঁজার জন্য অনেক সময় আমাকে মিউজিয়ামে যেতে হয়।

অনেক দিনই দেখেছি মিঃ পল স্মিথকে মন্ত্রমুগ্ধের মত কাঁচের বাক্সে ঢাকা কাঠের মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছেন।

একদিন কৌতূহল বশত ধ্যানস্থ মিঃ পল স্মিথের কাঁধে হাত রাখি।

মিঃ পল স্মিথ ভূত দেখার মত চম্‌কে ওঠেন। স্বপ্ন মাখা দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকান। ধাতস্থ হতে অল্প সময় লাগে।

তারপরই আমার দিকে হাত বাড়ান করমর্দন করার জন্য।

মুখে বলেন, আপনিই তো বোধ হয় প্রখ্যাত মিঃ হিচকক?

মিঃ পল স্মিথের প্রশ্নে আমি অবাক হই। কেননা, আগে কখনও ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে মনে হয় না।

তাই বলি, আপনার অনুমান ঠিক মিঃ স্মিথ। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি আমাকে চিনতে পারলেন কি করে?

মিঃ পল স্মিথ মৃদু হাসেন। বলেন, এতো সামান্য জিনিষ। আমি বিগত পাঁচশো বছর আগের ঘটনা ও আগামী পাঁচশো বছর পরে কি হবে তা বলে দিতে পারি।

মিঃ পল স্মিথের কথা শুনে ওকে বদ্ধ পাগল ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারি না।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে মিঃ পল স্মিথ মৃদু হাসেন।

বলেন, ভাবছেন আমি হলাম একজন বাক্যবাগীশ। বেশ, তাহলে শুনুন আমার জীবনের গল্প।

এবার আমি প্রমাদ গুনি। কেননা, একটা বদ্ধ পাগলের প্রলাপ শুনে সময় নষ্ট করতে হবে ভেবে মনে মনে বেশ চোটে যাই। তবে মুখে কিছু বলি না। ঘরের জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকাই। মনকে অন্যমনস্ক রাখতে চেষ্টা করি।

সে সময় আকাশে কাল মেঘ দুরন্ত বালকের মত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। প্রচণ্ড বাতাসের ছোঁয়ায় সাগরের জলে ভীষণ গর্জ্জন হতে শুরু করে।

মিঃ পল স্মিত এ্যাটলান্টার মূর্তির দিকে তাকান। বলেন, ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগে। অর্থাৎ ১৭৭৪ সালের ১৩ই অক্টোবর।

এ্যাটলান্টাকে আমি সবে বিয়ে করি। তার রূপের কাছে আকাশের চাঁদের আলো যেন ম্লান হয়ে যায়।

প্রমোদ ভ্রমণের জন্য এ্যাটলান্টাকে নিয়ে আমি প্রমোদ তরী সমুদ্রের জলে ভাসাই।

দেখতে দেখতে কয়েকমাস আমাদের আনন্দের মধ্যে দিয়ে কাটে।

কিন্তু এত আনন্দ আমার ভাগ্যে সয় না।

একদিন এ্যাটলান্টাকে নিয়ে নিছক নিরালায় বেড়াবার জন্য আমি বনের মধ্যে প্রবেশ করি। দুজনে আস্তে আস্তে হাঁটি। বনের পাখীদের কলরব আমাদের বেশ ভাল লাগে। এক এক সময় এ্যাটলান্টা মন খুলে খিল খিল করে হাসে।

তার হাসির মধ্যে আমি যন্ত্র সঙ্গীতের নানান ছন্দের আভাষ পাই। দুজনের মন আনন্দের সাগরে ভেসে যায়।

হঠাৎ কি যেন অ্যাটলান্টার চিবুক দংশন করে।

এ্যাটলান্টা মৃদু আর্তনাদ করে জঙ্গলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়।

ব্যাপারটা আমি প্রথমে বুঝতে পারি না। তাকে কোলে করে অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জায়গায় শুইয়ে দিই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চম্‌কে উঠি। ওর চিবুকের ওপরে পরিষ্কার ক্ষতের চিহ্ন দেখতে পাই। তখনও ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত ঝরে পড়ছে।

এ্যাটলান্টাকে ঝাঁকুনি দিই। সামান্য ব্যাপারে অযথা ভয় পেতে বারণ করি।

কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারি, আমার এ্যাটলান্টা আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে, চলে গেছে। শুধুমাত্র তার প্রাণহীন দেহটা আমার সামনে পড়ে আছে।

আমি মাথা নেড়ে মিঃ পল স্মিথের কথায় সম্মতি জানাই।

মিঃ পল স্মিথ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। বলে, এ অবস্থায় আমি ভেঙ্গে পড়ি। এ্যাটলান্টাকে শুধুমাত্র চোখ খুলে কথা বলতে অনুরোধ জানাই।

কিন্তু কখনই যে সে চোখ খুলবে না, ও কথাও বলবে না, তা তখন আমার মাথায় আসে না।

যখন সবটা বুঝতে পারি, তখন মনে মনে আমার পরিকল্পনা ঠিক করে ফেলি। এ্যাটলান্টার মৃতদেহ নিয়ে সমুদ্রের জলে নৌকা ভাসাই।

এক সময় অতি কষ্টে তাকে নিয়ে আমি মিশর দেশে পৌঁছাই। সেখানে তার দেহটা কাঠের মমি করে দিই। সমুদ্রের জলে ভাসাই।

তারপর একদিন সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে সে এই বন্দর শহরে আসে।

আমিও নূতনভাবে জন্ম নিই এই শহরে। আমার নাম হয় পল স্মিথ। ঘটনাচক্রে আমি এই শহরের মিউজিয়ামে কিউরেটারের চাকরী পাই।

জন্মান্তরের পরও আমি এ্যাটলান্টাকে ভুলতে পারি না।

কিউরেটারের চাকরী পাবার পর থেকে আমি সব সময় এ্যাটলান্টাকে পাহারা দিয়ে রাখি। মুহূর্তের জন্যও তাকে চোখের আড়াল করি না।

মিঃ পল স্মিথ সাময়িকভাবে চুপ করেন।

মিউজিয়ামের বাইরে প্রচণ্ড জল ঝড়ের শব্দ ভেসে আসতে থাকে।

মিঃ পল স্মিথ দু-হাতে নিজের কপাল চেপে ধরেন। মিউজিয়ামের ঘরের মেঝেতে বসে পড়েন।

মিঃ পল স্মিথের কথা এক বর্ণও আমার বিশ্বাস হয় না। সবটাই গালগল্প বলে মনে হয়।

কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে মিঃ পল স্মিথের দেহের অদ্ভুৎ পরিবর্তন হতে শুরু করে।

অল্প সময়ের মধ্যে তার দেহের মাংস ইত্যাদি অদৃশ্য হয়। মিঃ পল স্মিথের দেহটা শুধুমাত্র কঙ্কালে পরিণত হয়। সে বিভৎস ভাবে হাসতে থাকে।

কঙ্কালের অট্টহাসির দমকে মিউজিয়ামের দেয়ালের পলেস্তারা খসে পড়তে শুরু করে। চারিদিকে রোমহর্ষ পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

এদিকে এ্যাটলান্টার কাঠের মূর্তির ঠোঁটের কোণায় ধীর পায়ে বেরিয়ে আসে। মিঃ পল স্মিথের কঙ্কাল দেহটাকে জড়িয়ে ধরে!

ভয়ংকর স্বপ্ন

গি, দ্য, মঁপাসা

একদিন বৃষ্টি ভিজে আমার প্রণয়িনী বাড়ীতে আসে।

তারপরই তার সর্দ্দি লাগে কাশি হয়। বেঘোর জ্বরে শয্যাগত হয়ে পড়ে।

ডাক্তার আনি। ডাক্তার ওকে পরীক্ষা করে। ওষুধ দেয়। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় না। একদিন সে আমাকে ছেড়ে চলে যায়।

আমাদের দুজনের মধ্যে এমন একটা মিলমিশ ভাব ছিল যে, আমরা একে অন্যকে ছেড়ে থাকতে পারতাম না।

কাজেই, এই নিদারণ আঘাত আমার মনে খুবই আঘাত হানে। ওর কাজকর্ম শেষ করে আমি আর বাড়ী থাকতে পারি না। দেশান্তরে বেরিয়ে পড়ি। অনেকদিন অনেক দেশ ঘুরে সবে গতকাল বাড়ীতে ফিরে এসেছি।

নিজের ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে অতীতের নানান স্মৃতি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমি যেন নিজেকে আয়ত্বের মধ্যে রাখতে পাচ্ছি না।

এক সময় মনে হয় জানালা দিয়ে বাড়ীর নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ি। জীবনের সব জ্বালা থেকে রেহাই পাই।

এক সময় অসহ্য হয়ে আমি মাথার টুপিটা তুলে নিই। বাড়ী থেকে অন্য কোথাও যাবার কথা ভাবি।

কিন্তু হল-ঘরের সামনে এসে আমি থমকে দাঁড়াই। হল-ঘরের একদিকে একটা প্রমাণ সাইজের আয়না আছে! ও যখন বাইরে কোথাও যেত, তখন এই আয়নাটায় নিজেকে বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতো।

আয়নার সামনে এসে আমি যেন কি রকম হয়ে যাই। আয়নার ভেতরে আমি আমার প্রিয় প্রণয়িনীকে দেখতে পাই। ঠিক যেমন আগে দেখতে পেতাম।

সবটাই আমার কাছে অসহ্য লাগে। আমি অতিকষ্টে হলঘর থেকে বার হই। প্রায় এক রকম দৌড়ে আমার প্রণয়িনীর দেহটা যে কবরখানায় কবর দেওয়া হয়েছে, সে কবরখানায় যাই।

আমার প্রণয়িনীর কবরটা বের করতে বেশী সময় লাগে না। কবরের ওপরে একটা সাদা ক্রশচিহ্ন ও কয়েকটা কথা লেখা আছে। লেখাগুলো হল "ও আমাকে ভাল বেসেছিল। আমার কাছ থেকে ভালবাসা পেয়েও ছিল। অকালে মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য হয়।"

সমাধি বেদীর ওপরে আমি বসে পড়ি। যখন মনে হয়, এতদিনে হয়ত তার দেহখানা প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। আমি নিজেকে আয়ত্বে রাখতে পারি না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠি।

এভাবে কতক্ষণ যে আমি কবরের বেদীর ওপরে বসে কেঁদেছি, তা আমার মনে পড়ে না।

হঠাৎ এক সময় মনে পড়ে দিনের আলো কমে এসেছে। অন্ধকার পৃথিবীর ওপরে অধিকার বিস্তার করতে ব্যগ্র।

সে সময় আমার প্রণয়িনীর কবর থেকে চলে যেতে আমার মন চায় না। সারারাত এখানে বসে চোখের জলে কবরের বেদীটা ভিজিয়ে দিতে মন চায়।

কিন্তু সমস্যা হল, সন্ধ্যের পর আমাকে কবরখানায় থাকতে দেবে না কবরখানায় ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি।

আমার মন আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে এতবেশী কঠিন হল যে, আমি ছলে বলে কৌশলে কবরখানায় রাত কাটাবার কথা ঠিক করে ফেলি।

আমার প্রণয়িনীর কবর থেকে উঠে দাঁড়াই। কবরখানার রাস্তা দিয়ে অন্যান্য কবর দেখতে দেখতে এগোই।

এক সময় কবরখানার শেষ প্রান্তে এসে পড়ি। এখানকার কবরগুলো প্রাচীন। এতদিনে মৃত ব্যক্তির সামান্যতম অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। এখন এখানে অযত্নে গোলাপের ও বিশাল কালো সাইপ্রাসের জঙ্গল। কবরের ওপরকার ক্রুশ চিহ্নটা কালের করাল আক্রমণে প্রায় ক্ষয়ে গেছে। আগামীদিনে হয়ত নূতন মৃতদেহ এই পুরাতনের অস্তিত্ব মুছে দেবে। নূতনের জয়যাত্রা শুরু হবে।

আমি আর সময় নষ্ট করি না। সবুজ গাছের ঝোপের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকি। জাহাজ ডুবির পর ভাসমান জাহাজের যাত্রীরা যেমন এক টুকরো কাঠ পেলে তা ধরে নিজেদের বাঁচাতে চেষ্টা করে, ঠিক সে রকম করে আমিও একটা মোটা গাছকে প্রাণপণে জড়িয়ে তার সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করি।

ধীরে ধীরে অন্ধকার পৃথিবীর বুকে নেমে আসে। চারিদিক অন্ধকার চাদরের আড়ালে ঢেকে পড়ে। আমি আমার আত্মগোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে আসি। দুপাশের কবরের মাঝখানের পথ ধরে পায়চারি করি।

অনেকক্ষণ ধরে কবরখানায় একলা ঘুরে বেড়াই। কিন্তু কখনই আমার প্রিয় প্রণয়িনীর কবরটা বের করতে পারি না।

অন্ধকারে অন্ধের মত দুহাত সামনে বাড়িয়ে কবরের মধ্যে এগোই। কবরের ওপরে রাখা ক্রুশ ইত্যাদিতে আমার হাতে, পায়ে, বুকে, এমন কি মাথায় পর্য্যন্ত আঘাত পাই। তবুও আমি আমার প্রণয়িনীর কবর বের করতে পারি না।

তবুও আমার চেষ্টার ত্রুটি থাকে না অন্ধের মত কবরের ওপরকার খোদাই করা ফলকের অক্ষরের ওপর হাত বুলিয়ে ফলকে কি লেখা আছে পড়তে চেষ্টা করি।

স্বভাবতঃই সকলের বুঝতে অসুবিধে হবে না যে, সে রাতটা আমার কাছে কতই না ভয়ঙ্কর?

আকাশে চাঁদ না থাকায় ক্রমে সবটাই আমার কাছে অন্ধকার হয়ে এল।

আমি মনে মনে বেশ ভয় পেলাম। দুদিকে সারি সারি কবরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি যে করব তা ভেবে পাই না।

এক সময় একটা কবরের বেদীর ওপরে বসে পড়ি। কেননা, ক্লান্তি আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। আমি আর হাঁটতে পাচ্ছি না। আঘাত-প্রাপ্ত হাতে বেশ যন্ত্রণা শুরু হয়েছে।

চারিদিক এত নিঃস্তব্ধ যে আমি আমার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দনের ধ্বনি শুনতে পাই।

হঠাৎ এক সময় কবরখানায়, আমার খুব কাছে একটা শব্দ হয়। শব্দটা যে কিসের তা আমি বুঝতে পারি না। এ রকম শব্দ যে আগে কোনদিন শুনেছি, তা মনে করতে পারি না।

একবার মনে হয়, এই শব্দটা হয়ত অন্য কোথাও হয়েছে। ভীত সন্ত্রস্ত মনে, মনে হচ্ছে যে, শব্দটা কবরখানায় হচ্ছে।

তবুও আতঙ্ক দৃষ্টি নিয়ে কবরখানায় চারিদিকে তাকাই। দেখতে দেখতে আমার হাত-পা অবশ হয়ে আসে। শরীর প্রায় মৃত মানুষের মত ঠাণ্ডা হয়। চিৎকার করে কারও সাহায্য পেতে চাই। কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে অব্যক্ত শব্দ ছাড়া আর কিছুই বের হয় না। আমি মনে প্রাণে মৃত্যুর জন্য তৈরী হতে থাকি।

কতক্ষণ যে এভাবে কবরের ওপরে বসেছিলাম, তার খেয়াল আমার নেই।

হঠাৎ এক সময় আমার মনে হয় যে, আমি যে কবরের ওপরকার মার্বেল পাথরের বেদীর ওপরে বসেছিলাম, সে পাথরটা আস্তে আস্তে নড়ছে। কেউ যেন ওটাকে ওপরে তোলার চেষ্টা করছে।

এ অবস্থায় আমার অজান্তে আমি এক লাফ দিয়ে পাশের কবরের বেদীর ওপরে গিয়ে পড়লাম। ছেড়ে আসা পাথরটার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে চেষ্টা করি।

এবার আমি স্পষ্ট দেখতে পাই যে, সেই মার্বেল পাথরটা আস্তে আস্তে ওপর দিকে উঠছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটি উলঙ্গ কঙ্কালকে দেহটাকে নীচু করে পাথরটাকে ওপরের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে দেখি!

সেই কবরের ক্রুশ চিহ্নে লেখা আছে, "এখানে যে ভদ্রলোক শুয়ে আছেন তার নাম জ্যাক আলিভ্যাঁ। তিনি মাত্র একান্ন বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি নিজের পরিবারের প্রত্যেককে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন! তিনি দয়ালু ও সম্মানীত ব্যক্তি ছিলেন। ঈশ্বরের অশেষ করুণায় তিনি মুক্তিলাভ করেছেন।"

কঙ্কালটি কবরের ওপরকার ফলকটিতে খোদাই করা লেখাগুলো পড়ে। রাস্তা থেকে ছুঁচোলো একটা পাথরের টুকরো নেয়। অশেষ ধৈর্য্য সহকারে ফলকের ওপরকার লেখাগুলো তুলে ফেলতে চেষ্টা করে। এক সময় খোদাই করা লেখাগুলো পাথরের ফলকের উপর থেকে মুছে যায়।

এবার কঙ্কালটি ছোট ছেলেদের মত চক্‌মকি পাথরে আলো সৃষ্টি করে ফলকের ওপরে লেখে। "এখানে প্রকৃত বিশ্রাম করছেন জ্যাক অলিভ্যাঁ। তিনি একান্ন বছর বয়সে মারা যান। পিতার সম্পত্তির মালিকানার জন্য তিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করেন। নিজের পতিব্রতা স্ত্রীকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিয়েছেন। সন্তানদের কষ্ট দিতে ছাড়েন নি। এ ছাড়াও প্রতিবেশীদের প্রতারণা করেছেন। সুযোগ পেলেই তিনি করতেন। শেষে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করে তিনি মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হন।"

এরপর কঙ্কালটা নিজের কবরের ফলকের সামনে দাঁড়ায়। নিজের লেখা বেশ মনযোগ সহকারে পড়ে।

তার পরেই পেছন ফিরে অন্যান্য কবরগুলো দেখি।

দেখি সব কবরের ওপরের বেদী খোলা। প্রত্যেকটি কবর থেকে মৃতদেহগুলো বেরিয়ে পড়েছে। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরা যা লিখেছিল, তা মুছে ফেলে। তার পরিবর্তে প্রকৃত সত্য কথা লেখে।

প্রতিটি ফলকে তাকিয়ে দেখি, প্রায় প্রত্যেকটি মৃত দেহই তার প্রতিবেশীদের কষ্ট দিয়েছে। তারা অসাধু ও ভণ্ড। এমন কোন কাজ নেই যা করেনি!

এসব দেখে আমার মনে হয় আমার প্রণয়িনীও নিশ্চয়ই তার জন্য কিছু লিখেছে।

এরপর আমার মন থেকে ভয়ডর দূর হয়। আমি মৃতদেহদের পাশ কাটিয়ে আমার প্রণয়িনীর কবর খুঁজতে শুরু করি।...

এক সময় কাপড়ে মুখঢাকা আমার প্রণয়িনীকে আমি দেখতে পাই। মুখ কাপড় দিয়ে ঢাকলেও আমি পেছন থেকে আমার প্রণয়িনীকে চিনতে পারি। এক ছুটে প্রণয়িনীর কবরের ওপরকার ফলকের দিকে ছুটি।

দেখি, সে ফলকে আগে যা লেখাছিল তা কে যেন মুছে ফেলেছে। সেখানে আমার প্রণয়িনীর হাতের লেখার মত কে যেন লিখেছে, "নিজের প্রেমিককে প্রতারণা করার জন্য একদিন মুষলধারে বৃষ্টিতে আমি বাড়ী থেকে বেরোই। ফলে প্রচণ্ড সর্দ্দির প্রকোপে আমার মৃত্যু হয়।"

তার পরের ঘটনা আমি মনে করতে পারি না।

পরের দিন কবরখানার কর্মচারী আমাকে আমার প্রণয়িনীর কবরখানার ওপরে অজ্ঞান অবস্থায় দেখে।

অন্ধকারের অতিথি

হেনরী সিসিল

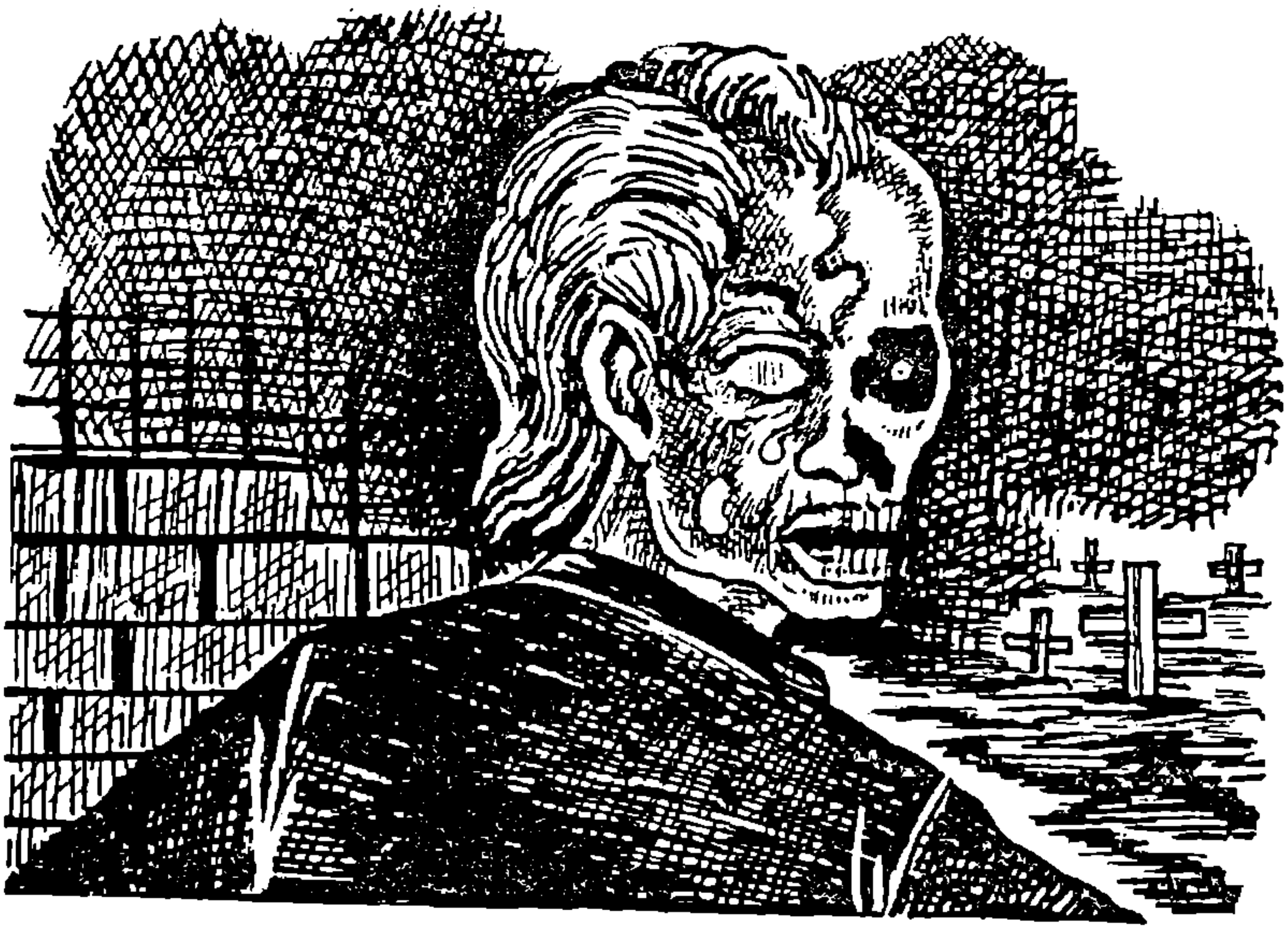

একঘেয়ে জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য কয়েকদিন ছুটি নিই। লণ্ডনের লেকল্যাণ্ড হোটেলের পানশালায় বসে আরামে সময় কাটাবার পরিকল্পনা করি।

দিনগুলো বেশ ভালই কাটছিল। হঠাৎ আজকে লণ্ডনের একজন দাম্ভিক ছোটখাটো চেহারার উকিল পানশালায় আসে। সমানে নানান বিষয়ে এমনভাবে বক্তৃতা দেয় যে, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বিরক্ত বোধ করে।

আমার তো মনে হয়, এখন যদি কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটতো, তা হলে দাম্ভিক উকিল ভদ্রলোকের উপযুক্ত শাস্তি হত।

কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও সে রকম কিছু ঘটে না। ফলে উকিল ভদ্রলোকের বক্তৃতায় কোন ছেদ পড়ে না।

এক সময় দুজন আগন্তুক পানশালায় ঢোকে। তাদের পোষাক-আষাক খুবই

সাধারণ। ওদের না চেনার জন্য সাময়িকভাবে উকিল ভদ্রলোকের বক্তৃতায় ছেদ পড়ে।

আগন্তুকরা পানশালার বিরাট টেবিলের সামনেকার চেয়ারে বসে। পরপর কয়েক গ্লাস পানীয় পান করে। পরে, আমাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে, আমরা অবর্ণনীয় কষ্ট করে গ্রিমস্টোন ক্র্যাগের চূড়োয় উঠলাম। কিন্তু আমরা নিরাশ হলাম। সে যা দেখবো বলে ভেবেছিলাম, তার কিছুই দেখতে পেলাম না। সময়টা আমাদের বৃথাই গেল।

আগন্তুকদের দেখে ও ওদের কথাবার্তা শুনে পানশালার উপস্থিত লোকেরা তাদের কেউ পাত্তা দেয় না।

বড় টেবিলের শেষদিকে বসে থাকা একজন ছোটখাট ভদ্রলোক নড়েচড়ে ওঠে। বলে, সময় বৃথা যাওয়ার অর্থ আপনারা জানেন মহাশয়?

ফলে, সকলেই প্রশ্ন কর্তার দিকে তাকায়। আমিও এতক্ষণ লোকটার দিকে তাকাইনি।

ভদ্রলোক বলে, তা হলে সময় বৃথা যাওয়ার একটা গল্প আপনাদের শোনাই। তা হলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে, পাহাড় ওঠার সময় আপনাদের সময় বৃথা যায়নি। পরন্তু সুন্দরভাবে কেটেছে।

ভদ্রলোক এ বিষয়ে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে বলতে শুরু করে। যে ঘটনাটার কথা বলছি, তা ঘটেছিল কয়েক বছর আগে এখানেই কোন এক জায়গায়।

অনেকদিন ধরে একজন ফেরারী আসামী পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

একজন ডিটেকটিভও তাকে সমানে তাড়া করে চলে।

এরকম তাড়া করতে করতে একদিন আসামীটি রাতের অন্ধকারে পাহাড়ী এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

ডিটেকটিভও একরোখা ছিল। তার ওপর আকাশে চাঁদ পেয়ে ডিটেকটিভটির জেদ আরও বেড়ে যায়। সেও আসামীকে লক্ষ্য করে পাহাড়ী এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে।

চাঁদের আলোয় আসামীর ছায়া দেখে ডিটেকটিভ গুটি মেরে পাহাড়ে ওঠে। চীৎকার করে আসামীকে আত্মসমর্পণ করতে বলে।

কথা বলার সময় ডিটেকটিভটির পা ফসকে যায়। সে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচে পড়তে শুরু করে।

ঈশ্বরের করুণাবশতঃ সে একটা ঝুলন্ত পাথরের চাঁই-এর ওপরে আছড়ে পড়ে। দেহে তেমন কিছু হয় না। তবে পায়ের গোড়ালী হয় মচ্‌কেছে, নয়ত হাড় ভেঙ্গেছে।

ডিটেকটিভটি ঝুলন্ত পাথরের চাঁই-এর ওপর থেকে পাহাড়ের নীচের দিকে তাকায়। দেখে পাহাড়ী খাদ খুব কম নয়। কেননা চাঁদের আলোয় তার শেষ দেখা যাচ্ছে না।

আবার পাহাড়টা এমনই খাড়া যে, কোন রকমে পাহাড়ের ওপরে ওঠা সম্ভব নয়। কাজেই, এরকম তাড়াহুড়ো করে পাহাড়ে ওঠার জন্য মনে মনে অনুতপ্ত হয়। এই নির্জ্জন জায়গায় কারও সাহায্য পাবার সম্ভাবনা আছে বলে তার মনে হয় না।

যখন এসে এতসব ভাবছে, সে সময় পাহাড়ের ওপর থেকে অপরাধী চিৎকার করে ডিটেকটিভের নাম ধরে ডাকে। বলে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? আমি একটা দড়ি নিয়ে আসছি। সে সময়টুকু আপনি ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করুন।

ডিটেকটিভ চুপ করে অপরাধীর কথা শুনছিল। অপরাধী চুপ করতেই সে বলে ওঠে, তুমি কি অপরাধী উইলিয়াম টার্নার?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। অপরাধী বলে।

নিউনিব্লান্টকে খুন করার অপরাধে তোমার নামে ওয়ারেন্ট আছে।

অপরাধী হাসে। বলে, সে আমি জানি। তবে এখন আপনার আমাকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা আছে?

ক্ষমতা না থাকলেও তোমার কণ্ঠস্বর শুনেই তোমাকে গ্রেপ্তার করলাম।

এবারও অপরাধী হাসে। বলে, কৈ, সে রকম তো কিছু মনে হচ্ছে না। আমি তো বেশ স্বাধীনভাবে আছি।

হ্যাঁ, তা ঠিক। তবে শোন উইলিয়াম টার্নার। আমাকে দড়ি দিয়ে ওপরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করব। তা না হলে আমার আইনের অবমাননা করা হবে।

এবার অপরাধী ডিটেকটিভকে ধমক লাগায়। বলে, এবার আপনি দয়া করে থামুন। আগে আপনি বাঁচুন, তারপর আইনের কথা চিন্তা করবেন। এখন আমি আপনার জন্য দড়ি আনতে যাচ্ছি। সেই সময়টুকু আপনি ধৈর্য্য ধরে বসে থাকুন।

বেশ কিছুক্ষণ পরেও যখন অপরাধী ফিরে এল না, তখন ডিটেকটিভ ঝুলন্ত পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে তার নিশ্চিত মৃত্যুর কথা চিন্তা করতে থাকে।

শেষ পর্য্যন্ত অপরাধী তার কথার খেলাপ করে না! সে একগোছা দড়ি নিয়ে ডিটেকটিভের কাছে আসে।

মাঝরাত থেকে যে ঝুর ঝুর বৃষ্টি হচ্ছে, পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত সে থামে না।

শুধু তাই নয়, অপরাধী উইলিয়াম টার্নার চলে যাবার পর পাহাড়ে অন্ততঃপক্ষে ডিটেকটিভের নজরে তৃতীয় কোন ব্যক্তি পড়ে না।

অপরাধী টার্নার নির্দ্দিষ্ট জায়গায় আসে। বেশ চিৎকার করে বলে, আপনি কি বেঁচে আছেন স্যার?

ডিটেকটিভের কাছ থেকে কোন উত্তর আসে না।

আবার অপরাধী টার্নার আরও বেশী জোরে চিৎকার করে বলে, যদি বেঁচে না থাকেন তবে শুধু শুধু আপনার মৃতদেহের জন্য সময় নষ্ট করব না।

এবার আর ডিটেকটিভ চুপ থাকতে পারে না।

অপরাধী টার্নারের জন্য প্রাণপণ চিৎকার করে বলে, হ্যাঁ টার্নার, এখনও পর্য্যন্ত আমি বেঁচে আছি।

আমি পাহাড়ের ওপরে একলা। তার কারণ নিশ্চয়ই আপনাকে বলার দরকার নেই।

ডিটেকটিভ কোন কথা বলে না। ভাবে, টার্নার ঠিকই বলেছে। সে একলা দড়ি ধরে কি করে তাকে পাহাড়ের ওপরে তুলবে?

আবার অপরাধী টার্নার চিৎকার করে বলে, আপনি দয়া করে, আর একটু সময় অপেক্ষা করুন। আমি নিজে দড়ি ধরে আপনার কাচে পৌঁছুতে চেষ্টা করছি।

এরপর অপরাধী টার্নার সত্যিই দড়ি ধরে বৃষ্টির ভেতর পাহাড়ের ওপর থেকে ডিটেকটিভের দিকে নাবতে শুরু করে।

কথা বলতে বলতে পানশালার সেই বেঁটে লোকটা একটু থামে। উপস্থিত সকলের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে তাকায়। বলে, আপনাদের মত অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিশ্চয়ই বলতে হবে না যে এ কাজটা কত দুরূহ।

তাছাড়া উইপিয়াস টার্নার ও ডিটেকটিভ দুজনের মধ্যে কেউই পর্বতারোহী ছিল না। স্বভাবতই টার্নার অতিকষ্টে ডিটেকটিভের কাছাকাছি পৌঁছায়। ডিটেকটিভের দিকে সঙ্গে আনা দড়ি ছুঁড়ে দেয়।

এবার ডিটেকটিভ ও টার্নার বাঁচার জন্য দেহের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে। অতি কষ্টে পাহাড়ের ওপরে নিরাপদ আশ্রয়ে আসে। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ কোন কথা বলে না।

এদিকে পায়ের যন্ত্রণা ও দৈহিক পরিশ্রমে ডিটেকটিভের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। প্রায় জ্ঞান হারাবার উপক্রম হয়।

তবুও ডিটেকটিভ মনের জোর বাড়ায়। টার্নারের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানায়। পরক্ষণেই টার্নারকে কাবু করার জন্য সে টার্নারের চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালায়। কেননা, সে ভাল করেই জানতো যে, টার্নারকে কাবু করতে না পারলে সে পালিয়ে যাবে। তাকে ধরা খুবই কষ্টকর হবে। একজন আদর্শবান ডিটেকটিভের পক্ষে কাজটা খুবই অন্যায় হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত টার্নার কায়দা করে মুখ ঘোরায়। ডিটেকটিভের ঘুসি তার চোয়াল স্পর্শ করতে পারে না।

ডিটেকটিভও নিজের শরীরের ভার আয়ত্বের মধ্যে না আনতে পেরে সামনের খাদের দিকে গড়িয়ে যায়।

যেহেতু ডিটেকটিভের কোমরে বাঁধা দড়ির সঙ্গে টার্নারের কোমর বাঁধা ছিল, সেহেতু ডিটেকটিভের সঙ্গে সেও পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে যায়। দুজনের

দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে এক কিম্ভুৎ কিমাকার হয়ে যায়। ফলে দুজনেই মারা যায়।

কথা বলতে বলতে বক্তা সেই পর্বতারোহীদের দিকে তাকায়। বলে, এবার বলুন, আপনারা নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ আগে সময় নষ্ট করেন নি?

পর্বতারোহীরা কিছু বলার আগেই সেই উকিল ভদ্রলোক বেশ জোরেই হেসে ওঠে। বলে, ব্যাপারটা খুব অদ্ভূত! আপনি কি বলতে চান এ ঘটনাটা সত্যি?

পানশালার সকলে উকিল ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। কেউ কোন কথা বলে না।

সেই বেঁটে বক্তাটি বেশ জোরের সঙ্গে উকিল ভদ্রলোকের কথার প্রতিবাদ করে ওঠে। বলে, ঘটনাটা একশো ভাগ সত্যি।

উকিল ভদ্রলোক এবার পানশালার মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। সকলের দিকে বেশ বিজ্ঞের হাসি ছুঁড়ে দেয়। বলে, আমি খুব সহজেই প্রমাণ করে দেব যে, এ ঘটনাটা সত্যিই সত্যি নয়। কেননা, এ ঘটনার সময় এমন কোন লোক ঘটনাস্থলে ছিল যে, নিজের চোখে সব ব্যাপারটা দেখেছে? অর্থাৎ তাকে সাক্ষী মানা যায়?

পানশালায় উপস্থিত কয়েকজন উকিল ভদ্রলোককে সমর্থন করে।

এবার প্রশ্ন আসামী ও ডিটেকটিভ দুজনেই খাদে পড়ে ছিল। তাদের মৃত্যুও কি একই সময় হয়েছিল।

পানশালার সেই লোকগুলো উকিলকে সমর্থন করে মাথা নাড়ে।

এবার উকিল ভদ্রলোক বেশ উৎসাহিত হয়। সে পানশালায় উপস্থিত সকলের দিকে হাসি মুখে তাকায়। বলে, তা হলে এটা প্রমাণ হয় যে, যেহেতু এ ঘটনার কোন সাক্ষী নেই, আসামী ও ডিটেকটিভের মধ্যে কেউ বেঁচে নেই, স্বভাবতই প্রকৃত ঘটনা কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সবটাই কাল্পনিক। সবটাই বানানো।

আগের কথাগুলো মাথা নেড়ে উকিল ভদ্রলোককে সমর্থন জানায়।

উকিল বিজয়ের দৃষ্টি সকলের ওপরে বোলায়।

পরে বলে, অবশ্য এর পেছনে একটা দিক আমাদের ভেবে দেখা দরকার। তা হল, ডিটেকটিভ ও অপরাধীর কারও প্রেতাত্মা যদি অন্য রূপ নিয়ে আমাদের আসরে আসে, তা হলে হয়ত বিশ্বাস করা যায়।

এবার সেই বেঁটে লোকটা বেশ নড়ে চড়ে বসে। উকিল ভদ্রলোকের বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ জানায়। তার বক্তব্য ধৈর্য্য ধরে শোনার জন্য সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়।

বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকলের চোখের সামনে সেই বেঁটে ভদ্রলোক কর্পূরের মত বাতাসে মিশে যায়!